উলামায়ে দেওবন্দের আকিদার সারনির্যাস
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ রচিত
'আল আকিদাতুল হাসানাহ'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের অনুবাদ

ইসলামি আকিদার ব্যাখ্যা

আল আকিদাতুল হাসানাহ-এর ভূমিকা
সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রাহিমাহুল্লাহ

ব্যাখ্যাকার
মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ [আফাল্লাহু আনহু]

উলামায়ে দেওবন্দের আকিদার সারনির্যাস শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'আল আকিদাতুল হাসানাহ'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের অনুবাদ

ইসলামি আকিদার ব্যাখ্যা

আল আকিদাতুল হাসানাহ-এর ভূমিকা
সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রাহিমাহুল্লাহ

ব্যাখ্যাকার
মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ [আফাল্লাহু আনহু]

অনুবাদক
মাওলানা সাজ্জাদ হুসাইন

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ইসলামি আকিদার ব্যাখ্যা

মূল	:	আল আকিদাতুল হাসানাহ
লেখক	:	শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ
মূলের ভূমিকা	:	সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রাহিমাহুল্লাহ
মূলের ব্যাখ্যা	:	আল আকিদাতুস সফিয়্যাহ আলাল আকিদাতিল হাসানাহ
ব্যাখ্যাকার	:	মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ আফাল্লাহু আনহু
অনুবাদক	:	মাওলানা সাজ্জাদ হুসাইন
অনুবাদের নিরীক্ষক	:	মাওলানা আরিফুল ইসলাম
প্রকাশনায়	:	ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য : ৪৫০.০০ [চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র]

দَارُ العلومِ دِيُوْبَنْد : مَدْرَسَةٌ فِكْرِيَّةٌ... গ্রন্থের রচয়িতা
আল্লামা মুফতি উবাইদুল্লাহ আসআদি [হাফিজাহুল্লাহ]র

মূল্যায়ন

জানা কথা, 'ইসলামি আকিদার ব্যাখ্যা' নামক আলোচ্য গ্রন্থটি, العَقِيْدَةُ الصَّفِيَّةُ عَلَى العَقِيْدَةِ الحَسَنَةِ কিতাবের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ। মূল আরবি কিতাবটি প্রকাশিত হওয়ার পর, دَارُ العلومِ دِيُوْبَنْد : مَدْرَسَةٌ فِكْرِيَّةٌ গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা মুফতি উবাইদুল্লাহ আসআদি হাফিজাহুল্লাহ, মহানুভবতাবশত কিতাবটি সম্পর্কে তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। নিম্নে প্রথমত তাঁর ভাষায় অভিব্যক্তিটি পেশ করা হচ্ছে। তারপর বাংলা অনুবাদ উল্লেখ করা হবে।

١٥/٥/١٤٤٣هـ/٢٠/١٢/٢٠٢١م

نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد،

فقد وقَفتُ على رسالة الإمام الدهلويّ في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة باسم «العقيدة الحسَنة» حينما كنت طالبا بجامعة دار العلوم لِنَدْوَة العلماء الهند ودَرَستُها فيها، ثم استفَدت بها حينما وفّقني الله بتأليف كتابي «دار العلوم ديوبند» في بيان عقائد علماء ديوبند، وجعلتها جزءًا من الكتاب.

وقد سُرِرتُ حينما اطَّلَعتُ على أن الأخ الفاضل صفيّ الله فؤاد من أفاضل علماء بنغلاديش ومن كبار مؤلِّفيها في علوم شتّى قد اعتَنَى بها وعَمِل عمَلا جليلا شَرْحًا وتوضيحًا وتحقيقًا وتفصيلا باسم «العقيدةُ الصَّفِيَّةُ»، وقدَّمَها اليَّ، فنظَرت في عمله المبارك، فوجَدتُه قَيِّمًا

جميلا ومُفِيدا جزيلا، جزاه الله تعالى على هذه الخدمة العلمية السَّنِيَّة الطيِّبة، ولعلها تَصِير في المستقبَل مَحَطَّ أنظارِ العلماء وعناية الطلبة والدارسين وجزءًا من المَنَاهِج الدراسية لدينا ولديهم.

وأنا العبد محمد عبيد الله الأسعديُّ غُفِر له.

অনুবাদ :

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম। পরকথা,

আমি আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকিদা বিষয়ক ইমাম দেহলভি রাহিমাহুল্লাহর পুস্তিকাটি সম্পর্কে অবগতি লাভ করি, যখন আমি হিন্দুস্থানের জামিয়া দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষার্থী ছিলাম। তখন আমি দরসে পুস্তিকাটি পড়েছি। দ্বিতীয়বার পুস্তিকাটি দ্বারা উপকৃত হয়েছি যখন আল্লাহ তাআলা আমাকে 'দারুল উলুম দেওবন্দ...' শীর্ষক কিতাবটি রচনার তাওফিক দান করেছেন। কিতাবটির উলামায়ে দেওবন্দের আকিদা বিষয়ক আলোচনায় আমি উক্ত পুস্তিকাটি উল্লেখ করেছি।

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, বাংলাদেশের বরেণ্য আলেমে দীন এবং বিভিন্ন বিষয়ের উঁচু মাপের লেখক প্রিয় ভাই সফিউল্লাহ ফুআদ পুস্তিকাটিতে অনেক কাজ করেছেন। তিনি পুস্তিকাটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। বিষয়গুলো নিরীক্ষণ করেছেন। তিনি তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থটির নাম রেখেছেন 'আল আকিদাতুস সফিয়্যাহ আলাল আকিদাতিল হাসানাহ'।

ব্যাখ্যাগ্রন্থটি তিনি আমার নিকট পাঠিয়েছেন। তাঁর মোবারক কাজটি আমি দেখেছি। কাজটি মূল্যবান, সুন্দর, উপকারী ও মহৎ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এই উত্তম মূল্যবান ইলমি খেদমতটির বিনিময় দান করুন। আমি আশাবাদী, ব্যাখ্যাগ্রন্থটি উলামায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এটি ছাত্র ও শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে এবং আমাদের ও তাঁদের পাঠ্যসূচিতে স্থান পাবে।

বান্দা মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ আসআদি [গুফিরা লাহু]

১৫. ৫. ১৪৪৩ হি. / ২০. ১২. ২০২১ ই.

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। তাঁর তাওফিকে আমরা নিঃশ্বাস গ্রহণ করি এবং তাঁর তাওফিকেই আমরা যাবতীয় কর্ম সাধন করি।

কিছু স্মৃতি মানুষকে আগলে রাখে। কিছু স্মৃতিকে মানুষ আগলে রাখে। স্মৃতিগুলো জীবনের পড়ন্ত বেলায় বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়। মলিন জীবনে হাসি ফোটায়। হৃদয়ের সবচেয়ে কোমল জায়গাটিতে এ স্মৃতিই আলোড়ন জাগায়। আমার জীবনে এমন একটি স্মৃতি হলো এই কিতাবটির অনুবাদকর্ম সম্পাদন করা। আমি এই স্মৃতি যুগ যুগ ধরে আগলে রাখতে চাই। জীবন জীবন ধরে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। ধূলিমলিন জীবনে স্নিগ্ধ বর্ষণের মতো এই স্মৃতির দেখা পেতে চাই।

মাহাদে এসে দাখেলা নেওয়ার সময়টিতে আমি মূলত এক নতুন চিন্তা ও নতুন প্রেরণার দুনিয়াতে এসে প্রবেশ করি। মাহাদ আমাকে সবচেয়ে বড় যে উপহারটি দিয়েছে, তা হলো মুহসিন উসতাদ মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ আফাল্লাহু আনহুর সান্নিধ্য। এই সান্নিধ্য আমার এলোমেলো জীবনে গতি এনেছে। এই সান্নিধ্য আমার দিশাহীন জীবনকে গন্তব্য দেখিয়েছে। এই সান্নিধ্য আমাকে চেতনাহীন সমুদ্র থেকে হাত ধরে টেনে তুলেছে। আমি কিয়ামত পর্যন্ত শুধু এই একটি বিষয়ের শুকরিয়াতে মগ্ন থাকলেও শুকরিয়া শেষ হবে না।

পরকথা, আল্লাহর রহমতে প্রকাশিত হচ্ছে 'ইসলামি আকিদার ব্যাখ্যা' শীর্ষক গ্রন্থটি। উপমহাদেশের অমূল্য রতন, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'আল-আকিদাতুল হাসানাহ' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ এটি। আরবিতে ব্যাখ্যাগ্রন্থটির নাম হলো 'আল-আকিদাতুস সফিয়্যাহ আলাল আকিদাতিল হাসানাহ'। আল্লাহর অশেষ দয়ায়, কিতাবটির সর্বপ্রথম ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম আমি। এ কিতাবটিরই বাংলা অনুবাদ এখন আপনার হাতে। আলহামদুলিল্লাহ।

সম্মানিত লেখক মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ আফাল্লাহু আনহু থেকেই কিতাবটির দরস গ্রহণ করেছি আমি। আল্লাহর অপার অনুগ্রহ,

তিনি নিজেই আমাকে কিতাবটির বাংলা অনুবাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। বুকে হাজার ভয় ছিলো, পাহাড়সমান বোঝা ছিলো। সঙ্গে ছিলো তাঁর দুআ ও ভালোবাসা। আল্লাহর রহমতে ভয় ও বোঝা দুআ ও ভালোবাসার কাছে পরাজিত হলো। কাজে হাত দিলাম। প্রতিদিন দরসের পাঠ পরিমাণ অনুবাদ জমা দিতে শুরু করলাম। বেশ কিছুদিন এভাবে চললো। এক পর্যায়ে পিছিয়ে পড়লাম। কিতাবের দরসও সমাপ্ত হয়ে গেলো। কিন্তু অনুবাদ বাকি রয়ে গেলো অনেকটুকু! তবুও আমি থামিনি। উসতাদ তাড়া দিতেন, আমি কাজ করতাম। এভাবে এক সময় কিতাবটির অনুবাদ সমাপ্ত হলো। আলহামদুলিল্লাহ।

এরপর থেকেই যেন শুরু হলো মূল কাজ!

অনুবাদটি নিরীক্ষণের জন্য পাঠানো হলো শ্রদ্ধেয় মাওলানা আরিফুল ইসলামের কাছে। তিনি দক্ষ হাতে অতি চমৎকার করে নিরীক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছেন। সবকিছুর তত্ত্বাবধানে ছিলেন আমাদের উসতাদ স্বয়ং। ফলে কিতাবটি আর ব্যাখ্যাগ্রন্থের 'অনুবাদ' রইলো না। হয়ে উঠলো একটি মৌলিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ। কুরআনের আয়াতের অনুবাদগুলো হয়ে উঠলো আরও সুন্দর, আরও যথাযথ। বিভিন্ন স্থানে যুক্ত হলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। জটিল ব্যাখ্যাগুলো হয়ে উঠলো সহজ, সুন্দর। এখন এই চেষ্টা ও মেহনতের ফল আপনার হাতে, আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন কাজটিকে কবুল করে নেন। কাজটির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে কবুল করে নেন। আমিন।

যদি এ কিতাবের কোনো ভুল পাঠকের নজরে পড়ে, তাহলে আমরা সে ভুল সংশোধনের অপেক্ষায় রইলাম। আপনার মন্তব্য ও সংশোধনী আমাদের জানান। আল্লাহ আপনাদের উত্তম বিনিময় দেবেন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

সাজ্জাদ হুসাইন

মাহাদুশ শায়খ ফুআদ লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়া ঢাকা
২০ জুমাদাল উলা, ১৪৪৪ হি. / ১৪ ডিসেম্বর, ২০২২ ই.
বুধবার, সন্ধ্যা ৬.৩৪

নিরীক্ষকের আরজ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

'আল-আকিদাতুস সফিয়্যাহ আলাল আকিদাতিল হাসানাহ' কিতাবটি যখন প্রথমবার পড়েছি, তখন থেকেই আন্তরিকভাবে অনুভব করেছি, সর্বস্তরের বাংলা ভাষাভাষীর হাতে এর একটি সরল অনুবাদ পৌঁছে যাওয়া দরকার। এ কথা ব্যক্তও করেছিলাম ব্যাখ্যাকার হজরতের কাছে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি, এক বছর না পেরোতেই শুনতে পেলাম কিতাবটির অনুবাদের কাজ শেষ পর্যায়ে। কাজটি করছেন বন্ধুবর মাওলানা সাজ্জাদ হুসাইন।

অনুবাদের কাজ সমাপ্ত হলো। এবার অনুবাদ নিরীক্ষণের পর্ব। শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হলো আমার কাঁধে। বড়দের দুআকে পুঁজি করে, আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আমি চেষ্টা করে গেলাম। পাশাপাশি আল্লাহর কাছে দুআ করলাম, তিনি যেন কাজটি যথাযথভাবে আঞ্জাম দেওয়ার তাওফিক দান করেন এবং তা কবুল করে নেন।

কাজটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন স্বয়ং ব্যাখ্যাকার আফাল্লাহু আনহু। তাঁর পূর্ণ তত্ত্বাবধান ও পরামর্শে, বইটি 'অনুবাদ'-এর স্তর পেরিয়ে 'মৌলিক'-এর পর্যায়ে উঠে এসেছে। ছোট-বড় প্রচুর সংযোজন-পরিবর্তনের ফলে বইটি হয়েছে আরো সমৃদ্ধ। বইটিতে বিশেষভাবে ৫টি আলোচনার স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে।

১. 'আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলিতে ইলহাদ' বিষয়ক আলোচনাটি মূল কিতাবে 'কুরআন পাকের প্রতি ইমান' শিরোনামের আলোচনাগুলোর পর ছিল। অনূদিত এ গ্রন্থে উক্ত আলোচনাটি 'আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান' শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. 'ব্যক্তি যতো বড় ওলি, পীর কিংবা মুজাহিদই হোক-না কেন...' আলোচনাটি মূল কিতাবে 'তাকদিরের প্রতি ইমান'-এর

আলোচনার পর ছিল। এ অনূদিত গ্রন্থে তা 'ওলিদের আলোচনা' শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

৩. 'আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সকল সাহাবিকে ন্যায়পরায়ণ মনে করেন...' শিরোনামের আলোচনা মূল কিতাবে 'তাকদিরের প্রতি ইমান'-এর আলোচনার পর ছিল। অনূদিত গ্রন্থে একে 'সাহাবিদের আলোচনা'র অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

৪. 'সকল নবি-রাসুল ও তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহের ওপর ইমান...' শীর্ষক লেখাটি মূল কিতাবে 'তাকদিরের প্রতি ইমান'-এর আলোচনার পর ছিল। অনূদিত গ্রন্থে এটিকে 'নবি-রাসুলগণের প্রতি ইমান' শিরোনামের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫. 'ইমান হলো মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্তরে বিশ্বাস করার নাম' শীর্ষক আলোচনাটি মূল কিতাবে 'তাকদিরের প্রতি ইমান'-এর আলোচনার পর ছিল। অনূদিত গ্রন্থে এটিকে 'ইমান, কুফর ও তাকফির' শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এতসব সংযোজন ও পরিবর্তনের পর এখন আর এটাকে অনুবাদ না বলে, মৌলিক গ্রন্থই বলা যায়। কিন্তু 'ওয়াস সাবিকুনাস সাবিকুন' [যা অগ্রগামী, তা তো অগ্রগামীই]... তাই অনুবাদের তকমা বাকি থাকলো। সর্বোপরি ভাষা ও বর্ণনা সহজ ও সাবলীল করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেন সর্বশ্রেণির পাঠক কিতাবটি থেকে উপকার লাভ করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা লেখক, ব্যাখ্যাকার, অনুবাদক, নিরীক্ষক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খাইর দান করুন। এই কাজটিকে দোজাহানে সফলতার সোপান হিসেবে কবুল করুন। আমিন!

আরিফুল ইসলাম

৯-৫-১৪৪৪ হি. / ৩-১২-২০২২ই.
শনিবার, ভোর ৫ : ৫

ব্যাখ্যাকারের ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসুল, তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের ওপর এবং সেসকল মানুষের ওপর, যারা কেয়ামত অবধি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

পরকথা, দারুল উলুম দেওবন্দের অভ্যন্তরে অবস্থিত 'শাইখুল হিন্দ একাডেমি' থেকে প্রকাশিত একটি কিতাবের নাম হলো, 'দারুল উলুম দেওবন্দ : ...'।[১] কিতাবটি অন্য সাধারণ বই-কিতাবের মতো নয়, যা দেওবন্দি ঘরানার ওলামায়ে কেরাম লেখেন ও প্রকাশ করেন; বরং খোদ দারুল উলুম দেওবন্দ এটি প্রকাশ ও প্রচার করেছে। ফলে কিতাবটি দারুল উলুম দেওবন্দের নিজস্ব দর্শন ও চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করে।

কিতাবটির তৃতীয় অধ্যায়ে দেওবন্দের উলামা-মাশাইখের আকিদা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সূচনা হয়েছে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'আল আকিদাতুল হাসানাহ' পুস্তিকাটির মাধ্যমে। সেখানে স্পষ্টই বলে দেওয়া হয়েছে যে, দেহলবি রাহিমাহুল্লাহর পুস্তিকার মাধ্যমে আলোচনা শুরু করার কারণ হলো– এটি তাওহিদ ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে ওলামায়ে দেওবন্দের আকিদা এবং অবস্থানের সংক্ষিপ্ত গাইডলাইন। সেখানে স্পষ্টভাবে আরো বলা হয়েছে, দেহলবি রাহিমাহুল্লাহর আকিদাই তাঁদের আকিদা এবং তাঁর মানহাজই তাঁদের মানহাজ।

---

১. কিতাবটির পূর্ণ নাম হলো, دارُ العلومِ ديوبند : مدرسةٌ فكريةٌ توجيهيّة، حرَكةٌ إصلاحية دعويّة، مؤسَّسَةٌ تعليميّة تربَوِيَّة [অর্থাৎ দারুল উলুম দেওবন্দ : একটি চিন্তানৈতিক দিকনির্দেশক দর্শন, সংস্কারমূলক দাওয়াতি আন্দোলন, প্রশিক্ষণমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান]। কিতাবটির লেখক হলেন শাইখ মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ আসআদি কাসেমি হাফিজাহুল্লাহ।

উপরন্তু কিতাবটির ৪৬২ নং পৃষ্ঠায় 'উলামায়ে দেওবন্দের আকিদার সারনির্যাস' শিরোনামের অধীনে 'আল আকিদাতুল হাসানাহ' পুস্তিকাটি পূর্ণাঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই আমরা তা মাহাদের আকিদা ও তাওহিদ বিভাগের[১] পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

এরপর কয়েকজন মুখলিস ও হিতাকাঙ্ক্ষী আলেম বন্ধু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, যারা আমার আকিদা বিষয়ক কাজসমূহের ব্যাপারে জানতেন। তাঁরা বললেন, এই পুস্তিকাটি দলিল উল্লেখবিহীন একটি মূলপাঠমাত্র। যদি আপনি এর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করতেন! যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে প্রত্যেকটি আকিদার পর কুরআন-সুন্নাহ হতে কিছু আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা, যেগুলো ঐ আকিদার মূল ভিত্তি ও উৎস; তা হলে দলিলশূন্য এ পুস্তিকাটি দলিলসমৃদ্ধ হতো এবং সাধারণ পাঠকদের মাঝে, বিশেষ করে ছাত্রদের কাছে ইসলামি আকিদা উপস্থাপনে কুরআন-সুন্নাহর চমৎকার ধারাটি ফুটে উঠতো।

বলাবাহুল্য, আমার মতো মানুষ এই মহান কাজটি যথাযথ আনজাম দিতে পারবে কি না, সেটা ভিন্ন বিষয়; কিন্তু তাদের আবেদনটি ছিলো পুরোপুরি যৌক্তিক ও সময়ের দাবি। তাই আমি বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ভাবলাম। অবশেষে মনে হলো, চেষ্টা করে তো দেখতে পারি। ফায়দা তো সর্বপ্রথম আমারই হবে। কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বাড়বে, সুদৃঢ় হবে। উপরন্তু কাজটি শেষ করে আমি তাঁদের সামনে পেশ করব, অতঃপর তাঁদের মূল্যবান মন্তব্যের আলোকে আবার নিরীক্ষণ করব, এরপর আবার কাজটি তাঁদের দেখাব। আল্লাহ তাআলার দয়া ও তাওফিক শামিলে হাল হলে আশাকরি তখন এতে বড় ধরণের কোনো বিচ্যুতি থাকবে না। আর

---

১. মাহাদের পুরো নাম, মাহাদুশ শায়খ ফুআদ লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়া ঢাকা। আকিদা ও তাওহিদ বিভাগের পুরো নাম, قسم العقيدة والتوحيد على مذهب أهل السنة والجماعة

কেনোই-বা আশাবাদী হবো না এবং এমন মোবারক আহবানে সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করবো না, যখন আমার রব স্বয়ং বলছেন, -যিনি ওয়াদার খেলাফ করেন না- وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

আর যারা আমার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে, আমি তাদেরকে অতি অবশ্যই আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। (সুরা আনকাবুত : ৬৯)

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ.

যে [আল্লাহর] অভিমুখী হয়, তিনি তাকে নিজের দিকে পরিচালিত করেন। (সুরা শুরা : ১৩)

যাইহোক, আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করে কাজ শুরু করে দিলাম। আমার একজন হাফেজ ছাত্র হাবিবুল্লাহ [গোপালগঞ্জ] এই সফরে আমার সঙ্গী হলো। আমার নির্দেশনা অনুসারে সে কাজটির বেশকিছু মৌলিক উপাদান আমাকে একত্র করে দিলো। ফলে বোঝা বেশ হালকা হলো, পথ অনেকটা সহজ হলো। তার সঙ্গ ও আন্তরিকতায় এবং আল্লাহর রহমত ও দয়ায় এই দীর্ঘ যাত্রাটি ধারণাতীত দ্রুত সময়েই সম্পন্ন হলো।

আমি যা চিন্তা করেছিলাম, আল্লাহর তাওফিকে তা কার্যকর করা সম্ভব হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। কাজটি সমাপ্ত করে আমি সেই শুভানুধ্যায়ী আলেম বন্ধুদের দেখাই, যারা ইমান, ইসলাম ও ইহসানের জ্ঞানে অনন্য। তাঁদের মূল্যবান সংশোধনী ও পরামর্শের আলোকে আমি এতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন করি। এরপর কাজটি আবার তাঁদের সামনে পেশ করি। তাঁরা যে মত প্রকাশ করলেন তার ভিত্তিতে আমি নিশ্চিত হই, কিতাবটি এখন প্রথম মুদ্রণের জন্য দেওয়া যেতে পারে।

আশা করি, বইটি সর্বস্তরের মানুষের জন্য আকিদা বিষয়ক জ্ঞান-পিপাসা মেটাতে কিছুটা হলেও কার্যকর ভূমিকা রাখবে। আল্লাহই উত্তম পথপ্রদর্শক ও তাওফিকদাতা। তিনি এ কাজটিসহ আমার অন্য কাজগুলোও কবুল করুন। আমার পক্ষ থেকে এবং সকল সহযোগী শুভানুধ্যায়ী

ভাইদের পক্ষ থেকেও কবুল করুন। দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের সকলকে তাঁর দয়া ও সম্মান দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করুন। আমিন।

'আল আকিদাতুল হাসানাহ' তথা ব্যাখ্যাগ্রন্থটির মূলপাঠ আমি গ্রহণ করেছি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন 'নুসখা' সামনে রেখে। সবগুলো দেখে যেটা সঠিক ও যথাযথ মনে হয়েছে সেটাই গ্রহণ করেছি। 'নুসখা' তিনটি হলো–

১. পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের গুজরানওয়ালা শহরের নুসরাতুল উলুম মাদরাসার প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত নুসখা।

২. উল্লিখিত 'দারুল উলুম দেওবন্দ : ...' কিতাবে উদ্ধৃত নুসখা।

৩. ভারতের নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ-এর সাংবাদিকতা ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে ১৪৩৩ হিজরি মোতাবেক ২০১২ সালে প্রকাশিত 'আল আকিদাতুস সানিয়্যাহ' কিতাবে উদ্ধৃত নুসখা।

বইয়ের শুরুতে সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রাহিমাহুল্লাহর একটি ভূমিকা যুক্ত করা হয়েছে, যেটি তিনি 'আল আকিদাতুল হাসানাহ' পুস্তিকার ভূমিকা হিসেবে লিখেছেন।

সবশেষে, কিতাবটির কাজ করতে গিয়ে যেসকল ভুল-ত্রুটি হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করার প্রয়োজনীয়তা আমি আন্তরিকভাবে অনুভব করি। যারা ভুল ধরিয়ে দিতে সক্ষম, তাঁদের সকলের নিকট এটি আমানত হিসেবে রইলো। যেন কিতাবটির পরবর্তী মুদ্রণগুলোতে আমি এর দ্বারা উপকৃত হতে পারি। আল্লাহ আমাকে এবং তাঁদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

বিশিষ্ট সাহাবি হজরত জুনদাব বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি বাণী উল্লেখ করে আমি বক্তব্যের ইতি টানছি। সকল সাহাবির প্রতিনিধিত্ব করে তিনি বলেছেন–

تَعَلَّمْنَا الْإِيْمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ، فَازْدَدْنَا بِهِ إِيْمَانًا.

আমরা কুরআন শেখার আগে ইমান শিখেছি, তারপর কুরআন শিখেছি। এতে আমাদের ইমান বৃদ্ধি পেয়েছে।[১]

চিরঞ্জীব ও সর্বসত্তার ধারক মহান রবের কাছে ফরিয়াদ, তিনি যেন আমাদের সকলের পক্ষ থেকে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করে নেন। যেদিন সম্পদ ও সন্তান কোনো উপকারে আসবে না, 'কলবে সালিম' নিয়ে আগত মানুষরাই কেবল উপকৃত হবে, সেদিন যেন এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে উপকৃত করেন। আমিন!

وصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ -فِدَاهُ أَبِيْ وأُمِّيْ- وعَلى آلِهِ وصَحْبِهِ وعلماءِ أُمَّتِه أجمعين!

সফিউল্লাহ ফুআদ আফাল্লাহু আনহু
পূর্ব ভূঁইয়াপাড়া, গল্লাই, চান্দিনা, কুমিল্লা
২৮ মুহাররম, ১৪৪৩ হিজরি / ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইসায়ি
মঙ্গলবার সন্ধ্যা

কিতাবটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমার প্রেরণাদানে উজ্জীবিত হয়ে তরুণ লেখক মাওলানা সাজ্জাদ হুসাইন তা বাংলাভাষায় অনুবাদ করেছে এবং শেকড়সন্ধানী আলেম মাওলানা আরিফুল ইসলাম অনুবাদকর্মটি নিরীক্ষণ করেছে। এ কাজটি করতে গিয়ে আমার পরামর্শে বেশ কিছু স্থানে তাঁরা কিছু পরিবর্তন ও কিছু সংযোজন করেছে। আমি তাঁদের পুরো কাজটি দেখেছি এবং সাধ্যানুসারে পরিমার্জন করেছি। মেহেরবান আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। আমিন!

সফিউল্লাহ ফুআদ আফাল্লাহু আনহু
২৬ জুমাদাল উলা, ১৪৪৪ হিজরি / ২১ ডিসেম্বর, ২০২২ ইসায়ি

---

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৬১, دَارُ الفِكْرِ বৈরুত।

সর্বাগ্রে প্রয়োজন আকিদার সংশোধন[১]

'ইবাদতের ক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষ' তাদের জন্যই প্রশংসিত, যাদের আকিদা-বিশ্বাস পরিশুদ্ধ আছে। সালাফগণ ইবাদতের ক্ষেত্রে যেমন ছিলেন উচ্চাভিলাষী, তার আগে আকিদা-বিশ্বাসে ছিলেন তাঁরা পরিশুদ্ধ। ইবাদতে আমাদের উচ্চাভিলাষী থাকা খুবই প্রয়োজন, কিন্তু তারও আগে প্রয়োজন আকিদা-বিশ্বাসে পরিশুদ্ধ হওয়া। বিষয়টি ইলমিভাবে বোঝার জন্য নিম্নে কিছু আলোচনা পেশ করা হচ্ছে–

আখেরাতে মানুষ ৩ শ্রেণিতে বিভক্ত হবে–

ক. কিছু মানুষ চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে।

খ. কিছু মানুষ সাময়িক সময়ের জন্য জাহান্নামে যাবে।

গ. বাকিরা সরাসরি জান্নাতে যাবে। কেউ জান্নাতের উচ্চস্তরে যাবে, কেউবা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে।

আগে মূলধন রক্ষা, পরে লাভ করার চেষ্টা– এই মূলনীতির আলোকে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে সর্বপ্রথম আমাদেরকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে, আমরা যাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামি না হই; তারপর চেষ্টা করতে হবে, যাতে সামান্য সময়ের জন্যও আমাদের জাহান্নামে যেতে না হয়; তারপর চেষ্টা করতে হবে, যাতে জান্নাতের উচ্চতর স্তরে যাওয়া যায়।

ক. চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে বাঁচার আমল

চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে যাওয়া থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে মুসলমান হতে হবে এবং মুসলমান অবস্থায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন :

---

১. আলোচ্য প্রবন্ধটি ব্যাখ্যাকারের রচিত 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' [পরিমার্জিত ৪র্থ সংস্করণ ২০২২ ই.] থেকে নেওয়া হয়েছে।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দেওয়া, যা ইসলামের প্রথম স্তম্ভ। অর্থাৎ এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আমি সকল প্রকার মিথ্যা ইলাহ, মিথ্যা মাবুদ, ইবাদাতের মিথ্যা দাবীদার ও অনুসরণের মিথ্যা দাবীদারকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছি। তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করছি। আর আল্লাহর সকল নাম ও গুণাবলীতে, কর্মসমূহে, ইবাদতে এবং হুকুম-আহকামে তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে অন্তরে, কথায় ও কাজে মেনে নিচ্ছি।

পবিত্র কালামে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন-

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে[১] অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনে, অবশ্যই সে দৃঢ়তর হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙ্গে যাওয়ার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা : ২৫৬)

আরো ইরশাদ করেছেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

আমি প্রত্যেক জাতির কাছে এ মর্মে রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত বর্জন করো। (সূরা নাহ্‌ল : ৩৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ قَالَ : «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ»، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى.

যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তাদেরকে অস্বীকার করল, তার সম্পদ ও রক্ত [-এর

---

১. ১২৬ নং পৃষ্ঠায় তাগুতের সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য।

ক্ষতি করা] অবৈধ হয়ে গেল। তার [অন্তরের অবস্থার] হিসাব আল্লাহ তাআলার কাছে।[১]

লা ইলাহা অর্থ কী? তাগুত কারা, যাদেরকে প্রত্যাখ্যান না করলে ইমান সাব্যস্ত হয় না? কিভাবে তাগুত প্রত্যাখ্যান করতে হয়? শুধু মুখের প্রত্যাখ্যান যথেষ্ট কি না? সবগুলো তাগুত প্রত্যাখ্যান করে শুধু যেকোনো একটিকে প্রত্যাখ্যান ও পরিত্যাগ না করলে কি মুসলমান থাকা যায়? এ বিষয়গুলো প্রথমেই আমাদের জানা জরুরি।

ইল্লাল্লাহ অর্থ কী? আল্লাহ তাআলা কোন কোন ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয়? রব হিসেবে আল্লাহর কাজসমূহ কী, যেগুলোতে তিনি এক ও অদ্বিতীয়? সৃষ্টি করা, রিযিক দেওয়া, বিপদ থেকে উদ্ধার করা, আইন-প্রণয়ণ ও বিচার-ফায়সালা করা, মৃত্যু দান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে কীভাবে আল্লাহর একত্ববাদ বজায় রাখতে হয়? বাস্তব জীবনে মানুষ কীভাবে আল্লাহর নাম, গুণাবলি ও ইবাদতে একত্ববাদ বিরোধী কাজ করছে বা শিরক করছে? ইবাদতের ক্ষেত্রে কীভাবে আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় মানতে হয়? ইবাদত কাকে বলে? শুধু কি সালাত-সিয়াম এগুলোই ইবাদত? এ বিষয়গুলোও আমাদের জানা আবশ্যক।

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলতে কী বোঝায়? রাসুল কাকে বলে? কী ছিল রাসুলের দায়িত্ব? তিনি কি কিছু জ্ঞান প্রকাশ্য জানিয়ে বাকীটুকু গোপন রাখতে পারেন? অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় আইন ও বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে কেউ যদি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবর্তিত শিক্ষা ও আইনকানুনের তুলনায়, অন্য কোনো

---

১. সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, বাবুল আমরি বিকিতালিন নাস ১/৫৩, হাদিস নং : ২৩, دَارُ إِحْيَاءِ الكُتُبِ العَرَبِيَّةِ মিশর।

বুদ্ধিজীবি ও দার্শনিক, যেমন অ্যারিস্টটল, প্লেটো, মাওসেতুং, কার্লমার্কস, লেলিন, স্টেলিন, আব্রাহাম লিঙ্কন প্রমুখের থিওরি ও মতবাদকে উত্তম মনে করে, সেগুলো প্রচার-প্রসার করে, সেগুলো দিয়ে দেশ ও সমাজকে পরিচালিত করতে চায়, এসব কিছু করেও কি সে মুসলমান থাকতে পারে?[১] ইবাদতের ক্ষেত্রে নবির আদর্শের বাইরে গিয়ে বিদআতে লিপ্ত হলে কিভাবে তা স্ববিরোধিতা হয়? এ বিষয়গুলোও আমাদের জানা আবশ্যক।

ইসলামের ২য় স্তম্ভ সালাতের যেমন কিছু পূর্বশর্ত আছে, যেগুলোর কোনো একটি পালন না করলে সালাত আদায় হয় না, যেমন : ওজু করা, দেহ পবিত্র রাখা; তেমনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এরও কি কোনো পূর্বশর্ত আছে? থাকলে সেগুলো কী কী? যেভাবে কোনো কোনো কাজ করলে ওজু ভেঙ্গে যায়, সালাত ভেঙ্গে যায়, পুনরায় নতুনভাবে ওজু করতে হয়, সালাত আদায় করতে হয়; সেভাবে কী কী কাজ করলে ইমান ভেঙ্গে যায়, তা-ও আমাদের জানতে হবে।

ইমান ভঙ্গকারী কাজের মধ্যে বড় শিরক, বড় কুফর ও বড় নিফাক কী কী কাজে হয়? কিভাবে আমাদের সমাজের মানুষ না জেনেই এসব কাজে জড়িত হচ্ছে? এছাড়া রিদ্দাহ বা দীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণসমূহ কী কী? তা-ও আমাদেরকে জানতে হবে, যাতে আমরা ইসলাম গ্রহণ করার পর আমাদের অজ্ঞাতেই কাফির-মুরতাদে পরিণত না হই। আল্লাহর পানাহ!

---

১. آسان ترجمہ قرآن কিতাবে সুরা নিসা-র ৬০ নং আয়াতের অধীনে রয়েছে, 'আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মুখে নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসুলের বিধানাবলির ওপর অন্য কোনো বিধানকে প্রাধান্য দেয়, তার মুসলমান থাকার সুযোগ নেই।'

এ ধরনের যেসব জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে আমাদের ইমান থাকা না-থাকা এবং আমরা মুসলমান থাকা না-থাকা, সেগুলো হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক জ্ঞান। এ বিষয়গুলো আমাদের সবার আগে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ও সময় দিয়ে অধ্যয়ন করা জরুরি। কুরআন-হাদিসের আলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানা আবশ্যক। কোনো আলেম যদি এ সকল মৌলিক বিষয়ের আলোচনা এড়িয়ে চলেন, তাহলে তিনি হক্কানি আলেম হতে পারেন না। তিনি জরুরি বিষয়গুলো না জানিয়ে সংশ্লিষ্টদেরকে বিপদ-সীমায় ফেলে রাখছেন।[১]

খ. সাময়িক সময়ের জন্যও জাহান্নাম থেকে বাঁচার আমল

সাময়িক সময়ের জন্যও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে উল্লিখিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন করার পর আমাদেরকে :

১. অন্যান্য সকল হারাম ও কবিরা গোনাহ থেকে বাঁচতে হবে। যেমন, সুদের আদান-প্রদান, সুদের লেখক হওয়া বা সাক্ষী হওয়া ইত্যাদি। এ রকম কবিরা গোনাহগুলো কী কী? তা আমাদের জানতে হবে। বাস্তবে কিভাবে মানুষ এসব গোনাহে লিপ্ত হচ্ছে, তা জানতে হবে। যেমন : সুদভিত্তিক লোন নেওয়া, লোন দেওয়া, ফিক্সড ডিপোজিট রাখা, সুদভিত্তিক ব্যাংকে[২] চাকুরী করা[১] ইত্যাদি বিষয়সমূহ।

---

১. উল্লিখিত বিষয়গুলো এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্যই মাহাদে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'আকিদা ও তাওহিদ বিভাগ'। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। আমিন!

২. মোহাইমিন পাটোয়ারী রচিত 'ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার শুভংকরের ফাঁকি' এবং মুহাম্মদ যাহিদ সিদ্দিক মুঘল রচিত 'ইসলামী ব্যাংক : ভুল প্রশ্নের ভুল উত্তর' প্রভৃতি বইয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে

২. সকল ফরজ-ওয়াজিবসমূহ পালন করতে হবে। তাই কী কী কাজ একজন মুসলমানের ওপর ব্যক্তিগতভাবে ফরজ, কী কী কাজ সমষ্টিগতভাবে ফরজ, তা জানতে হবে। যেমন : ইলম অর্জন, সালাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান, সিয়াম-সাধনা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদ, পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন ফরজ দায়িত্ব ইত্যাদি পালন করা।

যে, ব্যাংককে আদৌ ইসলামি বানানো সম্ভব নয় এবং ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে শরিয়তের উদ্দেশ্য অর্জন করা অসম্ভব। প্রাত্যহিক জীবনের হালাল-হারামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিশেষ করে ইফতা বিভাগের উস্তাদ-ছাত্রদের জন্য এ বই দুটি অধ্যয়নযোগ্য। দ্বিতীয় বইটির একটি অংশে মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর ইসলামি ব্যাংকিং ও অর্থনীতির অবস্থানের খণ্ডন রয়েছে।

মুফতি আবদুস সালাম চাটগামি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'মনে রাখতে হবে, মুফতি তাকি উসমানি দামাত বারাকাতুহুম একজন বিশ্বমানের গবেষক। তবে সবক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণা সারাবিশ্বের একমাত্র ফতোয়া নয়। এদেশে তাঁকে একজন ইমামের মর্যাদা দিয়ে অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর মতকেই ইসলামের একমাত্র মত ও ফতোয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়; এই ব্যাপারটা আমাকে খুবই অবাক করে।' ['আত্মজীবনী', পৃ. ১৭৪, মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, প্রকাশকাল ২০২২ ই.]

১. হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদি লেনদেনের লেখক ও সাক্ষীদেরকে লানত করেছেন। তিনি বলেছেন, [সুদের অপরাধে] তারা সমান। (সহিহ মুসলিম)

কোন কোন বিষয়ে ইলম অর্জন করা ফরজ? এ সম্পর্কে ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন–

فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَعْرِفَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيْ دِيْنِهِ : كَالطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ؛ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ مَعْرِفَةُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيْ مَالِهِ مِنْ زَكَاةٍ وَنَفَقَةٍ وَحَجٍّ وَجِهَادٍ؛ وَكَذٰلِكَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَّبِيْعُ وَيَشْتَرِيْ أَنْ يَّتَعَلَّمَ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْبُيُوْعِ.

প্রত্যেক মুসলমানের ওপর দীনের ওই সকল বিষয়ের ইলম অর্জন ফরজ, দীন-পালনে সে যেগুলোর মুখাপেক্ষী। যেমন : পবিত্রতা, সালাত, সিয়াম। যার সম্পদ আছে তার জন্য সম্পদ সম্পর্কিত দায়িত্বসমূহের ইলম অর্জন ফরজ। যেমন : যাকাত, সাদাকা, হজ ও জিহাদ। এমনিভাবে যে ব্যক্তি বেচা-কেনা করে, তার জন্য কোন কোন ক্রয়-বিক্রয় হালাল এবং কোনগুলো হারাম, তা শিক্ষা করা ফরজ।[১]

কতটুকু ইলম অর্জন ফরজ- এ বিষয়ে ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন–

لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَاجِبٌ أَنْ يَتَعَلَّمَ الزَّكَاةَ، فَإِذَا كَانَ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ كَمْ يُخْرِجُ وَمَتَى يُخْرِجُ وَأَيْنَ يَضَعُ، وَسَائِرُ الْأَشْيَاءِ عَلَى هٰذَا.

কোনো ব্যক্তির সম্পদ না থাকলে তার ওপর যাকাতের ইলম অর্জন করা ফরজ নয়। যখন সম্পদ দুইশত দিরহাম হবে, তখন এ

---

১. وَرَثَةُ الأنبياءِ شَرْحُ حديثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ পৃ. ২২

বিষয়গুলো জানা তার ওপর ফরজ হবে যে, সে এখান থেকে কত দিরহাম যাকাত আদায় করবে, কখন আদায় করবে এবং কোথায় আদায় করবে। অন্য বিষয়গুলোও অনুরূপ।[১]

গ. জান্নাতের উচ্চতর স্তর লাভ করার আমল :

জান্নাতের উচ্চতর স্তর লাভ করার জন্য উল্লিখিত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করার পর আমাদেরকে অন্যান্য নফল ইবাদাতসমূহ, যেমন : কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, নফল রোযা, নফল সালাতসমূহ, দান-সাদাকা ইত্যাদির ব্যাপারে অনেক বেশি মনোযোগী হতে হবে।

বাস্তবে দেখা যায়, আমরা অনেকেই 'চিরস্থায়ী জাহান্নামি হওয়া' থেকে বাঁচার ইলম অর্জনের ফিকির বাদ দিয়ে, 'সাময়িক সময়ের জন্যও জাহান্নামে না যাওয়া' এবং 'জান্নাতের উচ্চতর স্তর লাভ করা'র প্রয়োজনীয় ইলম নিয়ে মহাব্যস্ত থাকি। পুরো বিষয়টি মূলত সাধারণ মুসলমানদের উদাসীনতা, আর কারো কারো পদ-পদবী হারানোর ভয়, কারো কারো সত্য গোপন করা ও দুনিয়ার সম্পদের লোভ ছাড়া আর কিছু নয়!!! 'চিরস্থায়ী জাহান্নামি হওয়া থেকে বাঁচা'র জন্য প্রয়োজন আকিদার সংশোধন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন!

---

১. প্রাগুক্ত : ২২

আল আকিদাতুল হাসানাহ-এর ভূমিকা

সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রাহিমাহুল্লাহ

আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে মানুষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জ্ঞান লাভ করেছে, তা হলো আল্লাহর পরিচয় এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলি ও কর্মের জ্ঞান। এ জ্ঞান কেবল নবিদেরই ছিল। কারণ, এটি এমন জ্ঞান, যা অর্জন করার জন্য মানুষের কাছে কোনো মাধ্যম, উপায়-উপকরণ ও পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। কেবল অনুমান করে এ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। মানুষের মেধা ও বিচক্ষণতাও এতে কোনো উপকারে আসে না। কারণ, (ক) [মানুষ মূলত তুলনা করার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করে।] আর আল্লাহ তাআলাকে তুলনা করার মতো কোনো বস্তু নেই। (খ) আল্লাহর সত্তা সমুচ্চ, পবিত্র। তাঁর কোনো সদৃশ কিংবা প্রতিচ্ছবি নেই। (গ) মানুষের সকল জ্ঞান, পছন্দ এবং ইন্দ্রিয়জাগতিক ও বস্তুজাগতিক অভিজ্ঞতা থেকে আল্লাহ তাআলা বহু উর্ধ্বে। কারণ, তাঁর সত্তা কোনো প্রতিযোগিতা বা তর্কমঞ্চ নয়, যাতে যুক্তির পর যুক্তি দেওয়া যায় এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফুলঝুরি ঝরানো যায়! [তাই একমাত্র নবিদের থেকেই এই মহান জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।]

আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও কর্মসমূহের জ্ঞান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান, যার ওপর মানুষের সৌভাগ্য নির্ভরশীল। তা মানুষের আকিদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক, আদত-অভ্যাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তি। এ জ্ঞান দ্বারাই মানুষ নিজেকে চিনতে পারে; মহাবিশ্ব ও জীবনের রহস্য উন্মোচন করতে পারে। এর দ্বারাই মানুষ পৃথিবীতে নিজের অবস্থান নির্ধারণ করে এবং অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করে। জীবন চলার গতিপথ নির্মাণ করে। আস্থা, বিচক্ষণতা, স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসের আলোকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে।

তাই সকল যুগে প্রতিটি জাতি ও প্রজন্মের অসংখ্য মানুষ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আল্লাহ সংশ্লিষ্ট জ্ঞানার্জনের প্রতি মনোযোগী হয়েছে। প্রত্যেক নিবেদিতপ্রাণ মুখলিস ব্যক্তি এই জ্ঞান অর্জনের প্রতি আগ্রহী হয়েছে এবং এতে আত্মনিয়োগ করেছে, যারা ছিল নিজেদের ব্যাপারে কল্যাণকামী এবং জীবন ও গন্তব্যের ব্যাপারে যত্নশীল। কারণ, এই জ্ঞানের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকা, কিংবা অজ্ঞতার ভান করা– উভয়টিই ব্যক্তিকে নির্মমভাবে ঠেলে দেয় চূড়ান্ত দুর্ভাগ্য ও ভয়ানক অতল গহ্বরের দিকে!

আল্লাহ সংশ্লিষ্ট জ্ঞানার্জন বিষয়ে মানুষ দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে

প্রথম দল নবি-রাসুলদের থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের ওপর নির্ভর করেছে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা নবুওয়াত ও রিসালাত দিয়ে সম্মানিত করেছেন; মারেফাত ও কথোপকথন দ্বারা ধন্য করেছেন। তিনি তাঁদেরকে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যকার সেতুবন্ধন বানিয়েছেন। মানুষ তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয়, গুণাবলি ও তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপায়গুলো জেনেছে। আল্লাহ তাআলা কেবল তাঁদেরকেই দিয়েছেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইয়াকিন-বিশ্বাস, যার ওপর আর কোনো স্তর নেই। দিয়েছেন পরম উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, যার উর্ধ্বে আর কোনো আলো নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ.

আর এভাবেই আমি ইবরাহিমকে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব প্রদর্শন করাই। যেন সে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (সুরা আনআম : ৭৫)

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জাতি কোনো প্রকার ইলম ও নুর ছাড়াই আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির ব্যাপারে তাঁর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল। তখন সকল নবির মুখপাত্র হিসেবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাদেরকে বলেছেন– اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ

তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে বিবাদ করছো, অথচ তিনি আমাকে হেদায়েত দিয়েছেন? (সুরা আনআম : ৮০)

নবি-রাসুলগণের ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি এ দলটি আরো যেসকল কাজ করেছে তা হলো, মহাজগত নিয়ে চিন্তাভাবনা, আসমান-জমিনের সৃষ্টিতে গভীর ধ্যান, আল্লাহর নিদর্শনসমূহে গবেষণা, কুরআন পাকে গভীর চিন্তা, নেক আমল, তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন, নবিদের আদর্শের আলোকে অন্তরের পরিশুদ্ধি, যোগ্যতা ও বিবেকের ব্যবহার, বিশ্বতত্ত্ব (cosmology) ও যুক্তিবিদ্যা (logic) গবেষণা ইত্যাদি। এই কাজগুলো তারা করেছে কর্ম ও চিন্তায় পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে। ফলে তারা দেখলো, এগুলোর সবই একে অপরকে সত্যায়নকারী। এর মাধ্যমে তাদের অর্জিত ইয়াকিন-বিশ্বাস আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। [যারা প্রথমে ইলমে ওহির ওপর নির্ভর করে এবং তারপর এ ধরণের চিন্তাফিকির করে, তাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-] وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

তা [আল্লাহর প্রতি] তাদের ইমান ও [তাঁর বিধানের সামনে নিজেদের] সমর্পণ করাই কেবল বৃদ্ধি করেছে। (সুরা আহযাব : ২২)

অপর দলটি নির্ভর করেছে নিজেদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও মেধার ওপর। লাগামহীনভাবে তারা বুদ্ধির প্রয়োগ করেছে। অনুমানকে বানিয়েছে বিচারক। রসায়নবিদ্যা (Chemistry), প্রকৃতিবিদ্যা (Natural science) ও উদ্ভিদবিদ্যার (Botany) মতো, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলিকে তারা পঠন-পাঠন, অনুসন্ধান-বিশ্লেষণ ও বিভাজনমূলক বিদ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা বলে, 'তিনি এমন, তিনি এমন না।' তারা মূলত 'তিনি এমন না' কথাটাই 'তিনি এমন'-এর চেয়ে বেশি বলে। কারণ, যখন বিশ্বাস না থাকে, সাব্যস্ত ও প্রমাণ করার চাইতে অস্বীকার করাই তখন সহজ।

তাদের অধিকাংশ গবেষণা ও সিদ্ধান্তগুলো নেতিবাচক হয়ে থাকে। আর সভ্যতা নেতিবাচক মানসিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে

পারে না। এটা নবিদের শান নয়, যারা দেখেন, শোনেন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে কথা বলেন। তারা তাদের এই দর্শনকে 'ঐশ্বরিক দর্শন' বলে থাকে। অথচ এটা পরস্পর বিরোধী এবং ধারণাপ্রসূত একটি দর্শন, যার সপক্ষে আল্লাহ তাআলা কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। এ ব্যাপারে কোনো যুক্তি বা দলিল প্রতিষ্ঠিত নেই এবং মানুষের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিও একে সমর্থন করে না।

এ দলটির শীর্ষে ছিল গ্রিকরা। তারা প্রাচীনকাল থেকেই প্রখর মেধা, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, গভীর দর্শন, বাগ্মিতাপূর্ণ কবিতা ও সুউচ্চ শিল্পকলায় প্রসিদ্ধ ছিল, ধর্মতত্ত্বে যেগুলোর কোনোরকম দখল নেই। এগুলোর সাথে ইলমে ইলাহির দূরের বা কাছের, কোনো সম্পর্ক নেই। বস্তুত তারা নিজেদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা অপাত্রে ব্যয় করেছে। কাঁটা ও কাঁটাদার গাছ বেয়ে চলতে শুরু করেছে। তারা এমন গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত, যাকে ঢেকে রেখেছে কয়েক স্তরের তরঙ্গরাজি। তার ওপর রয়েছে মেঘমালা! এভাবে স্তরের ওপর স্তরে বিন্যস্ত আধারপুঞ্জ।

তাদের কাছে কোনো আলো নেই, যা দিয়ে তারা পথ চলবে। কোনো পথপ্রদর্শক নেই, যিনি দিকনির্দেশনা দেবেন। কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতাও নেই, যা তাদের হাত ধরবে এবং নেই কোনো প্রাথমিক জ্ঞানও, যার মাধ্যমে তারা অজানা কিছু জানবে!

বিপদের ওপর মহাবিপদ তো এই যে, এমনিতেই তারা ছিল প্রাচীনতম ঘোর মূর্তিপূজারি এবং অপসংস্কৃতি ও রূপকথার নিকৃষ্টতম বাহক, যা তাদের দর্শন, অনুভূতি, শিষ্টাচার ও ধর্মে অনুপ্রবেশ করে ছড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া জ্যোতির্বিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের মধ্যে ছিলো এক বিশেষ পৌত্তলিক দর্শন, যা তারা বংশপরম্পরায় লাভ করে এসেছে। এসবের ওপর বিপদের আরেক মাত্রা যোগ হয়েছে- দর্শন ও পৌত্তলিকতার মিশ্রণে তৈরি হয়েছে 'ঐশ্বরিক দর্শন'। এ দর্শন তাদের অনুসৃত ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্মিলন ঘটিয়েছে। তারা তাদের স্বেচ্ছাচারী মতামত ও সিদ্ধান্তগুলোকে অতিরঞ্জিত ও

ভয়ঙ্কর সব নামে নামকরণ করেছে। এরপর এগুলোকেই দর্শন ও সুসজ্জিত নির্মল শিল্পের পোশাক পরিয়ে বাজারজাত করেছে।

সাধারণ পাঠক থেকে শুরু করে বিভিন্ন জাতির গবেষকরা পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করেছে। [হিন্দুস্থানিরা ছাড়া, যারা নিজস্ব পৌত্তলিক দর্শনে প্রসিদ্ধ ছিল।] গণিতবিদ্যা (mathematics), প্রকৌশলবিদ্যা (Engineering) ও কিছু প্রকৃতিবিজ্ঞানে (Natural science) গ্রিকদের দক্ষতা ছিলো প্রচুর। তাই মানুষ বুঝে না-বুঝে জেনে না-জেনে তাদের দর্শন অনুসরণ করতে থাকে। এটি মানুষের প্রাচীন রোগ, যখন কোনো বিষয়ের দক্ষতা দেখে কারো অনুগত হয়, তখন কোনোরকম বিচার-বিশ্লেষণ না করে সবক্ষেত্রেই তাকে অনুসরণ করা শুরু করে। হুজ্জাতুল ইসলাম গায্যালি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'তাহাফুতুল ফালাসিফাহ' গ্রন্থের ভূমিকায় এবং ইবনে খালদুন রাহিমাহুল্লাহ 'মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুনে' এই বিষয়টির আলোচনা করেছেন।

যাইহোক, গ্রিকদের গবেষণা এবং মতামত তারা গ্রহণ করেছে প্রমাণিত ও সিদ্ধান্তমূলক হিসেবে, এবং এমন জ্ঞানগর্ভ বাস্তবতা হিসেবে যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, মুর্খ কিংবা একগুঁয়ে লোক ছাড়া কেউ যার বিরোধিতা করে না।

যে জাতি পূর্ব থেকেই তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি ভুলে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলো, হেদায়াত ও নুরের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছিলো, তাদের জন্য এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো উলামায়ে ইসলাম, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে রিসালাতে মুহাম্মদির মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন, হেদায়াতের উজ্জল দ্যুতি কুরআন দান করেছেন, তাদেরও অনেকে এই গ্রীক দর্শনের অনুসরণ শুরু করেন। অথচ আল্লাহ তাআলা তাদের যে কিতাব দান করেছেন তার বৈশিষ্ট্য হলো–

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

মিথ্যা তার নিকট আসতে পারে না- সম্মুখ দিক থেকেও না, পেছন দিক থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (সুরা ফুসসিলাত/হা-মিম সাজদাহ : ৪২)

এই দর্শনের সামনে তারা এমনভাবে নতি স্বীকার করেছে এবং তাতে গবেষণা শুরু করেছে- যেন এটি সর্বজনস্বীকৃত, বাস্তব তত্ত্বকথা ও অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি জ্ঞান! তারা গ্রিকদের প্রচুর অসার ধ্যানধারণা ও অলীক কল্পনাজল্পনা মেনে নিয়েছে। কখনো ইসলামের প্রতি ভালোবাসার তাগিদে, আবার কখনো নিজেদের দুর্বলতার কারণে, কুরআনের অনেক আয়াতকে তারা গ্রীক দর্শনের অনুগামী বানিয়ে ছেড়েছে। আয়াতের অপব্যাখ্যা করেছে কিংবা এমন ব্যাখ্যা করেছে যা 'ঐশ্বরিক গ্রীক দর্শনে' প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত।

এক্ষেত্রে তারা আরো যে বিপদের শিকার হয়েছে, তা হলো কিছু 'ভ্রান্ত আবশ্যকীয় বিষয়'[১], যেগুলো থেকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র। ফলে তারা আল্লাহ তাআলার অনেক নাম, গুণাবলি ও কর্ম অস্বীকার করে বসেছে। কারণ এগুলো সাব্যস্ত করতে হলে [তাদের ধারণায়] আল্লাহ তাআলাকে অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল বস্তুর সঙ্গে বিশেষায়িত করা হয়ে যায় [অথচ তিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব], তাঁর দেহ সাব্যস্ত হয়ে যায় [অথচ তাঁর কোনো সদৃশ নেই] এবং এমন আরো অনেক বিষয় সাব্যস্ত হয়ে যায়, যার থেকে অবিনশ্বর সত্তা মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র।

তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা, মানুষ ও মানুষের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার ওপর অনুমানের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তারা অনুমান করেছে- উক্ত 'আবশ্যকীয় বিষয়গুলো' ছাড়া এসব গুণাবলির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না এবং অভিজ্ঞতাও তা সমর্থন করে না। তারা বেমালুম ভুলে গেছে- সেগুলো আল্লাহ তাআলার গুণাবলি, যা উক্ত 'আবশ্যকীয় বিষয়গুলো' ছাড়াই সুন্দরভাবে সাব্যস্ত হতে পারে। এভাবেই তাদের একটি দল আল্লাহ

---

১. اللَّوَازِمُ الفَاسِدَةُ

তাআলার গুণাবলি নাকচ করে দেওয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ল। এদের মধ্যে তুলনামূলক ভালো হলো- যারা [গুণগুলো নাকচ করে দেয় না, তবে] তার এমন তাবিল বা ব্যাখ্যা করে, যা সেগুলোকে নাকচ করে দেওয়ারই নামান্তর। এর ফলে আল্লাহ তাআলার গুণাবলির মূলতত্ত্বই আর বাকি থাকে না।

আগ্রহ ও অভিপ্রায় ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও অনেকে তাদের পথে হেঁটেছে। ফলে কালামশাস্ত্রের উদ্ভাবন ঘটেছে এবং তা সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এ সময় মুসলিমদের প্রয়োজন ছিল এমন একদল আলেমের, যারা তাদের আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা প্রতিষ্ঠিত করবে কুরআন ও সুন্নাহর দর্পণে, যার ওপর সালাফগণ ইমান এনেছিলেন। আর এটাকেই তারা বানাবেন দীনের ভিত্তি। গ্রিকদর্শন ও অন্যান্য বিষয়কে তারা কেবল আলোচনা ও গবেষণাযোগ্য বিষয় মনে করবেন, যার কিছু অংশ গ্রহণ করা হবে, কিছু অংশ বর্জন করা হবে। তারা স্বাধীনভাবে ইলমি দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোর প্রতি গভীর নজর দেবেন; কোনো অন্ধ অনুসরণ বা নতিস্বীকার করবেন না। গ্রীক দার্শনিক ও তাদের অনুসারিদের কল্পনাপ্রসূত ও দাবিকৃত বিষয়গুলোর ততটুকুই গ্রহণ করবেন, যতটুকুর ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ইলমের মানদণ্ডে উন্নীত। অ্যারিস্টটল ও তার মতো অন্যান্য বিজ্ঞানীদেরকে ইলাহ মনে করবেন না এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মতো মাসুম মনে করবেন না।

মুসলমানদের প্রয়োজন ছিল এমন একদল মনীষীর, যারা চিন্তা-চেতনায় স্বাধীন, কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধারণকারী গবেষক, গ্রিকদর্শনের ধ্বংস আনয়নকারী, আর বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনা বিকাশের কারিগর। যারা কুরআন-সুন্নাহর গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান এবং দর্শন ও কালামশাস্ত্রের নীতিমালার সূক্ষ্ম ও গভীর গবেষণার মাঝে সমন্বয় সাধন করবেন। তারা প্রাচীন দর্শন ও দার্শনিকদের মুখোমুখি দাঁড়াবেন। কুরআনের ওপর ইমান আনবেন এবং তার এমন ব্যাখ্যা করবেন, যুক্তি ও দর্শন যা স্বীকার করবে এবং ইলম ও প্রমাণ যা সমর্থন করবে।

গ্রিকদের মুকাবিলাকারী মুমিনদের একটি দল হলো ওই সকল আলেম, যারা সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থিদের মিথ্যাচার এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে দীনকে মুক্ত রেখেছেন। এরা গ্রিকদর্শন ও তাদের কল্পনাপ্রসূত ভয়াবহ বিষয়গুলোর বিরোধিতা করেছেন এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলির ওপর ইমান এনেছেন। কোনো যুগই এমন আলেম থেকে খালি ছিল না। তাদের অন্যতম এবং প্রসিদ্ধ একজন হলেন ষষ্ঠ শতাব্দির বিশিষ্ট মনীষী শাইখুল ইসলাম হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ।[১]

---

১. আলি নাদাবি রাহিমাহুল্লাহর কথাগুলো দ্বারা আমার মনে হয়, –বাস্তবতা আল্লাহই ভালো জানেন– এখানে আশআরি ও মাতুরিদি উলামায়ে কেরামের অবদানকে খাটো করা হয়েছে! বস্তুত আশআরি ও মাতুরিদি আলেমগণ ইলমুল কালাম চর্চা করেছেন দুটি কারণে– ১. গ্রিকদর্শননির্ভর যে বাতিল মতবাদগুলো আছে, সেগুলোর বিরোধিতার জন্য এবং তাদের দাবি খণ্ডনের জন্য। ২. আকিদার ক্ষেত্রে আত্মিক প্রশান্তিবৃদ্ধির জন্য; কালামশাস্ত্র থেকে আকিদা গ্রহণের জন্য নয়।

উপরন্তু সালাফিগণ, যারা আসারি, আসহাবুল হাদিস এবং হাম্বলি নামেও পরিচিত, তাঁরাও নিঃসন্দেহে হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে হাফেজ ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুমাল্লাহর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময়টাতে যে সালাফিগণ ছিলেন, তাঁরা ভ্রষ্ট কালামপন্থিদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি এবং তাঁদের মাধ্যমে ভ্রান্ত কালামিরা নিশ্চিহ্ন হয়নি। বরং তখন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলেন মহান দুই ইমাম : আবুল হাসান আশআরি ও আবু মানসুর মাতুরিদি রাহিমাহুমাল্লাহ এবং তাঁদের অনুসারিবর্গ। তাঁদের অবদানে সাধারণ মানুষও হক জানতে পেরেছে এবং ভ্রান্ত কালামপন্থিরাও নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : 'দারুল উলুম দেওবন্দ : ...' পৃ. ৩৬৫-৩৯০, প্রথম মুদ্রণ ১৪২০; 'আল আকিদাতুস সাফিয়্যাহ' [আরবি] পৃ. ২০৯-২৫১, প্রথম মুদ্রণ ১৪৪৩।

উম্মাহর বরেণ্য মনীষীদের সাক্ষ্যমতে এবং তাঁর রচিত কিতাবাদির ভাষ্যমতে, কুরআন-সুন্নাহর সকল বিষয়াবলীর ওপর মজবুত ইমান এবং গ্রীকদর্শন ও যুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত সূক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞানের আশ্চর্য সমাবেশ ঘটেছে তাঁর মধ্যে। একদিকে তিনি ছিলেন সালাফে সালিহিনের আকিদার ওপর তুষ্ট-পরিতৃপ্ত; পূর্বলিখিত রচনাবলীর ওপর তাঁর জানাশোনার বিস্তৃতি ছিলো অকল্পনীয়, যার ওপর আর কোনো স্তর আশা করা যায় না। অপরদিকে গ্রীকদর্শন ও যুক্তিবিদ্যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ইসলামি মতবাদগুলো তিনি দমন করেছেন কঠিন হাতে; তাদের কর্মপদ্ধতি ও গবেষণাপত্রের বিরুদ্ধে করেছেন সুদৃঢ়, স্বাধীন ও সাহসী সমালোচনা।

উম্মাহর এ মহান মনীষী তাঁর জীবনসংগ্রামে একজন ছাত্র ও প্রতিনিধি পেয়ে যান, যিনি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তাঁর রেখে যাওয়া অস্পষ্ট বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ছড়িয়ে-থাকা জ্ঞানভাণ্ডারকে একত্রিত করেছেন এবং তাঁর অসম্পূর্ণ কাজগুলোকে পূর্ণ করেছেন। তিনি হলেন হাফেজ ইবনুল কাইয়িম জাওযি। রাহিমাহুল্লাহ।

এ দুজন মনীষীর সঙ্গে স্মরণ করার মতো আরেকজন মহান ব্যক্তিত্ব হলেন, শাইখুল ইসলাম হাকিমুল উম্মত শাইখ আহমাদ বিন আবদুর রহিম। তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি [১১১৪-১১৭৬ হি.] নামেই বেশি প্রসিদ্ধ।[১] সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' তাঁরই অনবদ্য রচনা।

---

১. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন আশআরি আকিদার একজন আলেম। তিনি সালাফি ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুমাল্লাহর মাজহাব অনুসরণ করেননি। ভারতের পাটনার খোদাবখশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত 'সহিহ বুখারি'র একটি নুসখার শেষে এই বিষয়টি তিনি নিজেই লিখেছেন। আমাদের মুহতারাম উস্তাদ হজরত সাইদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ

সুন্নি-সালাফি আকিদা ও গ্রীকদর্শন- উভয় শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। একদিকে তিনি ছিলেন পবিত্র কুরআনের সূক্ষ্ম বুঝের অধিকারী, হাদিসের ব্যাপারে বিস্তর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, শরিয়তের নিগূঢ় রহস্যসমূহের জ্ঞানসম্পন্ন। অপরদিকে গ্রিকদর্শন, ইলমুল হিকমাহ (Wisdom) এবং ইলমুত তাসাউফ (Sufi studies)-এর শিক্ষা-দীক্ষায়ও তাঁর অবস্থান ছিলো নিবিড় ও সুপরিসর।

তিনি ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন।[১] তাঁর হাত ধরেই হিন্দুস্তানে ইলমুল হাদিস (Hadith studies)-এর প্রচার-প্রসারের সূচনা হয়। তিনি হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসিনে কেরামের ওপর আরোপিত অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। ইসলামের সমৃদ্ধ ও প্রাচুর্যময় রচনাসম্ভারে তিনি যুক্ত করেছেন মাকাসিদে শরিয়াহ বিষয়ক চমকপ্রদ ও অনুপম বহু গ্রন্থ।[২]

[১৩৬০-১৪৪১ হি.] 'আল ফাউযুল কাবির'-এর আরবি অনুবাদের ভূমিকায় তা উল্লেখ করেছেন। শাহ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন–

'এটি লিখেছেন দয়াময় আল্লাহর রহমতের ভিখারি ওয়ালিউল্লাহ বিন আহমাদ...। আল্লাহ তাকে ও তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং সালাফে সালিহিনের সাথে মিলিত করুন। তিনি বংশগতভাবে উমরি, জন্মগতভাবে দেহলবি [দিল্লির অধিবাসী], আকিদায় আশআরি, তরিকায় সুফি, আমলে হানাফি, পাঠদানে হানাফি শাফিয়ি। তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আরবিভাষা ও কালামশাস্ত্রের খাদেম। প্রত্যেকটি শাস্ত্রেই তার রয়েছে বিভিন্ন রচনাবলি ও বইপুস্তক। শুরুতে এবং শেষে, প্রকাশ্যে এবং গোপনে সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। তিনি মহামহিম ও সম্মানিত। ১১৫৯ হিজরির ২৩ শাওয়াল, মঙ্গলবার।'

১. বহু গ্রন্থ প্রণেতা আমির সিদ্দিক হাসান খান বলেন, তিনি যদি প্রথম যুগে হতেন, বড় বড় মুজতাহিদদের অন্তর্ভুক্ত হতেন। [এ টীকাটি আল্লামা নাদাবির মূল কিতাব العقيدةُ والعبادةُ والسُّلُوْكُ থেকে সংগৃহিত।]

২. তাঁর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানি রচিত نُزْهَةُ الخَوَاطِرِ ষষ্ঠ খণ্ড, دَائِرَةُ المَعَارِفِ হায়দারাবাদ, ভারত। [প্রাগুক্ত]

তাঁরা এবং তাঁদের মতো মনীষীরাই ইসলামি আকিদা উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যার যথাযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁরা যেমন ভাসাভাসা জ্ঞান ও স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট লোক ছিলেন না; আবার অস্বীকারকারী ও অপব্যাখ্যাকারীও ছিলেন না, যারা বক্তব্যকে মূল অর্থ থেকে সরিয়ে দেয়। তাঁদের অবস্থান ছিল এই দুয়ের মাঝামাঝি, ভারসাম্যপূর্ণ। তাঁরা যুক্তি ও বর্ণনার মধ্যে, শরিয়াহ ও হিকমাহর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। তাঁরা কালামশাস্ত্রের (theologians) রীতিনীতি সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত ছিলেন। কুরআন-সুন্নাহ এবং পূর্বসূরিদের আকিদাকে হৃদয়ে ধারণকারী ছিলেন। আমাদের মাদরাসা ও জামিয়াগুলোতে যে কিতাবগুলোর ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেগুলোর চেয়ে এ ধরণের মনীষীদের কিতাবাদি ও রচনাবলি পাঠদান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অধিক গুরুত্বের দাবিদার।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহর 'আল আকিদাতুল হাসানাহ' পুস্তিকাটি একটি সংক্ষিপ্ত ও সুসংহত মতন [মূলপাঠ], যা উপস্থাপনের দিক থেকে সাবলীল ও মর্মগতভাবে সূক্ষ্ম। লেখক এতে আকিদা ও ইলমুত তাওহিদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সারনির্যাস তুলে ধরেছেন, যেগুলো সম্পর্কে কোনো জ্ঞানপিপাসু অজ্ঞ থাকতে পারে না! তাই সংক্ষেপে ইসলামি আকিদা উপস্থাপনের জন্য এই রিসালাটিকেই আমরা ভিত্তি বানিয়েছি এবং সালাফদের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি যেমন, আকিতাতুত তাহাবি ও আকায়েদের ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ অন্যান্য গ্রন্থ থেকে কিছুটা সংযোজন-সহায়তা গ্রহণ করেছি।[১]

---

১. আল্লামা নাদাবি রাহিমাহুল্লাহ রচিত العقيدةُ والعبادةُ والسُّلُوْكُ পৃ. ৬১-৬৯ দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪৩৩ হিজরি, দারু ইবনি কাসির, দামেশক।

‘আল আকিদাতুল হাসানাহ’ সম্পর্কে

হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ একজন নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব। ভারতের আলেমসমাজের মধ্য হতে বিশেষ করে দেওবন্দের আলেমসমাজ তাঁর দিকে সম্পৃক্ত। সকলের সনদ তাঁর কাছে গিয়েই মিলিত হয়। কেবল ইলমি সনদ নয়; সকলের চিন্তাগত, কর্মগত ও শিক্ষাদীক্ষামূলক সনদও তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। সমুদ্রতুল্য এই মহান মনীষী কর্মগত ও সংস্কার আন্দোলনের যে পতাকা উড্ডীন করেছিলেন, তাঁর শহর ও মাদরাসায় অবস্থানকারী উত্তরসূরিদের পর দেওবন্দের আলেমসমাজই সেই পতাকা বহন করেছেন। অতএব তাঁর আকিদাই উলামায়ে দেওবন্দের আকিদা এবং তাঁর মানহাজই উলামায়ে দেওবন্দের মানহাজ। এ কারণেই আমি [উবাইদুল্লাহ আসআদি] তাঁর ‘আল আকিদাতুল হাসানাহ’ পুস্তিকাটি উলামায়ে দেওবন্দের আকিদা বর্ণনার শুরুতেই উল্লেখ করা ভালো মনে করছি। যেন এটি তাঁদের আকিদা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা হয়।

[‘দারুল উলুম দেওবন্দ : ...’ পৃ. ৪৬২ দ্রষ্টব্য।]

আল আকিদাতুল হাসানাহ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবি সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবির ওপর।

হামদ ও সালাতের পর, মহান আল্লাহর রহমতের ভিখারি আহমাদ [ডাকনাম ওয়ালিউল্লাহ] বিন আবদুর রহিম [আল্লাহ তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করুন] আরজ করছেন : আমি আল্লাহ তাআলা এবং উপস্থিত ফেরেশতা, জিন ও মানুষদের সাক্ষী রেখে বলছি,

আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে বিশ্বাস করি–

বিশ্বজগতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন।

তিনি অনাদি, অনন্ত।

তাঁর অস্তিত্ব আবশ্যক।

তাঁর বিদ্যমান না থাকা অসম্ভব।

তিনি সুমহান ও সমুচ্চ।

তিনি পূর্ণতার সকল গুণে গুণান্বিত।

তিনি ত্রুটি ও বিলুপ্তির সকল লক্ষণ থেকে পবিত্র।

তিনি সকল মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা।

তিনি সকল জ্ঞাত জিনিস সম্পর্কে অবগত।

তিনি সম্ভাব্য সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।

বিদ্যমান সকল বিষয় তাঁর ইচ্ছাধীন।

তিনি চিরঞ্জীব, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

তাঁর কোনো সদৃশ নেই।

তাঁর কোনো প্রতিপক্ষ নেই।

তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই।

তাঁর অনুরূপ কেউ নেই।

অস্তিত্ব আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরিক নেই।

ইবাদতের উপযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরিক নেই।

সৃষ্টি ও পরিচালনায় তাঁর কোনো শরিক নেই।

অতএব ইবাদত তথা সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত একমাত্র তিনি।

তিনি ছাড়া কেউ অসুস্থকে সুস্থতা দান করতে পারে না, জীবিকা দিতে পারে না এবং কোনো ক্ষতি দূরীভূত করতে পারে না।

তাঁর এসকল ক্ষমতা এই অর্থে যে, তিনি যখন বলেন 'হও', অমনি তা হয়ে যায়। বাহ্যিক স্বাভাবিক মাধ্যম অর্থে নয়। যেমন বলা হয়, 'ডাক্তার রোগীকে সুস্থ করেছেন', কিংবা 'সেনাপতি সৈন্যদের খাবার দিয়েছেন'। এগুলো আল্লাহর ক্ষমতার মতো নয়, যদিও শব্দগত মিল পাওয়া যায়।

তাঁর কোনো সাহায্যকারী নেই।

তিনি কারো মধ্যে প্রবেশ করেন না এবং কারো সাথে মিশে একীভূতও হয়ে যান না।

তাঁর সত্তায় কোনো নতুন জিনিস যুক্ত হয় না। সুতরাং তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে নতুনত্ব বলতে কিছু নেই। নতুনত্ব মূলত গুণগুলো যার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় সেই সম্পৃক্ততার মধ্যে। বস্তুত সম্পৃক্ততাটাও নতুন নয়। নতুন মূলত ঐ জিনিসগুলো, যেগুলোর সঙ্গে গুণগুলো যুক্ত হয়। তাই যখন যুক্ত হওয়ার বিষয়গুলো প্রকাশ পায়, তখন সেগুলোর

ভিন্নতা অনুপাতে সম্পৃক্ততার বিধানগুলো ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। তিনি সকল বিবেচনায় নতুনত্ব ও অভিনবত্ব থেকে মুক্ত।

তিনি জাওহার নন এবং আরয নন।

তাঁর কোনো দেহ নেই।

তিনি কোনো স্থান বা দিকে নন।

'এখানে' বা 'সেখানে' বলে তাঁর দিকে ইশারা করা যায় না।

তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে নড়াচড়া, স্থানান্তর ও পরিবর্তন প্রযোজ্য হয় না।

তিনি অজ্ঞতা ও মিথ্যা থেকে পবিত্র।

তিনি আরশে ইসতিওয়া গ্রহণ করেছেন, যেভাবে স্বয়ং বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু তা স্থান ও দিক হিসেবে নয়; বরং এই 'ইসতিওয়া গ্রহণ'-এর মূলরূপ একমাত্র তিনিই জানেন এবং সেসকল গভীর ইলমের অধিকারী ব্যক্তিরা, আল্লাহ যাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ইলম দান করেছেন।

তিনি কিয়ামতের দিন দুইভাবে মুমিনদের দৃষ্টিগোচর হবেন–

১. মানুষ নিজ বিবেক খাটিয়ে যতটুকু পরিচয়ের ভিত্তিতে আল্লাহর ওপর ইমান আনে, তার চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে তিনি মানুষের সামনে প্রকাশ হবেন। যেন তা চোখে দেখা। তবে এতে মুখোমুখি ও সামনাসামনি হওয়ার বিষয় থাকবে না। কোনো দিক, রং বা আকৃতি কিছুই থাকবে না। মুতাজিলা ও অন্যান্যরা এতটুকু বলে। আর এটুকু সঠিক। তবে তাদের ভুল হলো, 'দেখা'কে এ অর্থ দ্বারা ব্যাখ্যা করা, কিংবা 'দেখা'কে এ অর্থে সীমাবদ্ধ করা।

২. তিনি বিভিন্ন আকৃতিতে মানুষের সামনে প্রকাশ হবেন, যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। ফলে মানুষ তাঁকে আকৃতি ও বর্ণ সহকারে মুখোমুখি অবস্থায় নিজ চোখে দেখবে। যেমনটি স্বপ্নে

হয়ে থাকে। যেভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি আমার প্রতিপালককে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতিতে দেখেছি।' অতএব মানুষ তাঁকে সেখানে স্বচক্ষে দেখবে, যেভাবে দুনিয়াতে স্বপ্নে দেখে।

এই দুটো পন্থা আমরা বুঝি ও বিশ্বাস করি। যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল 'দেখা' দ্বারা ভিন্ন কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, তবে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যের ওপর ইমান রাখি, যদিও আমরা তার মূলরূপ না জানি।

তিনি যা চান, তা-ই হয়; যা চান না, তা হয় না। অতএব, কুফর ও গুনাহ তাঁর সৃষ্টি; তাঁর ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়, তবে তাঁর সন্তুষ্টিতে নয়।

তিনি অমুখাপেক্ষী; সত্তা ও গুণাবলিতে তিনি কোনো জিনিসের মুখাপেক্ষী নন।

তাঁর ওপর কোনো বিচারক নেই। অন্য কারো চাপানো দ্বারা তাঁর ওপর কোনো কিছু আবশ্যক হয় না। অবশ্য, তিনি কখনো ওয়াদা করে তা পূর্ণ করেন। যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে– 'সে আল্লাহর দায়িত্বে'।

তাঁর সকল কাজেই হিকমত ও সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

তাঁর ওপর বিশেষ আংশিক দয়া অথবা বিশেষ অধিক কল্যাণকর কাজ করা আবশ্যক নয়।

তাঁর থেকে কোনো খারাপ কাজ প্রকাশ পায় না।

তিনি যা করেন কিংবা যে নির্দেশ দেন, সে কারণে তাঁকে জালেম ও অত্যাচারী বলা যায় না।

তিনি যা সৃষ্টি করেন ও যে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাতে হিকমতের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

এমন নয় যে, কোনো জিনিস দ্বারা তাঁর সত্তা ও গুণাবলি পূর্ণতা লাভ করে, কিংবা তা দ্বারা তাঁর কোনো প্রয়োজন বা লক্ষ্য পূরণ হয়! কারণ এটা দুর্বলতা ও নিন্দনীয়।

তিনি ছাড়া কোনো বিচারক নেই।

অতএব কোনো বস্তু ভালো বা মন্দ হওয়া এবং কোনো কাজ সওয়াব বা শাস্তির কারণ হওয়ার ক্ষেত্রে বিবেকের কোনো দখল নেই। বরং বস্তু ভালো বা মন্দ বিবেচিত হয় আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত ও ফায়সালায় এবং বান্দার প্রতি তাঁর আদেশের ভিত্তিতে।

সেগুলোর মধ্যে কতক এমন, যার কারণ, কল্যাণ এবং সওয়াব ও শাস্তির উপযুক্ত হওয়ার বিষয়টি বিবেক বুঝতে পারে। আর কতক এমন, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসুলগণের সংবাদ প্রদান ছাড়া বিবেক বুঝতে পারে না।

আল্লাহ তাআলার প্রতিটি গুণ সত্তাগতভাবে এক; সম্পৃক্ততা ও নতুনত্বের বিচারে অনেক। উল্লিখিত ব্যাখ্যা অনুসারে নতুনত্ব মূলত যার সঙ্গে গুণটি যুক্ত হয়, তাতে।

আল্লাহ তাআলার অনেক ফেরেশতা রয়েছেন।

তাঁরা ঊর্ধ্বে বসবাস করেন।

তাঁরা আল্লাহর সান্নিধ্যভাজন।

কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করার কাজে।

কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত মানুষকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার কাজে।

কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত কল্যাণের প্রতি আহ্বানের কাজে। তাঁরা মানুষের ওপর কল্যাণের পরশ বুলিয়ে থাকেন।

তাঁদের প্রত্যেকেরই রয়েছে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব।

তাঁরা আল্লাহর কোনো আদেশের অবাধ্যতা করেন না; তা-ই করেন যা তাঁদের আদেশ করা হয়।

আল্লাহ তাআলার একটি সৃষ্টি হলো শয়তান। মানুষের ওপর তার মন্দ স্পর্শ রয়েছে।

কুরআন আল্লাহর কালাম।

আল্লাহ তাআলা এটি আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহিরূপে নাযিল করেছেন-

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ.

কোনো মানুষের এ যোগ্যতা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন, ওহির মাধ্যম ব্যতীত, অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে, অথবা তিনি কোনো দূত পাঠাবেন, অতঃপর তিনি [আল্লাহ] যা চান, সে তাঁর অনুমতিক্রমে তা প্রেরণ করে। (সুরা শুরা : ৫১) এটাই ওহির প্রকৃত মর্ম।

আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলিতে বিকৃতি [ইলহাদ] জায়েয নেই, তাই শরিয়তে বর্ণিত শব্দাবলি ব্যবহারের ওপর ক্ষান্ত থাকতে হবে।

মানুষের দেহসমূহ সমবেত করে দৈহিক পুনরুত্থানের বিষয়টি সত্য ও প্রমাণিত। তখন তাতে রুহসমূহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মানুষকে ওই সকল দেহই দেওয়া হবে যা দুনিয়াতে ছিলো; যদিও কারো দেহ বৃহদাকারের হবে, আর কারো হবে স্বাভাবিক গড়নের। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, কাফেরের মাড়ির দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মতো! জান্নাতবাসীদের বর্ণনায় এসেছে, তাঁরা হবেন হালকা গড়নের। এ পরিবর্তন ঠিক সেভাবেই হবে, যেভাবে শিশুই যুবক হয়, তারপর বৃদ্ধ হয়। যদিও দেহের অঙ্গসমূহে হাজারবার পরিবর্তন হয়।

পুনরুত্থানকালে মানুষকে দুনিয়ার দেহগুলোই দেওয়ার বিষয়টি শরিয়তের দলিল ও প্রথাগত দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

ভালো-মন্দের প্রতিদান, হিসাব-নিকাশ, পুলসিরাত এবং মিজান সত্য।

জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। এ দুটি বর্তমানে বিদ্যমান আছে। তবে এগুলো বর্তমানে কোথায়, এ বিষয়ে কুরআন-হাদিসে কিছু উল্লেখ নেই। বরং আল্লাহ তাআলা যেখানে চেয়েছেন, সেখানেই আছে। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও জগতসমূহের ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান নেই।

কবিরা গুনাহে লিপ্ত মুসলমান জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ.

তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর, তোমরা যদি তা থেকে বিরত থাক, তাহলে আমি তোমাদের লঘুতর পাপগুলো মোচন করব। (সুরা নিসা : ৩১) অর্থাৎ সালাত ও কাফফারা দ্বারা মিটিয়ে দেব।

আল্লাহ তাআলা কবিরা গুনাহও ক্ষমা করতে পারেন। বস্তুত দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তাআলার কর্মসমূহ দু-ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে– ১. নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে। ২. স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে। যেসকল মানুষ তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাআলা চাইলে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে তাদের কবিরা গুনাহও ক্ষমা করতে পারেন। অনুরূপ বান্দার হক বিনষ্ট করার গুনাহও স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীতে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন। এই হলো বাহ্যত পরস্পরবিরোধী আয়াত ও হাদিসগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের পদ্ধতি।

শাফাআত সত্য। আল্লাহ তাআলা যাকে শাফাআতের অনুমতি দেবেন, সে শাফাআত করতে পারবে।

উম্মাহর কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর রাসুলের শাফাআত সত্য। তাঁর শাফাআত গ্রহণ করা হবে। যেসকল বর্ণনায় শাফাআত গৃহীত না হওয়ার কথা এসেছে, সেগুলো দ্বারা ওই শাফাআত উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ তাআলার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত হবে।

ফাসিকের কবরের আযাব সত্য।

ইমানদারকে কবরে আরামদায়ক জীবন দান করার বিষয়টি সত্য।

মুনকার-নাকিরের প্রশ্ন সত্য।

মাখলুকের নিকট রাসুল প্রেরণের বিষয়টি সত্য।

রাসুলদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বান্দাদেরকে আদেশ-নিষেধ পালনের দায়িত্বশীল বানানোর বিষয়টি সত্য।

তাঁরা [রাসুলগণ] এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে অনন্য, যা সামষ্টিকভাবে তাঁদের ছাড়া অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। এগুলো তাঁদের নবি হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

তন্মধ্যে একটি হলো, তাঁদের দ্বারা মুজিযা তথা স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত বিষয় প্রকাশ পাওয়া।

তাঁদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁদের স্বভাব-প্রকৃতি নিখুঁত এবং নৈতিকতা পূর্ণাঙ্গ। এছাড়াও তাঁদের রয়েছে আরো অনেক বৈশিষ্ট্য।

নবিগণ কুফর ও ইচ্ছাকৃত কবিরা গুনাহ করা এবং সগিরা গুনাহে অবিচল থাকা হতে পবিত্র।[১] আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে নিষ্পাপ রেখেছেন তিনভাবে–

---

১. নবিগণ কবিরা ও সগিরা সবধরণের গুনাহ থেকে পবিত্র। বিষয়টি এ বইয়ের ১৩৭-১৩৮ নং পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করা হয়েছে।

১. তিনি তাঁদেরকে সৃষ্টি করেছেন নিষ্কলুষ স্বভাব-প্রকৃতি এবং চারিত্রিক পূর্ণ ভারসাম্য দিয়ে। ফলে তাঁরা গুনাহের প্রতি আগ্রহী হন না; বরং গুনাহকে অপছন্দ করেন।

২. তিনি তাঁদের নিকট এই মর্মে ওহি প্রেরণ করেছেন যে, পাপ করলে শাস্তি দেওয়া হয়, আর আনুগত্য করলে সওয়াব দেওয়া হয়। এই ওহি তাঁদেরকে গুনাহ থেকে বিরত রেখেছে।

৩. আল্লাহ তাআলা কোনো সূক্ষ্ম অদৃশ্য জিনিস সামনে আনার মাধ্যমে তাঁদের এবং গুনাহের মাঝে অন্তরাল হয়ে যান। যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনায়, আঙ্গুল কামড়ে ধরা অবস্থায় ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আকৃতি প্রকাশ করা।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবি। তাঁর পর কোনো নবি নেই। তাঁর দাওয়াত সমগ্র মানবজাতি ও জিনজাতির জন্য ব্যাপক। তিনি এই বৈশিষ্ট্য এবং এ জাতীয় অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দ্বারা সকল নবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ওলিদের কারামত সত্য। আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা কারামাত দ্বারা সম্মানিত করেন। তিনি যাকে চান, তাকে নিজ রহমত বিশেষভাবে দান করেন। উল্লেখ্য, ওলি ওই সকল ইমানদারদেরকে বলা হয়, যারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে অবগত এবং নিজেদের ইমানের ক্ষেত্রে মুখলিস।

আমরা আশারায়ে মুবাশশারা এবং ফাতিমা, খাদিজা, আইশা, হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমের জন্য জান্নাত ও কল্যাণের সাক্ষ্য প্রদান করি। তাঁদের শ্রদ্ধা করি এবং ইসলামে তাঁদের মহান মর্যাদা স্বীকার করি। বদর ও বাইআতে রিযওয়ানের সদস্যদের জন্যও অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন সত্য ইমাম। তারপর উমর, তারপর উসমান,

তারপর আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুম। এরপর খিলাফাত পূর্ণ হয়ে গেছে। তারপর এসেছে ক্ষমতার লড়াইয়ের রাজত্ব।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তারপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। শ্রেষ্ঠত্ব বলতে আমরা বংশ, বীরত্ব, শক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি সবদিকের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাই না। বরং উদ্দেশ্য হলো, ইসলাম তাঁদের মাধ্যমে বেশি উপকৃত হয়েছে।

উম্মাহর আমির হলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর উজির হলেন, সত্য প্রচারে উচ্চাভিলাষী আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটি কাজ ছিল– এক. তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে [দীন] গ্রহণ করতেন। দুই. মাখলুকের নিকট তা পৌঁছাতেন। মাখলুকের নিকট [দীন] পৌঁছানো, তাদের মধ্যে মিল-মহব্বত পয়দা করা এবং [হক প্রতিষ্ঠার জন্য] যুদ্ধ পরিচালনা [প্রভৃতি] ক্ষেত্রে তাঁদের [আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার] বড় ভূমিকা রয়েছে।

আমরা আমাদের জিহ্বাকে সাহাবিদের ভালো ব্যতীত অন্য কিছু বলা থেকে বিরত রাখি। দীনি বিষয়ে তাঁরা আমাদের ইমাম ও নেতা। তাঁদের শ্রদ্ধা করা ওয়াজিব, নিন্দা করা হারাম।

আমরা কোনো আহলে কিবলাকে কাফের আখ্যা দিই না; তবে যদি তার মধ্যে এমন কিছু থাকে, যদ্বারা স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী, মহাশক্তিশালী স্রষ্টা আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করা হয়, অথবা গাইরুল্লাহর ইবাদত করা হয়, কিংবা পরকাল, নবি অথবা জরুরিয়াতে দীনের অন্য কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা হয়, তাহলেই কেবল কাফের আখ্যা দিই।

সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজ থেকে বারণ করা ওয়াজিব। শর্ত হলো, তা যেন ফিতনার কারণ না হয় এবং 'ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে' এই ধারণা বদ্ধমূল থাকে।

এই হলো আমার আকিদা। প্রকাশ্যে ও গোপনে এ সকল বিশ্বাস পোষণ করার মাধ্যমে আমি আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করি। শুরুতে ও শেষে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্যই।[১]

তাকদিরের ভালো-মন্দ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত। যা কিছু অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং যা অস্তিত্ব লাভ করবে, সবকিছুই আল্লাহ তাআলার সত্তাগত চিরন্তন ইলমের আওতায় রয়েছে। প্রতিটি জিনিস অস্তিত্বে আসার পূর্বে তিনিই তা অস্তিত্বে আসার বিষয়টি নির্ধারণ করেন।

ব্যক্তি যতো বড় ওলি, পীর কিংবা মুজাহিদই হোক-না কেন, তার শরয়ি দায়িত্ব রহিত হয় না। ফরজ কাজসমূহ আদায়ের দায়িত্ব তার ওপর সর্বদা বহাল থাকে। যতক্ষণ তার অনুভূতি সুস্থ ও সচেতন থাকে, কোনো হারাম বস্তু তার জন্য হালাল হয় না।

---

১. হজরত দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'আল আকিদাতুল হাসানাহ' পুস্তিকা এ পর্যন্তই। ... دارُ العُلُومِ دِيُوبَنْد : مَدْرَسَةٌ فِكْرِيَّةٌ تَوْجِيهِيَّةٌ কিতাবের ৪৬৮ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে,

هذه الزيادة زادَها الشيخ أبو الحسَن عليّ الحسَنيُّ الندويُّ، -وهو من علماء ديوبند انتماءً واستفادةً من دار العلوم- في كتابه «العقيدة والعبادة والسُّلوك» آخِذًا من كُتب العقائد وعلم التوحيد لبعض كبار علماء السُّنَّة [راجِع الكتابَ ص ٧٧-٨٣]، وهي زيادةٌ غيرُ مستنكَرَةٍ من الجماعة.

অর্থাৎ নিম্নের উক্তিগুলো সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রাহিমাহুল্লাহ -এর পক্ষ থেকে যুক্ত। আর তিনিও একজন দেওবন্দি মহান মনীষী।

নবুওয়াত সর্বাবস্থায় বিলায়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। সর্বশ্রেষ্ঠ ওলিও একজন সাধারণ সাহাবির মর্যাদায় পৌঁছুতে পারেন না। ওলিদের ওপর সাহাবিদের শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচ্য হয় অধিক সওয়াব ও কবুলিয়াতের ভিত্তিতে, অধিক আমলের ভিত্তিতে নয়।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সকল সাহাবিকে ন্যায়পরায়ণ মনে করেন। তবে নিষ্পাপ মনে করেন না। যে বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে, সে বিষয়ে তারা চুপ থাকেন।

আমরা সকল নবি-রাসুল ও তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহের ওপর ইমান রাখি। [ইমান আনার ক্ষেত্রে] রাসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।

ইমান হলো মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্তরে বিশ্বাস করার নাম।

বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি এবং বান্দার অর্জন।

আমরা কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করি, হাদিসে যেভাবে আছে সেভাবে।

আমরা মনে করি, জামাতবদ্ধতা হলো হক ও সাওয়াবের কাজ, আর বিচ্ছিন্নতা হলো বক্রতা ও আযাব।

[পরিশিষ্টসহ ‘আল আকিদাতুল হাসানাহ’ সমাপ্ত হলো।]

কুরআন-হাদিস ও আকাবির-আসলাফের অনুসরণের পদ্ধতি বিষয়ে

আকাবিরে দেওবন্দের মূলনীতি

দারুল উলুম দেওবন্দের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে[১] এ বিষয়ে দেওবন্দের আকাবির রাহিমাহুমুল্লাহর কর্মপন্থা এভাবে তুলে ধরা হয়েছে–

'দারুল উলুম দেওবন্দের আকাবিরদের এই জামাত কুরআন-সুন্নাহ থেকে আলোগ্রহণ ব্যতীত পূর্বসূরি আলেমদের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর করেননি। তারা সালাফের ইলমি ঐতিহ্য, রুচি ও নির্দেশনা থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে কুরআন-সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে নিজেদের মত-অভিমতের ওপর একগুঁয়ে হননি। বরং তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সালাফের অনুসরণ করা এবং সালাফের মত-অভিমত ও বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত ইলমি রুচির আলো গ্রহণ করে কুরআন-সুন্নাহর উদ্দেশ্য বোঝা। কিতাব ও রিজালের এই সমন্বয়ের ফলে তারা চিন্তা ও কর্মে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হননি।'[২]

তাই আমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে আলোগ্রহণ ব্যতীত কোনো আলেমের ওপর, –এমনকি তিনি দেওবন্দের সর্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তি হলেও–, পরিপূর্ণ নির্ভর করি না। এবং সালাফে সালিহিনের ইলমি রুচির আলো গ্রহণ করে কুরআন-সুন্নাহর উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চিন্তা ও কর্মে সরল পথে অবিচল রাখুন। আমিন!

---

১. তারিখ ৩, ৪, ৫ জুমাদাল উলা ১৪০০ হিজরি মোতাবেক ২১, ২২, ২৩ মার্চ ১৯৮০ ইসায়ি, শুক্র, শনি ও রবিবার।

২. এ অনুবাদের মূল আরবি ইবারতের জন্য, শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে দারুল উলুম থেকে প্রকাশিত الدَّاعِيْ সাময়িকীর ৮০ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবি সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবির ওপর।

হামদ ও সালাতের পর, মহান আল্লাহর রহমতের ভিখারি আহমাদ [ডাকনাম ওয়ালিউল্লাহ] বিন আবদুর রহিম [আল্লাহ তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করুন] আরজ করছেন : আমি আল্লাহ তাআলা এবং উপস্থিত ফেরেশতা, জিন ও মানুষদের সাক্ষী রেখে বলছি–

বিশ্বজগতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন

সৃষ্টিকর্তা ছাড়া বিদ্যমান যত জিনিস রয়েছে, যেগুলো দ্বারা সৃষ্টিকর্তার পরিচয় মেলে, তা-ই বিশ্বজগত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِیْ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْیَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِیْفِ الرِّیٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ.

সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের ৮টি প্রমাণ

নিশ্চয় আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের বিবর্তনে, মানুষের উপকারি বস্তু নিয়ে সমুদ্রে যে নৌযান চলে তাতে, আল্লাহ

আকাশ থেকে যে পানি [বৃষ্টি] বর্ষণ করেন তাতে, অতঃপর তা দ্বারা জমিনকে নির্জীব হওয়ার পর সজীব করাতে, জমিনে তিনি যেসকল প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন তাতে, বাতাসের প্রবাহে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মাঝে ঝুলে-থাকা-মেঘপুঞ্জে, বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য [স্রষ্টার অস্তিত্বের] অনেক নিদর্শন রয়েছে। (সুরা বাকারা : ১৬৪)

শাইখ মুহাম্মাদ আলি সাবুনি রাহিমাহুল্লাহ [১৯৩০-২০২১ ই.] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

এ আয়াতে স্রষ্টার অস্তিত্বের ৮টি দলিল রয়েছে।

১. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি। এতে যেসকল বিস্ময়কর শিল্প ও কুদরতের নিদর্শন রয়েছে, মানব-বিবেক তা আয়ত্ব করতে অক্ষম।

২. রাত ও দিনের পরিবর্তন। এতে যে সুদৃঢ় ও সূক্ষ্ম শৃঙ্খলা রয়েছে– রাত যায় দিন আসে, দিন যায় রাত আসে; কখনো দিন বড় হয় [রাত ছোট হয়], আবার কখনো দিন ছোট হয় [রাত বড় হয়]। এগুলো সবই হয় মহান আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত রীতিতে।

৩. সমুদ্রে চলাচলকারী বিশাল বিশাল নৌযানসমূহ। এগুলো সমুদ্রের বুক চিরে পানির ওপর ভেসে চলে, ডুবে যায় না। অথচ তা মানুষ ও ভারী মালামালে বোঝাই করা থাকে, যা মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়।

৪. মেঘমালা থেকে বৃষ্টিবর্ষণ।

৫. অতঃপর সেই বৃষ্টির মাধ্যমে গবাদিপশুকে হৃষ্টপুষ্টকরণ এবং নির্জীব ও অনুর্বর জমিতে ফসলাদি উৎপন্নকরণ।

৬. জীব, সরীসৃপ ও গবাদিপশুসহ ভূপৃষ্ঠে চলাচলকারী সকল প্রজাতির প্রাণীকে জমিনে ছড়িয়ে দেওয়া।

৭. বাতাসের প্রবাহ। তা কখনো আসে দক্ষিণ দিক থেকে, কখনো উত্তর দিক থেকে। কখনো গরম হয়ে, কখনো শীতল হয়ে।

৮. আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলন্ত মেঘরাশি। আল্লাহ তাআলা যেখানে চান, যেভাবে চান, সেভাবেই তা ঘুরে বেড়ায়।

প্রতিটি বিষয়েই রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য উজ্জ্বল প্রমাণ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন। উল্লিখিত প্রতিটি দলিল, সুবিন্যস্তকারী প্রজ্ঞাবান স্রষ্টার অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে। আয়াতটি সমাপ্ত হয়েছে 'এগুলোতে এমন জাতির জন্য [স্রষ্টার অস্তিত্বের] নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা-ফিকির করে'– কথাটির মাধ্যমে; যেন মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিবেক ও বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য এগুলো সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিপ্রসূত প্রমাণ।[১]

সচ্ছলতার সময়ে কিছু মানুষের স্বভাব বিগড়ে যায়। তখন তারা অবাধ্য হয়ে যায় এবং মহাবিশ্বের স্রষ্টাকে অস্বীকার করে বসে। কিন্তু সেই তারাই যখন বিপদের শিকার হয়, তখন আশ্রয় খোঁজে আল্লাহ তাআলার কাছে, যিনি অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.

যখন মেঘমালা-সদৃশ তরঙ্গ তাদের আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা আল্লাহর জন্য আনুগত্যকে খাঁটি করে আল্লাহকে ডাকে। (সুরা লোকমান : ৩২)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّاۤ اِيَّاهُ.

যখন সমুদ্রে তোমাদেরকে বিপদ পেয়ে বসে, তখন তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ডাক, তারা [সবাই] হারিয়ে যায়। (সুরা ইসরা : ৬৭)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِيْۤ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ.

---

১. التفسيرُ الواضِحُ المُيَسَّرُ

অচিরেই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করাব দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, যেন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিশ্চয়ই তা [কুরআন] সত্য। (সুরা ফুসসিলাত/হা-মিম সাজদাহ : ৫৩)

আরব বেদুইনের সহজ-সরল যুক্তি

প্রসিদ্ধ আছে, এক সাধাসিধে বেদুইনকে যখন আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তখন সে বলেছে, উটের লাদ উটের প্রমাণ বহন করে। পদচিহ্ন পথিকের বার্তা প্রদান করে। তাহলে নক্ষত্রপুঞ্জে সুদর্শন আসমান, বহু পথবিশিষ্ট জমিন এবং ঢেউয়ে উত্তাল সমুদ্র কি সর্বজ্ঞাত দয়াময় আল্লাহ তাআলার প্রমাণ বহন করে না?

তিনি অনাদি, অনন্ত

অনাদি অর্থ, যার কোনো শুরু নেই। আর অনন্ত অর্থ, যার কোনো শেষ নেই। সুতরাং আল্লাহই প্রথম, আল্লাহই শেষ। তাঁর অস্তিত্বের কোনো সূচনা নেই, অতীতে কোনো কালে তিনি অনস্তিত্বে ছিলেন না এবং তাঁর অস্তিত্বের কোনো শেষও নেই, ভবিষ্যতে কখনো অনস্তিত্ব তাঁকে স্পর্শ করবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গোপন। তিনি সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত। (সুরা হাদিদ : ৩)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ.

আল্লাহর সত্তা ছাড়া সব কিছু ধ্বংসশীল। (সুরা কাসাস : ৮৮)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.

[তিনি] আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। (সুরা বাকারা : ২৫৫)

আল্লাহ তাআলার 'আল-কাইয়ুম' নামটিই তাঁর অনাদি-অনন্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কারণ আল-কাইয়ুম বলা হয় এমন সত্তাকে, যিনি নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অন্যকে প্রতিষ্ঠাকারী।

আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবে এবং গুণগতভাবে অনাদি, অনন্ত। সামনে ৪৫-৪৬ নং পৃষ্ঠায় আল্লাহ তাআলার গুণাবলি অনাদি-অনন্ত হওয়ার বিষয়ে আলোচনা আসবে।

তাঁর অস্তিত্ব আবশ্যক, তাঁর বিদ্যমান না থাকা অসম্ভব

আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব আবশ্যক হওয়ার অর্থ হলো, তাঁর অস্তিত্ব না থাকা অসম্ভব। অতীতে বা ভবিষ্যতে কখনোই তাঁর সত্তা অনস্তিত্বকে গ্রহণ করে না। তিনি সত্তাগতভাবেই বিদ্যমান, কোনো কারণবশত নয়। অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্বে অন্য কারো প্রভাব নেই। সুতরাং তাঁর সত্তা ও গুণাবলির অস্তিত্বে স্থান বা কালের কোনো প্রভাব নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُوْنَ.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ.

[হে নবি] আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি তোমাদের ওপর নিরবচ্ছিন্নভাবে কিয়ামত পর্যন্ত রাত চাপিয়ে দেন, [তখন] আল্লাহ ছাড়া এমন কোন ইলাহ আছে, যে তোমাদের কাছে আলো নিয়ে আসবে? তবুও কি তোমরা শোনবে না?

[হে নবি!] আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহ তোমাদের ওপর নিরবচ্ছিন্নভাবে কিয়ামত পর্যন্ত দিন চাপিয়ে দেন, [তখন] আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ আছে, যে তোমাদের কাছে রাত নিয়ে আসবে, যাতে তোমরা আরাম করতে পারো? তবুও কি তোমরা [ভেবে] দেখবে না? (সুরা কাসাস : ৭১-৭২)

তিনি সুমহান ও সমুচ্চ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ.

তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান [উভয়] ব্যাপারে জানেন। তিনি সুমহান, সুউচ্চ। (সুরা রাদ : ৯)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ.

তা এজন্য যে, আল্লাহই সত্য। তাঁকে ছাড়া অন্য যাকে তারা ডাকে, তা মিথ্যা। আল্লাহই সুউচ্চ, সুমহান। (সুরা হজ : ৬২)

আল্লামা হালিমির ব্যাখ্যা

আবু আবদুল্লাহ হালিমি রাহিমাহুল্লাহ [৩৩৭-৪০৩ হি.] 'আল-কাবির' [সুমহান] শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'তিনি যেভাবে চান সেভাবেই বান্দাদের পরিচালনা করেন, তাদের মতামতের কোনো পরোয়া করেন না।' আর 'আল-মুতাআল' [সুউচ্চ] শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'অস্থায়ী ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর যেসব বিষয় আরোপিত হয়, তাঁর ওপর সেগুলো আরোপিত হয় না, তিনি সেগুলোর উর্ধ্বে।'[১]

---

১. বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ রচিত الأسماءُ والصِّفَاتُ খ. ১, পৃ. ৯৭ ও ১০০

তিনি পূর্ণতার সকল গুণে গুণান্বিত

আল্লাহ তাআলা জ্ঞান, শ্রবণ, দর্শন, ক্ষমতা, প্রজ্ঞা, পরাক্রমশালিতা, দয়া, মহত্ব, বড়ত্ব প্রভৃতি পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

যারা আখেরাতের ওপর ইমান আনে না, তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট উপমা। আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সুউচ্চ উপমা। তিনিই মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। (সুরা নাহল : ৬০)

'নিকৃষ্ট উপমা'-এর মর্ম হলো, অপূর্ণতার ক্রটিযুক্ত গুণ। আর 'সুউচ্চ উপমা'-এর অর্থ হলো, পূর্ণতা ও মহত্ত্বের গুণ।

আয়াতুল কুরসি নামক প্রসিদ্ধ আয়াতটি তো আল্লাহ তাআলার পূর্ণতার গুণের আলোচনায় ভরপুর! আয়াতটি হলো,

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ.

আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, [সব] তাঁরই [মালিকানাধীন]। তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে, এমন কে আছে? তাদের সামনে ও পেছনে যা আছে, তিনি তা জানেন। তিনি যা চান তা ব্যতীত, তাঁর [অসীম] জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা বেষ্টন করতে পারে না। তাঁর কুরসি

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে বিস্তৃত। এ দুয়ের রক্ষণাবেক্ষন তাঁকে ভারাক্রান্ত করে না। তিনিই সুউচ্চ, সুমহান। (সুরা বাকারা : ২৫৫)

অনুরূপ সুরা হাশরের শেষ তিনটি আয়াত,

هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ. هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ. هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিষয়ে জ্ঞাত। তিনিই সীমাহীন দয়াবান, অতি দয়ালু।

তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনিই মালিক, সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র, সকল বিপদ থেকে মুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, তত্ত্বাবধায়ক, পরাক্রমশালী, প্রতাপশালী, গৌরবান্বিত। তারা যা কিছু শরিক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।

তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা। সর্বোত্তম নামসমূহ তাঁরই জন্য। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব তাঁর তাসবিহ পাঠ করে। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। (সুরা হাশর : ২২-২৪)

আল্লাহর সকল নাম ৪ কালিমায় নিহিত থাকার ব্যাখ্যা

সুলতানুল উলামা ইযযুদ্দিন বিন আবদুস সালাম রাহিমাহুল্লাহ [৫৭৭-৬৬০ হি.] বলেন, আল্লাহ তাআলার সকল নাম চারটি কালিমায় নিহিত আছে। সেই কালিমাগুলোকে বলা হয় 'আল-বাকিয়াতুস সালিহাত' তথা স্থায়ী সৎকর্ম।

প্রথম কালিমা : 'সুবহানাল্লাহ' (سبحان الله)। আরবদের ভাষায় এই কালিমার অর্থ হলো, পবিত্রকরণ ও মুক্তকরণ। সুতরাং এই কালিমাতে আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলিকে সব ধরণের ত্রুটি ও

অপূর্ণতা থেকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করার বিষয়টি শামিল রয়েছে। এজন্য আল্লাহ তাআলার যে নামসমূহ দোষত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে তাঁর সত্তা ও গুণাবলিকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করে, সে নামসমূহ এই কালিমার অন্তর্ভুক্ত। যেমন, 'আল-কুদ্দুস' অর্থাৎ সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র এবং 'আস-সালাম' অর্থাৎ সকল বিপদ থেকে মুক্ত।

দ্বিতীয় কালিমা : 'আলহামদুলিল্লাহ' (الحمد لله)। এই কালিমায় আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলির জন্য সকল প্রকার পূর্ণতা সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব আল্লাহ তাআলার যেসকল নাম পূর্ণতা সাব্যস্ত করে, তা এই কালিমার মধ্যে নিহিত। যেমন, 'আল-আলিম' [সর্বজ্ঞানী], 'আল-কাদির' [ক্ষমতাধর], 'আস-সামি' [সর্বশ্রোতা], 'আল-বাসির' [সর্বদ্রষ্টা] ইত্যাদি।

'সুবহানাল্লাহ' কালিমাটি দ্বারা আমরা আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলি থেকে আমাদের জানাশোনা সকল ত্রুটি ও অপূর্ণতা অপনোদন করেছি। 'আলহামদুলিল্লাহ' কালিমাটি দ্বারা তাঁর সত্তা ও গুণাবলির জন্য আমাদের জানাশোনা সকল পূর্ণতা ও মহত্ত্ব সাব্যস্ত করেছি।

তৃতীয় কালিমা : আমরা যা অপনোদন করেছি, আর যা সাব্যস্ত করেছি, আল্লাহ তাআলার মর্যাদা তার চেয়ে বহু উর্ধ্বে, আমাদের জ্ঞানসীমার বাইরে। তাই আমরা সংক্ষিপ্তভাবে একটি কালিমার মাধ্যমে আমাদের না-জানা সব গুণগুলোও তাঁর জন্য সাব্যস্ত করি এবং না-জানা সব ত্রুটি থেকেও তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করি। কালিমাটি হলো 'আল্লাহু আকবার' (الله أكبر)। অর্থাৎ তিনি আমাদের সাব্যস্তকরণ ও অপনোদনের উর্ধ্বে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মর্মও এটিই। বাণীটি হলো,

لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

আমি আপনার প্রশংসা গণনা করব না [গণনা করে শেষ করতে পারব না]। আপনি তেমনই, যেমন প্রশংসা আপনি নিজের করেছেন।

আমাদের জ্ঞানসীমার উর্ধ্বের যেসকল গুণবাচক নাম আল্লাহ তাআলার রয়েছে, যেমন 'আল-আলা' [সুমহান], 'আল-মুতাআলি' [মর্যাদাবান], এগুলো 'আল্লাহু আকবার' কালিমাটির অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ কালিমা : যখন অস্তিত্বের জগতে এমন কেউ আছেন, যিনি এতো মহান, তখন তাঁর মতো কিংবা তাঁর সদৃশ অন্য কারো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যের মাধ্যমে আমরা এ কথারই স্বীকৃতি দিই। আর এটিই চতুর্থ কালিমা। [কালিমার অর্থ হলো : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।] যিনি ইলাহ সাব্যস্ত হন, ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত একমাত্র তিনিই। সুতরাং আমরা যেসকল গুণাবলি বর্ণনা করে এসেছি, তার সবগুলো যার মধ্যে বিদ্যমান, তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত।

আল্লাহ তাআলার যেসকল নাম সামগ্রিকভাবে উপরিউক্ত গুণাবলিকে ধারণ করে, যেমন 'আল-ওয়াহিদ', 'আল-আহাদ' [এক-অদ্বিতীয়], 'যুল জালালি ওয়াল ইকরাম' [মহিমাময় ও মহানুভব]– এ নামগুলো কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মধ্যে নিহিত। আল্লাহ তাআলা বস্তুত ইবাদতের উপযুক্ত হয়েছেন সেসকল মহান ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলির কারণে, যা কোনো বর্ণনাকারী বলে শেষ করতে পারবে না এবং কোনো গণনাকারী গুণে শেষ করতে পারবে না।[১]

সত্তাগত গুণাবলি ও কর্মগত গুণাবলি

মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১০১৪ হি.] বলেছেন, আল্লাহ তাআলার গুণাবলি দুই ধরণের। এক. সত্তাগত গুণাবলি। দুই. কর্মগত গুণাবলি। কর্মগত গুণাবলি প্রকাশ হওয়া নির্ভরশীল মাখলুকের অস্তিত্বের ওপর। সত্তাগত গুণাবলি ও কর্মগত গুণাবলির সংজ্ঞা নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে।

---

১. তাজুদ্দিন সুবকি রাহিমাহুল্লাহ রচিত طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَى খ. ৮, পৃ. ২২০, দ্বিতীয় মুদ্রণ, হিজর, মিসর।

মুতাজিলাদের মত

তারা বলেন, যে গুণসমূহে 'হ্যাঁ' এবং 'না' উভয় সূচকের সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলো কর্মগত গুণ। যেমন বলা যায় : 'আল্লাহ অমুককে সন্তান দান করেছেন' এবং 'আল্লাহ অমুককে সন্তান দান করেননি।' আর যে গুণসমূহের ব্যাপারে 'না'সূচক কথা বলা যায় না, তা সত্তাগত গুণ। যেমন, ইলম বা জ্ঞান। তাই 'তিনি অমুক বিষয়টি জানেন না' এ ধরণের কথা বলা যায় না। আর কর্মগত গুণাবলি অস্থায়ী![১]

আশআরিদের মত

আশআরি আলেমগণ এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন এভাবে– যেসকল গুণের অনুপস্থিতিতে বিপরীত গুণ আবশ্যক হয়, তা সত্তাগত গুণ। যেমন, 'জীবন' গুণটি অনুপস্থিত থাকলে 'মৃত্যু' গুণটি আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর যেসকল গুণের অনুপস্থিতিতে তার বিপরীতটা আবশ্যক হয় না, তা কর্মগত গুণ। যেমন, 'জীবনদান'। এটির অনুপস্থিতিতে 'মৃত্যুদান' গুণটি আবশ্যক হয়ে যায় না।

মাতুরিদিদের মত

মাতুরিদি আলেমগণ বলেন, আল্লাহ তাআলার জন্য যেসকল গুণ সাব্যস্ত করলে তার বিপরীতটা সাব্যস্ত করা যায় না, তা সত্তাগত গুণ। যেমন, কুদরত বা ক্ষমতা। আর যেসকল গুণ তার বিপরীত গুণসহ সাব্যস্ত করা যায়, তা কর্মগত গুণ। যেমন, ক্রোধ ও কঠোরতা।[২]

---

১. আল্লাহ তাআলার কর্মগত গুণাবলি অস্থায়ী– এ দাবিটি সঠিক নয়। সামনে ৭৮-৮০ নং পৃষ্ঠায় এর খণ্ডন আসবে।

২. شَرْحُ الفِقْهِ الأَكْبَرِ পৃ. ৬২-৬৪, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪৩০ হিজরি, دَارُ النَّفَائِسِ বৈরুত।

সিফাতুল মাআনি

'সত্তাগত গুণাবলি'র আরেক নাম 'সিফাতুল মাআনি'। আল্লাহ তাআলার সিফাতুল মাআনি ও কর্মগত গুণাবলি বিষয়ে ৭৬-৭৮ নং পৃষ্ঠায় আরো কিছু আলোচনা আসছে। আশআরি আলেমগণের মতে সিফাতুল মাআনি ৭টি- হায়াত [জীবন], কুদরত [ক্ষমতা], ইলম [জ্ঞান], ইরাদাহ ও মাশিআহ [ইচ্ছা], কালাম [কথা], সাম্‌উ [শ্রবণ করা] এবং বাসার [দেখা]।

তিনি ত্রুটি ও বিলুপ্তির সকল লক্ষণ থেকে পবিত্র

যে বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেগুলোই ত্রুটি ও বিলুপ্তির লক্ষণ। যেমন :

১. **শরিক**। চাই সে পিতা, পুত্র, স্ত্রী- যেই হোক না কেনো! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, لَا شَرِيْكَ لَهٗ

তাঁর কোনো শরিক নেই। (সুরা আনআম : ১৬৩)

২. **অক্ষমতা**। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ.

আল্লাহ এমন নন যে, কোনো কিছু তাঁকে অক্ষম করতে পারে। (সুরা ফাতির : ৪৪)

৩. **অনর্থক ক্রীড়া-কৌতুক**। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ.

আমি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা আছে, তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (সুরা দুখান : ৩৭)

শাইখ ইযযুদ্দিন বিন আবদুস সালাম রাহিমাহুল্লাহর বাণী সামান্য পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে- আল্লাহ তাআলার সকল নাম চারটি

কালিমায় নিহিত আছে। সেই কালিমাগুলোকে বলা হয় 'আল-বাকিয়াতুস সালিহাত' তথা স্থায়ী সৎকর্ম। প্রথম কালিমা হলো, 'সুবহানাল্লাহ' (سبحان الله)। আরবদের ভাষায় এই কালিমার অর্থ হলো, পবিত্রকরণ ও মুক্তকরণ। সুতরাং এই কালিমাতে আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলিকে সব ধরণের ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করার বিষয়টি শামিল রয়েছে। এজন্য আল্লাহ তাআলার যে নামসমূহ দোষত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে তাঁর সত্তা ও গুণাবলিকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করে, সে নামসমূহ এই কালিমার অন্তর্ভুক্ত। যেমন, 'আল-কুদ্দুস' অর্থাৎ সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র এবং 'আস-সালাম' অর্থাৎ সকল বিপদ থেকে মুক্ত।

তিনি সকল মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ.

তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করো। (সুরা আনআম : ১০২)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

[হে নবি!] আপনি বলুন, আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই এক-অদ্বিতীয়, প্রতাপশালী। (সুরা রাদ : ১৬)

তিনি সকল জ্ঞাত জিনিস সম্পর্কে অবগত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ إِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই কাছে। তিনি ছাড়া কেউ তা জানে না। স্থলে ও জলে যা-কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি অবহিত। [গাছের] এমন কোনো পাতা ঝরে না, যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। মাটির অন্ধকারে [এমন] কোনো শস্যকণা [অঙ্কুরিত হয় না] এবং আর্দ্র ও শুষ্ক এমন কোনো জিনিস নেই, যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে [লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ] নেই। (সুরা আনআম : ৫৯)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

তোমার রব থেকে আসমান ও জমিনের অণু পরিমাণ কিছুও গোপন থাকে না। এর চেয়ে ছোট ও এর চেয়ে বড় এমন কিছু নেই, যা এক স্পষ্ট কিতাবে [লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ] নেই। (সুরা ইউনুস : ৬১)

তিনি সম্ভাব্য সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

বরকতময় তিনি, যার হাতে রয়েছে রাজত্ব। তিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। (সুরা মুলক : ১)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

[হে নবি!] আপনি বলুন, হে আল্লাহ! হে রাজত্বের মালিক! আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন।

যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপদস্থ করেন। আপনার হাতেই রয়েছে কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। (সুরা আলে ইমরান : ২৬)

বিদ্যমান সকল বিষয় তাঁর ইচ্ছাধীন

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ

আল্লাহ যা চান, তাই করেন। (সুরা আলে ইমরান : ৪০)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ দেন। (সুরা মায়িদাহ : ১)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

আমি যখন কিছু করার ইচ্ছা করি, তখন আমার পক্ষ থেকে কেবল এতটুকু কথাই হয় যে, আমি তাকে বলি, 'হয়ে যাও', অমনি তা হয়ে যায়। (সুরা নাহল : ৪০)

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ [৬৩১-৬৭৬ হি.] তাঁর 'আল উসুল ওয়ায যাওয়াবিত' কিতাবে বলেছেন, 'আহলে হকের সিদ্ধান্ত হলো, তাকদির সাব্যস্ত করা ও তার ওপর ইমান আনয়ন করা। বিশ্বজগতে ভালো-মন্দ সকল কিছু আল্লাহর ফায়সালা এবং তাঁর নির্ধারিত পরিকল্পনামাফিক হয়। তাঁর ইচ্ছায়ই ঘটে সবকিছু। এমনকি অপরাধ বা গুনাহ, অপছন্দ সত্ত্বেও তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। এর পেছনে কী হেকমত রয়েছে, তা কেবল তিনিই জানেন।[১]

---

১. الأُصُوْلُ وَالضَّوَابِطُ পৃ. ২৩, প্রথম মুদ্রণ ১৪০৬, دَارُ الْبَشَائِرِ الإسلامية বৈরুত।

ইচ্ছা ও পছন্দের পার্থক্য

'ইচ্ছা' ও 'পছন্দ' এদুটি বিষয়ের পার্থক্য বোঝার জন্য একটি সহজ উদাহরণ- ধরুন কোনো ব্যক্তি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে অনেক টাকা ঋণ করে ফেলেছে। এখন তা পরিশোধ করার জন্য তার সবচেয়ে পছন্দের কোনো কিছু বিক্রি করতে হচ্ছে। নিজ ইচ্ছাতেই লোকটি কাজটা করছে, কিন্তু দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে; পছন্দ ও সন্তুষ্টির সাথে করছে না।

মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা

মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহিমাহুল্লাহ [১৩১৪-১৩৯৬ হি.] বলেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস হলো, পৃথিবীতে ভালো-মন্দ, ইমান-কুফর যা কিছুই আছে, তা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছাড়া অস্তিত্বে আসা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রতিটি জিনিস অস্তিত্বলাভের জন্য তাঁর ইচ্ছা শর্ত। কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টি ও পছন্দ শুধুই ইমান বিল্লাহ ও নেক আমলের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ তাআলা কুফর-শিরক ও গুনাহের প্রতি সন্তুষ্ট নন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ

আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। (সুরা বাকারা : ২৫৫)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ.

তুমি ভরসা রাখো চিরঞ্জীব সত্তার ওপর, যিনি মৃত্যুবরণ করবেন না। (সুরা ফুরকান : ৫৮)

---

১. মাআরেফুল কোরআন, সুরা যুমারের ৭ নং আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

আল্লাহ তাআলা অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান আছেন। অনাদিকাল থেকে তিনি জীবিত থাকার গুণে গুণান্বিত। তিনি অনস্তিত্বের পর জীবনলাভ করেননি, এবং জীবনের পর মৃত্যু তাঁর ওপর আপতিত হবে না।

[তিনি]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ.

তারা কি ধারণা করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও তাদের গোপনালাপ শুনি না? (সুরা যুখরুফ : ৮০)

তিনি আরো ইরশাদ করেন, وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। (সুরা আনফাল : ৭২)

তিনি আরো ইরশাদ করেন, اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সুরা বনি ইসরাইল : ১)

আল্লামা হালিমি ও খাত্তাবির ব্যাখ্যা

'সর্বশ্রোতা' শব্দটির ব্যাখ্যায় হালিমি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, শোনা অর্থ ধ্বনি অনুভব করা। মাখলুক ধ্বনি অনুভব করে কানের মাধ্যমে। আর আল্লাহ তাআলা শোনার জন্য কানের মুখাপেক্ষী নন। তিনি কান ছাড়াই শ্রবণ করেন।

খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ [৩১৯-৩৭৭ হি.] বলেছেন, সর্বশ্রোতা মানে হলো, তিনি এমন সত্তা, যিনি গোপন এবং অতি গোপন বিষয়ও শোনেন। উচ্চৈঃস্বর, নিম্নস্বর, সরবতা ও নিরবতা– তাঁর নিকট সবই সমান।

---

১. الأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ খ. ১, পৃ. ৬৩

২. প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ১২০

'সর্বদ্রষ্টা' শব্দটির ব্যাপারে হালিমি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, দেখা অর্থ বিভিন্ন আকৃতি ও বর্ণ অনুভব করা। এগুলো অনুধাবনের জন্য মাখলুকের চোখ প্রয়োজন হয়। আর আল্লাহ তাআলা এর জন্য চোখ নামক অঙ্গের মুখাপেক্ষী নন। খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, সর্বদ্রষ্টা হলো যিনি সবকিছু দেখেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো যিনি সকল গোপন বিষয় জানেন।[১]

তাঁর কোনো সদৃশ নেই

এ সংক্রান্ত কুরআন পাকের কিছু আয়াত আমরা 'তাঁর অনুরূপ কেউ নেই' উক্তিটির অধীনে উল্লেখ করব। কারণ, দুটো বাক্যের মর্ম আমাদের ধারণামতে এক। আল্লাহই অধিক ভালো জানেন।

মুশাব্বিহা ফিরকার খণ্ডন

এ বাক্যটিতে মুশাব্বিহা ফিরকার খণ্ডন রয়েছে, যারা খালেককে মাখলুকের সাথে তুলনা করে। 'তাঁর কোনো সদৃশ নেই' উক্তিটি ব্যবহারের ব্যাপারে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের উলামায়ে কেরামের প্রসিদ্ধ অবস্থান হলো, তারা সাদৃশ্য বাদ দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলার গুণসমূহকে নাকচ করে দেন না, যেমনটা মুআত্তিলা ফিরকা করে থাকে। বরং তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলার নামসমূহ, গুণাবলি ও কর্মসমূহ মাখলুকের মতো নয়। তাঁর প্রতিটি গুণ মাখলুকের গুণ থেকে আলাদা। সুতরাং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ জানেন, তবে তা আমাদের জানার মতো নয়। তিনি সক্ষম, তবে তা আমাদের সক্ষমতার মতো নয়। তিনি দেখেন, তবে তা আমাদের দেখার মতো নয়।

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ১২২-১২৩

তাঁর কোনো প্রতিপক্ষ নেই

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে বাধাদানকারী কেউ নেই, তাঁর কোনো বিরুদ্ধাচরণকারীও নেই; না শুরুতে, না শেষে। আল্লাহ তাআলা শহিদ[১] কাঠমিস্ত্রি হাবিব রাহিমাহুল্লাহর ভাষায় কুরআন পাকে ইরশাদ করেছেন,

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً اِنْ یُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّیْ شَفَاعَتُهُمْ شَیْـًٔا وَّلَا یُنْقِذُوْنِ.

আমি কি তাঁকে [আল্লাহকে] বাদ দিয়ে এমন কিছু ইলাহকে গ্রহণ করব, রহমান আমার কোনো ক্ষতির ইচ্ছা করলে যাদের সুপারিশ আমার থেকে কোনো [ক্ষতি] দূর করবে না এবং আমাকে [সেই ক্ষতি থেকে] বাঁচাবে না? (সুরা ইয়াসিন : ২৩)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

قُلْ اَفَرَءَیْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِیَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِیْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ.

[হে নবি] আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের [অর্থাৎ যেই প্রতিমাদের]কে ডাক, আল্লাহ

---

১. আল্লাহ আমাদেরকেও তাঁর পথে শহিদ হওয়ার তাওফিক দিন। আমিন! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ.

সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি কামনা করি আমাকে যেন আল্লাহর রাস্তায় শহিদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, অতঃপর শহিদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহিদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহিদ করা হয়। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২৭৯৭)

আমার কোনো ক্ষতি করতে চাইলে, তারা কি তাঁর ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করতে চান, তবে তারা কি তাঁর অনুগ্রহ আটকে রাখতে পারবে? (সুরা যুমার : ৩৮)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَّأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অতএব, তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না। (সুরা বাকারা : ২২)

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِهٖ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ.

তারা আল্লাহর জন্য কতিপয় সমকক্ষ সাব্যস্ত করেছে, যেন সেগুলো [মানুষকে] তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। [তাদেরকে] বলে দিন, [অল্প কিছু] ভোগ করে নাও। কারণ, জাহান্নামই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। (সুরা ইবরাহিম : ৩০)

আল্লামা মাহমুদ আলুসির ব্যাখ্যা

আল্লামা মাহমুদ আলুসি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১২৮০ হি.] বলেছেন, সমকক্ষ হলো কোনো বস্তুর অনুরূপ এমন কিছু, যা তার বিপরীতে দাঁড়াবে, তার কাজে বিরোধিতা করবে, তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে এবং তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে। কেউ কেউ বলেন, সমকক্ষ হলো, যে সত্তার ক্ষেত্রে শরিক।

---

১. রুহুল মাআনি, ১/১৯৩, دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ বৈরুত। প্রথম প্রকাশ : ১৪১৫ হিজরি।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٌ
তাঁর মতো কিছু নেই। (সুরা শুরা : ১১)

আল্লামা শাওকানির ব্যাখ্যা

কাজি মুহাম্মাদ বিন আলি শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ [১১৭৩-১২৫০ হি.] বলেছেন, এ বাক্য সকল ক্ষেত্রে সাদৃশ্যকে প্রত্যাখ্যান করার প্রমাণ বহন করে। অতএব এ আয়াত দ্বারা মুজাসসিমা [দেহবাদী] ফিরকার খণ্ডন করা হবে। এ আয়াতের মাধ্যমে জানা যাবে, কুরআন-সুন্নাহে উল্লিখিত আল্লাহ তাআলার জন্য সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা গুণসমূহ কীভাবে সাব্যস্ত করা হবে এবং শোনা, দেখা, ইয়াদ, ইসতিওয়া ইত্যাদি গুণগুলো কীভাবে প্রয়োগ করা হবে। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট হলো, আল্লাহ তাআলার জন্য এসকল গুণাবলি সুসাব্যস্ত, তবে তা মাখলুকের মতো নয়।

অতএব এ আয়াত দ্বারা সীমালঙ্ঘন ও শিথিলতা, দুটোকেই প্রত্যাখ্যান করা হবে। সীমালঙ্ঘনের অর্থ হলো, সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন, যা আল্লাহ তাআলার দেহ সাব্যস্তকরণের দিকে নিয়ে যায়! আর শিথিলতার অর্থ হলো, প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন, যা তাঁর গুণাবলি নাকচ করার দিকে নিয়ে যায়! এ দুটো ফিরকার সীমালঙ্ঘনের মধ্য থেকে সালাফে সালিহিনের সঠিক মাজহাবটি বের হয়ে আসে। তাঁদের মাজহাব হলো, আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য যে গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন, তা সাব্যস্ত করা। তবে তার স্বরূপ একমাত্র আল্লাহই জানেন। কারণ তিনি ইরশাদ করেন, لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الۡبَصِيرُ

তাঁর মতো কিছু নেই। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।(সুরা শুরা : ১১)

---

১. শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ রচিত التُّحَفُ فِي مَذَاهِبِ السَّلَفِ পৃ. ২৬, প্রথম মুদ্রণ ১৪০৯ হিজরি/১৯৮৯ ইসায়ি, دَارُ الصَّحَابَةِ لِلتُّرَاثِ তান্তা, মিশর।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌ. তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (সুরা ইখলাস : ৪)

আয়াতের মর্মার্থ হলো, সৃষ্টির মধ্যে কেউ তাঁর সদৃশ ও অনুরূপ নয়। না তাঁর নামসমূহে, না তাঁর গুণাবলিতে, আর না তাঁর ক্রিয়াকর্মে। আল্লাহ তাআলা এ থেকে উর্ধ্বে ও পবিত্র।

অস্তিত্ব আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরিক নেই

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ. اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ. ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. عَلٰى اَنْ نُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُولٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.

اَفَرَاَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ.

اَفَرَاَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ.

اَفَرَاَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ. نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.

আল্লাহর অস্তিত্ব আবশ্যক হওয়ার ৪টি প্রমাণ

আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি [যখন তোমরা কিছুই ছিলে না]। তাহলে কেন তোমরা [পুনরুত্থানকে] সত্য মনে করছ না?

তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা যে বীর্য স্খলন কর, তা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমিই [তার] স্রষ্টা? আমি তোমাদের মৃত্যু

নির্ধারণ করে রেখেছি এবং এ ব্যাপারে আমি অক্ষম নই যে, তোমাদের বদলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করব এবং তোমাদেরকে এমন আকৃতিতে সৃষ্টি করব, যা তোমরা জান না। তোমরা তো তোমাদের প্রথম সৃজন সম্পর্কে অবগত আছ। তবুও কেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করছ না?

তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা [জমিনে] যে বীজ বপন কর, তা কি [জমিন থেকে] তোমরা অঙ্কুরিত কর, না আমিই [তার] অঙ্কুরণকারী? আমি চাইলে তাকে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। [এবং বলবে,] আমরা তো দায়গ্রস্ত [হয়ে পড়লাম], বরং আমরা বঞ্চিত।

তোমরা কি সেই পানিতে চিন্তা করেছ যা তোমরা পান কর? মেঘ থেকে কি তা তোমরা বর্ষণ করেছ, না আমিই [তা] বর্ষণকারী? আমি চাইলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কি তোমরা শোকর করবে না?

তোমরা কি সেই আগুনে চিন্তা করেছ, তোমরা যা প্রজ্জ্বলিত কর, তার বৃক্ষ[১] কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমিই [তার] স্রষ্টা? আমি তাকে বানিয়েছি উপদেশের উপকরণ [অর্থাৎ তোমাদের জন্য জাহান্নামের আগুনের নমুনা] এবং মরুচারীদের জন্য উপকারী বস্তু। সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামে তাসবিহ পাঠ করো। (সুরা ওয়াকিয়া : ৫৭-৭৪)

ইবাদতের উপযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কোন শরিক নেই

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا.

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না। (সুরা নিসা : ৩৬)

---

১. অর্থাৎ যে গাছের কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়।

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ.

বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনি আদেশ করেছেন, যেন তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করো। (সুরা ইউসুফ : ৪০)

ইবাদতের সংজ্ঞা

'ইবাদত' দ্বারা অক্ষমতা, অসহায়ত্ব, দাসত্ব, নিচুতা ও হীনতা প্রকাশক মানুষের এমন সব বিশেষ কর্ম উদ্দেশ্য, যা কোনো সত্তাকে পূজনীয়, উপাস্য ও কল্যাণ-অকল্যাণের অধিকারী মনে করে তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়। যেমন সালাত, সিয়াম, হজ, সাদাকা, সিজদা, তাওয়াফ, দুআ ও মান্নত-কুরবানি ইত্যাদি। কেউ এ ধরণের কোনো কাজ গায়রুল্লাহর জন্য করলে পবিত্র কুরআনের আলোকে সে নিশ্চিতভাবে মুশরিক।

গায়রুল্লাহর আইন ও সংবিধান মান্য করাও ইবাদত

এক হাদিসে আল্লাহ তাআলার হুকুমের বিপরীত গায়রুল্লাহর আইন ও সংবিধান মান্য করাকেও ইবাদত বলা হয়েছে–

হজরত আদি বিন হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনলেন– [অর্থ] 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও আবেদদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে' (সুরা তাওবা : ৩১), আদি বললেন, তারা তাদের ইবাদত করেনি। রাসুল বললেন, অবশ্যই করেছে। আলেম ও আবেদরা তাদের জন্য কিছু বৈধ বিষয় অবৈধ করেছে এবং কিছু অবৈধ বিষয় বৈধ করেছে, আর তারা তাদের অনুসরণ করেছে। এটিই এদের পক্ষ থেকে ওদের ইবাদত করা।

---

১. সুনানুত তিরমিজি, হাদিস নং ৩০৯৫

এ হাদিসের বিষয়ই হলো, যারা আল্লাহর বৈধকৃত বস্তুকে অবৈধ সাব্যস্ত করে এবং তাঁর অবৈধকৃত বস্তুকে বৈধ সাব্যস্ত করে, মোটকথা যারা আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন প্রণয়ন করে, তাদের আইন মান্য করাও একটি ইবাদত। গায়রুল্লাহর যেকোনো ধরনের ইবাদতকারী মুশরিক। গায়রুল্লাহর প্রত্যেক ইবাদত বর্জন করা মুসলমান হওয়ার জন্য শর্ত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ.

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَاۤ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ.

اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِیْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَیْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

---

১. 'কালিমায়ে তাইয়েবা : বিশ্লেষণ ও ঈমান ভঙ্গের কারণ' পৃ. ১৮৭-১৮৮ পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

সৃষ্টি ও পরিচালনায় আল্লাহর কোনো শরিক না থাকার ৫টি প্রমাণ

বরং কে তিনি, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেছেন? তারপর আমি তা দ্বারা উৎপন্ন করেছি অনেক মনোরম উদ্যান। তোমাদের তো এমন ক্ষমতা নেই যে, তার গাছপালা উৎপন্ন করবে। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো মাবুদ আছে কি? বরং তারা [সত্যপথ থেকে] বিচ্যুত এক জাতি।

বরং কে তিনি, যিনি পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী বানিয়েছেন, তার মাঝে অনেক নদী প্রবাহিত করেছেন, তার [অর্থাৎ তাকে স্থির রাখার] জন্য অনেক পর্বত স্থাপন করেছেন এবং [মিষ্ট ও লবণাক্ত] দুই সাগরের মাঝখানে রেখেছেন এক অন্তরায়, [ফলে একটি অপরটির সাথে মিশে যায় না]? আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো মাবুদ আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

বরং কে তিনি, যিনি অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ দূর করেন, তোমাদেরকে পৃথিবীর স্থলাভিষিক্ত[১] বানান? আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো মাবুদ আছে কি? বরং তোমরা অতি অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

বরং কে তিনি, যিনি স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহে তোমাদেরকে পথ দেখান এবং যিনি নিজ রহমতের [অর্থাৎ বৃষ্টির] আগে পাঠান সুসংবাদবাহী বাতাস? আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো মাবুদ আছে কি? বরং তারা যা-কিছুকে শরিক সাব্যস্ত করে, আল্লাহ তা থেকে ঊর্ধ্বে।

বরং কে তিনি, যিনি মাখলুককে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তারপর তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং যিনি আসমান ও জমিন থেকে তোমাদের রিজিক দান করেন?[২] আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদ

---

১. অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাদেরকে পূর্বসূরিদের স্থলাভিষিক্ত বানান।

২. অর্থাৎ আসমান থেকে বৃষ্টি দিয়ে এবং জমিন থেকে ফসল ইত্যাদি উৎপন্ন করে রিজিকের ব্যবস্থা করেন।

আছে কি? [হে নবি,] আপনি বলে দিন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো। (সুরা নামল : ৬০-৬৪)

তিনি ছাড়া কেউ অসুস্থকে সুস্থতা দান করতে পারে না, জীবিকা দিতে পারে না এবং কোনো ক্ষতি দূরীভূত করতে পারে না।

তাঁর এসকল ক্ষমতা এই অর্থে যে, তিনি যখন বলেন 'হও', অমনি তা হয়ে যায়। বাহ্যিক স্বাভাবিক মাধ্যম অর্থে নয়। যেমন বলা হয়, 'ডাক্তার রোগীকে সুস্থ করেছেন', কিংবা 'সেনাপতি সৈন্যদের খাবার দিয়েছেন'। এগুলো আল্লাহর ক্ষমতার মতো নয়, যদিও শব্দগত মিল পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالَّذِیْ هُوَ یُطْعِمُنِیْ وَیَسْقِیْنِ، وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِیْنِ.

যিনি আমাকে আহার করান এবং পান করান। আমি যখন অসুস্থ হই, তখন আমাকে সুস্থতা দান করেন। (সুরা শুআরা : ৭৯-৮০)

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

وَاَیُّوْبَ اِذْ نَادٰی رَبَّهٗۤ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ.

আইয়ুবকে স্মরণ করুন, যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকে বলল, [হে আমার প্রতিপালক!] কষ্ট আমাকে স্পর্শ করেছে [আমার কষ্ট দেখা দিয়েছে], আর তুমি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করলাম। (সুরা আম্বিয়া : ৮৩-৮৪)

আরো ইরশাদ করেছেন,

اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَیْـًٔا اَنْ یَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ.

তাঁর ব্যাপার তো এই যে, তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন, 'হও'। অমনি তা হয়ে যায়। (সুরা ইয়াসিন : ৮২)

সুতরাং আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ আরোগ্য দান করা, রিজিক দান করা এবং অনিষ্ট দূর করার ব্যাপারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী নয়। আর মানুষ যে বলে, 'ডাক্তার রোগিকে সুস্থ করেছেন', 'সেনাপতি সৈন্যদের খাবার দিয়েছেন' এবং এই জাতীয় আরো যত কথা আছে, তার কোনোটাই এই [নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী] অর্থে নয়। এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা ডাক্তারকে রোগির সুস্থতার একটি স্বাভাবিক মাধ্যম বানিয়েছেন, সেনাপতিকে সৈন্যদের খাবার-দাবার দেওয়ার একটি স্বাভাবিক মাধ্যম বানিয়েছেন! আরোগ্যদাতা এবং রিজিকদাতা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ, ডাক্তার বা সেনাপতি নয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيْرٍ.

[হে রাসুল! কাফেরদেরকে] বলুন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে [ইলাহ] মনে করেছ, তাদেরকে ডাকো। তারা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অনু পরিমাণেরও [অনু পরিমাণ জিনিসেরও] মালিক নয় এবং এ দুয়ের মধ্যে তাদের কোনো অংশীদারত্ব নেই এবং তাদের মধ্যে তাঁর কোনো সাহায্যকারীও নেই। (সুরা সাবা : ২২)

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

مَا اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا.

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে আমি তাদেরকে উপস্থিত রাখিনি। এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টি করার সময়ও না। আমি এমন নই যে, পথভ্রষ্টকারীদেরকে সহযোগী বানাব। (সুরা কাহফ : ৫১)

অন্যের মধ্যে প্রবেশকারী সত্তা মূলত অন্যের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। সুতরাং দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের অনিবার্য ফলাফল।

প্রবেশ করার জন্য স্থানের প্রয়োজন, আর জানা কথা, আল্লাহ তাআলা স্থান, দিক ও এ জাতীয় সকল কিছু থেকে পবিত্র। কারণ, এগুলো সাব্যস্ত করলে মাখলুকের সাথে তাঁর সাদৃশ্য সাব্যস্ত হয়ে যায়! অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ.

তাঁর মতো কিছু নেই। (সুরা শুরা : ১১)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (সুরা ইখলাস : ৪)

সমকক্ষ মানে, সদৃশ ও অনুরূপ।

অন্যের মধ্যে প্রবেশ করে তার সঙ্গে মিশে একীভূত হয়ে যাওয়ার বিশ্বাসকে 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' -এর আকিদা বলা হয়। নিম্নেবর্ণিত ইমামগণের বিবরণমতে হুসাইন বিন মানসুর হাল্লাজ এ আকিদার ধারক-বাহক ছিল। তার একটি প্রসিদ্ধ উক্তি হলো, 'আনাল

---

১. প্রথম বাক্য হলো, 'তিনি কারো মধ্যে প্রবেশ করেন না'। আর দ্বিতীয় বাক্য হলো, 'কারো সাথে মিশে একীভূতও হয়ে যান না'।

২. وَحْدَةُ الْوُجُوْدِ

হক'।[১] সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রাহিমাহুল্লাহর বর্ণনানুসারে[২] বায়জিদ বোস্তামির প্রসিদ্ধ দুটি উক্তি হলো,

سُبْحَانِيْ، مَا أَعْظَمَ شَأْنِيْ!

আমি পবিত্র! কত মহান আমার মর্যাদা!

لَيْسَ فِيْ جُبَّتِيْ إِلَّا اللهُ.

আমার জুব্বায় আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই!

কারো কারো ধারণা, তাদের উক্তিগুলোতে 'একীভূত হওয়ার দর্শন'[৩] নেই। বরং আবেগ ও উন্মাদনার সামনে পরাভূত অবস্থায় সেগুলো তাদের থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

হুসাইন বিন মানসুর হাল্লাজের ব্যাপারে ইমামগণের উক্তি

১. **ইমাম আবু বকর জাসসাস হানাফি রাহিমাহুল্লাহ** [৩০৫-৩৭০ হি.] তাঁর 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বলেছেন, যাদুর আরেকটি প্রকার হলো, যাকে তারা জিন ও শয়তানের কথা আখ্যা দেয়। এবং তারা দাবি করে, ঝাঁড়ফুকের ফলে জিনরা তাদের আনুগত্য করে। বস্তুত তারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য পূর্বেই কিছু কাজ করে রাখে এবং জায়গায় জায়গায় লোক প্রস্তুত করে রাখে। জাহিলী যুগে আরব-গণকরা এভাবেই তাদের কারসাজি আঞ্জাম দিত। হাল্লাজের অলৌকিক কারসাজির অধিকাংশই ছিলো এ জাতীয়, অর্থাৎ পূর্ব থেকে লোক ঠিক করে রেখে তৈরি। যদি এ কিতাবে তার পর্যালোচনা সম্ভব হতো, তাহলে অবশ্যই আমি তা

---

১. أَنَا الْحَقُّ অর্থাৎ আমিই হক [আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম]।

২. رِجَالُ الفِكْرِ والدَّعْوَةِ فِي الإسلامِ খ. ৩, পৃ. ২৭১, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪৩৩ হিজরি, دَارُ ابنِ كَثِيْرٍ দামেশক।

৩. نَظَرِيَّةُ الاتِّحَادِ

উল্লেখ করতাম, যেন মানুষ হাল্লাজ ও তার মতো লোকদের অলৌকিক বিষয়গুলোর স্বরূপ জানতে পারে।[১]

২. **কাজি ইয়াজ বিন মুসা ইয়াহসুবি রাহিমাহুল্লাহ** [৪৭৬-৫৪৪ হি.] তাঁর লিখিত 'আশ শিফা বি তারিফি হুকুকিল মুস্তফা' কিতাবে লিখেছেন, আব্বাসি খলিফা মুকতাদির বিল্লাহর আমলে বাগদাদের মালিকি মাজহাবের ফকিহগণ এবং সেখানকার প্রধান বিচারপতি আবু উমর মালিকি হাল্লাজকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার ব্যাপারে ইজমা করেছেন; যদিও সে বাহ্যিকভাবে শরিয়তের পাবন্দ ছিল। কারণ, (ক) সে নিজেকে ইলাহ দাবি করেছে। (খ) সে তার ভেতর আল্লাহ প্রবেশ করে একাকার হয়ে গেছে বলে দাবি করেছে। (গ) সে বলেছে 'আনাল হক'। ফুকাহায়ে কেরাম তার তাওবা গ্রহণ করেননি।[২]

---

১. আহকামুল কুরআন, ১/৫৬, دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيَّةُ বৈরুত। প্রকাশকাল : ১৪০৫ হিজরি।

২. الشِّفَا بِتعريفِ حُقُوْقِ الْمُصْطَفٰى খ. ২ পৃ. ২৯৭-২৯৮, دَارُ الفِكْرِ لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيْعِ প্রকাশকাল : ১৪০৯ হিজরি।
মালেকি ফুকাহায়ে কেরাম তার তাওবা গ্রহণ না করার কারণ হলো, তাঁদের ঐকমত্যে সে ছিল জিন্দিক। [৩৫ নং পৃষ্ঠায় জিন্দিকের সংজ্ঞা আসছে।]

চার মাজহাবে জিন্দিকের হুকুম

জিন্দিক তাওবা করলেও মালেকি মাজহাব মতে দুনিয়ার হুকুমে তা কোনো অবস্থাতেই প্রভাব ফেলে না। যেমন কেউ যদি চুরি করে ধরা খায়, তাহলে সে শতবার তাওবা করলেও অপরিহার্যভাবে তার হাত কাটা হয়।

ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ এবং প্রসিদ্ধ মতানুসারে ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহর মতে জিন্দিকের বিধান মুরতাদের বিধানের অনুরূপ।

৩. **হাফেজ শামসুদ্দিন জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ** [৬৭৩-৭৪৮ হি.] তাঁর 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' গ্রন্থে লিখেছেন, লোকেরা ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে আমাকে এই সংবাদ দিয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তাঁর উস্তাদ আবু বকর আনসারি তাঁকে বলেছেন, আমি একদা একটি জামাতের সঙ্গে আবুল ওয়াফা বিন আকিলের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। তখন তিনি বলেছেন, জীবনের একটা সময় পর্যন্ত আমি হাল্লাজের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করতাম এবং তাকে সাহায্য করতাম। এজন্য এখন আল্লাহর কাছে তাওবা করছি। তাকে তার সামসময়িক ফকিহদের ইজমার ভিত্তিতে

অর্থাৎ তাকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে। যদি সে তিন দিনের মধ্যে তাওবা করে, তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তিন দিনের মধ্যে তাওবা না করলে ওয়াজিবুল কতল সাব্যস্ত হবে।

ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহর দ্বিতীয় মত এবং ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর মাজহাব হলো, জিন্দিককে হত্যা করা ওয়াজিব। গ্রেপ্তারের পর তার তাওবা গ্রহণ করা হবে না। হ্যাঁ, কোনো জিন্দিক যদি স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজ থেকে তাওবা করে, অন্য কেউ আদৌ জানত না যে, সে একজন জিন্দিক, সে নিজেই তার জিন্দিক হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে এবং আন্তরিকভাবে তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা গৃহীত হবে। অনুরূপ কারো ব্যাপারে যদি এটা জানা থাকে যে, সে জিন্দিক; কিন্তু গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়েত করেছেন, ফলে সে নিজেই আত্মসমর্পণ করে অনুতপ্ত হয় এবং তাওবা করে জিন্দিক থেকে পুনরায় মুমিন হয়ে যায়, তবে তার তাওবাও গৃহীত হবে। তার ওপর মুরতাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না। তবে গ্রেপ্তার হওয়ার পর কেউ যদি শতবারও তাওবা করে, তার তাওবা গৃহীত হবে না। [মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানবি রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'কাদিয়ানি আওর দুসরে গাইরে মুসলিমোঁ মেঁ ফরক' দ্রষ্টব্য।]

হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা [ফকিহগণ] যা করেছেন ঠিকই করেছেন। হাল্লাজ একাই ভুল করেছে।[১]

৪. **হাফেজ জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ** তাঁর 'মিজানুল ইতিদাল' কিতাবে হাল্লাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেছেন এভাবে- জিন্দিক[২] হওয়ার কারণে হুসাইন বিন মানসুর হাল্লাজকে হত্যা করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, ইলমের সামান্য কিছুও সে বর্ণনা করেনি। তার শুরুটা ছিল ভালো। সে ইবাদত করত এবং তাসাউফের মেহনত করত। কিন্তু তারপর সে দীনের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। জাদু শিখেছে; মানুষকে অলৌকিক কারসাজি দেখিয়েছে। উলামায়ে কেরাম তার ব্যাপারে মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া দিয়েছেন। ৩১১ হিজরিতে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।[৩]

৫. **হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ** [৭৭৩-৮৭২ হি.] তাঁর 'লিসানুল মিজান' গ্রন্থে হাফেজ জাহাবির উল্লিখিত উক্তি বর্ণনা করার পর লিখেছেন, এখানে জীবনীটি খুব সংক্ষিপ্ত।

---

১. سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ খ. ১৪, পৃ. ৩৩১, مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ বৈরুত, তৃতীয় প্রকাশ : ১৪০৫ হিজরি।

২. **জিন্দিকের সংজ্ঞা :** হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ [১১১৪-১১৭৬ হি.] মুআত্তা কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মুসাওওয়া' কিতাবে লিখেছেন–

'আর যদি বাহ্যিকভাবে স্বীকার করে, কিন্তু জরুরিয়াতে দীনের কোনো বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা করে যা সাহাবা, তাবেইন ও উম্মাহর সর্বসম্মত ব্যাখ্যার বিপরীত, তাহলে সে জিন্দিক।' ['ইমান আওর কুফর কুরআন কি রুশনি মেঁ'-এর বরাতে 'আল মুসাওওয়া' ২ : ১৩০]

৩. مِيزَانُ الاعتِدالِ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ খ. ১, পৃ. ৫৪৭, دَارُ المَعْرِفَةِ لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ বৈরুত; প্রথম প্রকাশ, ১৩৮২। لِسَانُ المِيزَانِ গ্রন্থে হাল্লাজের মৃত্যুসন ৩০৯ হিজরি উল্লেখ করা হয়েছে।

হাল্লাজের জীবনের ফিরিস্তি আরো বিস্তৃত। উলামায়ে কেরাম তার ব্যাপারে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। তবে অধিকাংশের মত হলো, সে জিন্দিক ও পথভ্রষ্ট।[১]

৬. **হাফেজ ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ** [৭০১-৭৭৪ হি.] তাঁর 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে লিখেছেন, হাল্লাজের মৃত্যুর সময় থেকেই মানুষ তার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে আসছে। একাধিক ইমাম ও আলেমে দীন থেকে বর্ণিত, উলামায়ে কেরাম তার মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে ইজমা করেছেন এবং কাফের অবস্থায়ই তাকে হত্যা করা হয়। সে ছিল ভেল্কিবাজ ও সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণকারী কাফের। অধিকাংশ সুফি তার ব্যাপারে এই কথা বলেছেন। তাঁদের একটি দল তার ব্যাপারে ভালো কথা বলেছেন। তাঁরা মূলত হাল্লাজের বাহ্যিক দিক দেখে বিভ্রান্ত হয়েছেন। তার আসল রূপ এবং তার উক্তির ভেতরের দিকটা তারা জানতে পারেননি।[২] কারণ জীবনের শুরুর দিকে সে ছিল ইবাদতগুজার, আল্লাহর জিকিরকারী এবং আত্মশুদ্ধির পথচারী। কিন্তু তার ইলম ছিল না মোটেও। তার কর্ম ও অবস্থার ভিত্তিও তাকওয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টি ছিল না। ফলে তার মধ্যে সংশোধনকারী উপাদানের চেয়ে ধ্বংসকারী উপাদানই বেশি ছিলো।[৩]

---

১. لِسَانُ الْمِيْزَانِ খ. ৩, পৃ. ২১১। শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহিমাহুল্লাহ [১৩৩৬-১৪১৭ হিজরি]-এর সযত্নে প্রকাশিত। دَارُ الْبَشَائِرِ الإسلامية। বৈরুত। প্রথম প্রকাশ : ১৪২৩ হিজরি।

২. হজরত থানবি রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ যারা হাল্লাজের ব্যাপারে সুসাধরণা পোষণ করেছেন, তাঁদের ব্যাপারে ইমাম ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহর এ মন্তব্য প্রযোজ্য হয়।

৩. البِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ ৫/৩৭৪, دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيَّةُ প্রথম প্রকাশ : ১৪০৮ হিজরি।

৭. বিদগ্ধ দেওবন্দি আলেম **সাইয়িদ মানাজির আহসান গিলানি রাহিমাহুল্লাহ** [১৮৯২-১৯৫৬ হি.] তাঁর 'মুসলমানু কি ফিরকাবন্দিয়ু কা আফসানা' কিতাবে লিখেছেন, একবার হাল্লাজ হিন্দুস্থান ভ্রমণে এসেছিল। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এখানে কেন এসেছ? সে বলল, আমি ভারতবাসীদের থেকে জাদু শিখতে চাচ্ছি। গিলানি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, হুসাইন বিন মানসুর হাল্লাজ দীর্ঘকালব্যাপী যোগসাধনার (yoga) জীবন কাটিয়েছে।[১]

অতএব হাল্লাজের সমকালীন ফকিহগণের ইজমার ভিত্তিতে এবং অধিকাংশ সুফিগণের বক্তব্য অনুসারে তার 'আনাল হক' উক্তিটা 'একীভূত হওয়ার দর্শন'[২]-এর 'মতো' নয়; বরং এটা খোদ 'একীভূত হওয়ার দর্শন'ই। আর হাল্লাজও সেইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা আবেগ ও উন্মাদনার সামনে পরাভূত ছিল। তাছাড়া হাল্লাজের সমকালীন ফুকাহায়ে কেরাম ও অধিকাংশ সুফিয়ায়ে কেরামের ইজমার ভিত্তিতে, হাল্লাজ যে ওয়াহদাতুল উজুদ আকিদায় বিশ্বাসী ছিল, তা এ অর্থেই ছিল যে, নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে প্রবেশ করে আল্লাহ ও সে মিলে এক সত্তা হয়ে গেছেন।

হাল্লাজের ওয়াহদাতুল উজুদ ও হজরত থানবির ওয়াহদাতুল উজুদ এক না হওয়ার বিবরণ

হজরত হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রাহিমাহুল্লাহ [১২৮০-১৩৬২ হি.] ওয়াহদাতুল উজুদ-এর যে ব্যাখ্যা করেছেন, হাল্লাজ সে অর্থে ওয়াহদাতুল উজুদ-এর আকিদা রাখত না। হাল্লাজের কথাই তার স্পষ্ট প্রমাণ। সে এক চিঠিতে লিখেছিল, 'রাহমান রাহিমের পক্ষ

---

১. মুসলমানু কি ফিরকাবন্দিয়ু কা আফসানা, পৃ. ৮১-৮৩, ইদারায়ে ইসলামিয়্যাত, লাহোর। প্রকাশকাল : ১৯৭৬ ঈসায়ি।

২. نَظَرِيَّةُ الاتِّحَادِ

থেকে অমুকের ছেলে অমুকের নিকট'। পরে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলেছে, 'আমি রব হওয়ার দাবি করছি না। এটা মূলত সমন্বয় সাধনের বিষয়। আমার হাত ও আমি হলাম মাধ্যম, কর্তা হলেন আল্লাহ!'[১] তার এ উক্তি এ কথা প্রমাণ করে যে, সে উন্মাদনা কিংবা আবেগের সামনে পরাভূত ছিল না। বরং সে তার দাবি ও কর্মে ছিল পূর্ণ ঐকান্তিক; হাসি-তামাশার ছলে সে এসব দাবি করেনি।

হজরত থানবি রাহিমাহুল্লাহ 'ওয়াহদাতুল উজুদ' পরিভাষাটির আরেকটি ব্যাখ্যা করেছেন। হাল্লাজকে তার সামসময়িক ফুকাহায়ে কেরাম যে ব্যাখ্যার কারণে হত্যাযোগ্য ফতোয়া দিয়েছেন, এটি তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। থানবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ওয়াহদাতুল উজুদ' হলো, নিজের সত্তাকে বিলীন করে কেবল আল্লাহর সত্তাকে দেখা; আল্লাহর সত্তা বিলীন করে নিজের সত্তাকে দেখা নয়।[২]

তিনি আরও বলেন, 'ওয়াহদাতুল উজুদ' হলো, ব্যক্তির দৃষ্টি থেকে সম্ভাব্য সকল কিছুর অস্তিত্ব অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। তবে এ অর্থে নয় যে, সেগুলোই মাবুদ ও ইলাহ![৩]

তিনি আরও বলেন, 'ওয়াহদাতুল উজুদ' তাসাউফের উদ্দেশ্য নয় এবং সুলুকের কোনো বিশেষ স্তরও নয়।[৪]

---

১. ৪০ পৃষ্ঠার টীকায় এ উক্তির বিবরণ আসছে।

২. 'দারুল উলুম দেওবন্দ...' কিতাবের ৭০২ পৃষ্ঠার বরাতে 'আনফাসে ইসা' পৃ. ৩৬১

৩. 'দারুল উলুম দেওবন্দ...' কিতাবের ৭০২ পৃষ্ঠার বরাতে প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

৪. 'দারুল উলুম দেওবন্দ...' কিতাবের ৭০২ পৃষ্ঠার বরাতে প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৩

তিনি আরও বলেন, কোনো ব্যক্তি যখন আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এবং আল্লাহর নৈকট্যভাজন হওয়ার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে ও সাধনায় ডুবে যায়, সর্বদাই আল্লাহর স্মরণ ও চিন্তায় বিভোর থাকে, তখন অসম্ভব নয় যে, 'ওয়াহদাতুল উজুদ' নামক অবস্থাটি তার ওপর প্রভাব বিস্তার করবে ও প্রবল হবে। এটাও অসম্ভব নয় যে, আল্লাহর সত্তা ও অস্তিত্বের সামনে সবকিছু নিঃশেষ ও বিলীন হওয়ার অনুভূতি তার হৃদয়ে জেগে উঠবে! এমনকি তার নিজের অস্তিত্ব ও সত্তাকেও সে হারিয়ে ফেলবে! এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়, মানুষ যখন কৃত্রিম প্রেমাস্পদের ভালোবাসার সমুদ্রে ডুব দেয় এবং মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তার পেছনে ছুটে বেড়ায়, তখন সে এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং অন্তরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।[১]

পূর্বোল্লিখিত ইমামদের বক্তব্য ও টীকায় উল্লিখিত[২] হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহর বর্ণনা অনুসারে হাল্লাজের

---

১. প্রাগুক্ত, ৬৬১। যেমনটি উল্লেখ রয়েছে দারুল উলুম দেওবন্দ... কিতাবে ৭০৩ পৃষ্ঠায়।

২. **হাল্লাজ সম্পর্কে আহলে ইলমের মতামত :** হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আহলে ইলমগণ হাল্লাজ সম্পর্কে যা বলেছেন, তার কিয়দংশ আমি নিম্নে উল্লেখ করছি–

মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া রাজি বলেন, আমি আমর বিন ইয়াহইয়া মক্কিকে হাল্লাজকে অভিশাপ দিতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, 'যদি আমি পারতাম, তবে হাল্লাজকে নিজ হাতে হত্যা করতাম।' আমি বললাম, শাইখের [হাল্লাজের] দোষটা কী? তিনি বললেন, 'আমি কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করলাম। তখন সে [অর্থাৎ হাল্লাজ] বললো, আমি এর মতো [আয়াত] রচনা করতে সক্ষম, অথবা [বলেছে,] এর অনুরূপ বলতে সক্ষম।' এই ঘটনা কুশাইরি তাঁর রিসালায় বর্ণনা করেছেন।

আবু বকর বিন মিমশাজ বলেছেন, দিনওয়ার নামক স্থানে আমার কাছে এক লোক এলো। তার সাথে ছিল একটি বস্তা। দিনরাত সর্বদাই সে বস্তাটা সঙ্গে রাখতো। লোকেরা তার বস্তাটার তল্লাশি করলো। তাতে হাল্লাজের একটি পত্র পাওয়া গেলো, যার শুরু ছিলো, 'রাহমান রাহিমের পক্ষ থেকে অমুকের ছেলে অমুকের নিকট!' পত্রটা বাগদাদে পাঠানো হলো। তিনি বলেন, এরপর হাল্লাজকে উপস্থিত করে পত্রটা তার সামনে পেশ করা হলো। হাল্লাজ বললো, 'এটা আমার হস্তলিপি। এটি আমিই লিখেছি।' লোকেরা তাকে বললো, 'তুমি নবি হওয়ার দাবি করতে! এখন রব হওয়ারও দাবি করছো?' সে জবাব দিলো, 'আমি রব হওয়ার দাবি করছি না। এটা মূলত সমন্বয় সাধনের বিষয়। আমার হাত ও আমি হলাম মাধ্যম, কর্তা হলেন আল্লাহ!'

তাকে বলা হলো, তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে? সে বললো, 'হ্যাঁ, আছে– আবুল আব্বাস বিন আতা, আবু মুহাম্মাদ জারিরি এবং আবু বকর শিবলি।' জারিরিকে এনে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'সে [অর্থাৎ হাল্লাজ] একটা কাফের, তাকে হত্যা করা হবে।' তারপর শিবলিকে জিজ্ঞেস করা হলো। শিবলি বললেন, 'যে এমন কথা বলে, তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।' এরপর ইবনে আতাকে হাল্লাজের উক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো। সে তার পক্ষে বললো, আর তা তার মৃত্যুর কারণ হলো।

আবু উমর বিন হাইয়ুয়াহ বলেন, যখন হুসাইন বিন মানসুর হাল্লাজকে হত্যার জন্য বের করা হলো, তখন আমি মানুষের ভীড়ে ছিলাম। ভীড় ঠেলে এক পর্যায়ে তাকে দেখতে পেলাম। সে তার সাথিদের বলছে, 'তোমরা মোটেও বিচলিত হয়ো না, আমি ত্রিশদিন পরই তোমাদের মাঝে ফিরে আসব।' এরপর তাকে হত্যা করা হলো। এই ঘটনা আবু উমর বিন হাইয়ুয়াহ থেকে উবাইদুল্লাহ বিন আহমাদ সাইরাফি বর্ণনা করেছেন। ঘটনার সূত্র বিশুদ্ধ।

আমি মনে করি, হাল্লাজের পক্ষপাতিত্ব সেই ব্যক্তিই কেবল করতে পারে, যে হাল্লাজের মতো একীভূত হয়ে যাওয়ার কথা বলে। এটা নিরঙ্কুশ সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের কথা। এ কারণেই দেখতে

পাবেন, 'আল-ফুসুস'-এর লেখক ইবনু আরাবি হাল্লাজকে সম্মান করে এবং জুনাইদ বাগদাদির সমালোচনা করে। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

আমি আবু ইয়াকুব নাজিরামির পত্রে পড়েছি : আলি বিন আহমাদ মুহাল্লাবি আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন তাহের মুসায়ি বলেছেন, আমাকে আবু তাহের আসবাহদোস্ত দাইলামি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আহওয়াজ নামক স্থানে গভর্নর মুইযযুদ দাউলার নিকট তোমাদের বাগদাদে নিহত-হওয়া হাল্লাজের পুত্র আসল। তার বাবা যেসব দাবি করেছিলো, সে-ও সেই দাবি করতে লাগল! সে তাকে বলল, 'আমি আপনার কাটা হাত ফিরিয়ে আনতে পারি, তখন আপনি বিষয়টি অস্বীকার করতে পারবেন না! আপনার কানা [যার এক চোখ নেই] কেরানির চোখ ফিরিয়ে দিতে পারি, ফলে সে তা দ্বারা দেখতে পাবে। আমি পানির ওপরও হাঁটতে পারি, আপনি আমাকে দেখতে পারবেন।'

তখন গভর্নর আমাকে বললেন, এর ব্যাপারে তুমি কী বলো? আমি বললাম, তার বিষয়টা আমার ওপর ছেড়ে দিন। গভর্নর বললেন, ঠিক আছে, দিলাম। এরপর আমি তাকে ধরলাম। তার হাত কাটার আদেশ দিলাম, তা কাটা হলো। এরপর বললাম, তোমার হাতটা ফিরিয়ে আনো, যাতে আমরা দেখতে পারি তুমি সত্য বলেছ। এরপর তার চোখ অন্ধ করতে আদেশ করলাম, তা উপড়ে ফেলা হলো। তারপর বললাম, তোমার চোখ ফিরিয়ে আনো দেখি! এরপর তাকে পানিতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ করলাম। তারপর বললাম, পানির ওপর হাঁটো তো, আমরা দেখি! সে একটা কাজও করতে পারল না। আমরা তাকে পানিতে ফেলে দিলাম, সে সেখানেই ডুবে মরল!

['লিসানুল মিজান' ৩/২১১-২১৩ থেকে ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহর বর্ণনা সমাপ্ত হয়েছে। আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহিমাহুল্লাহর তাহকিকসমৃদ্ধ নুসখা। প্রথম প্রকাশ ১৪২৩ হিজরি। دَارُ الْبَشَائِرِ الإسلامِيَّةِ বৈরুত।]

হাল্লাজ-পুত্র সম্ভবত জাদু দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু আবু তাহের আসবাহদোস্ত দাইলামি তাকে সে সুযোগ দেননি।

ব্যাপারে তার সামসময়িক ফকিহগণের অবস্থান সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, হাল্লাজ ও তার মতো লোকেরা যে 'ওয়াহদাতুল উজুদে' বিশ্বাসী ছিলো, তা হজরত থানবি রাহিমাহুল্লাহর বর্ণিত অর্থে নয়। বরং তা এই অর্থে ছিল যে, 'আল্লাহ তার মধ্যে প্রবেশ করে একাকার হয়ে গেছেন!'।

হাল্লাজের পক্ষাবলম্বনকারীদের ব্যাপারে ইবনে হাজারের অভিমত

এ বিষয়টি মোটেও যৌক্তিক নয় যে, হাল্লাজের উক্তির স্বরূপ তার সামসময়িক ফকিহগণের নিকট অস্পষ্ট ছিল, আর কয়েক শতাব্দী পরে আগত কতিপয় আলেমের নিকট তা স্পষ্ট হয়েছে! সামান্য পূর্বে উল্লিখিত টীকায় ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমি মনে করি, হাল্লাজের পক্ষ কেবল সেই ব্যক্তিই নিতে পারে, যে হাল্লাজের অনুরূপ কথা বলে।'[১]

---

১. **বিবেকের একটি প্রশ্ন :** উম্মাহর বিশিষ্ট আলেমগণ অসংখ্য ইলমি বিষয়ে বরেণ্য যে সকল ইমামের মতামতকে সিদ্ধান্ত হিসেবে পেশ করে থাকেন, যেমন– ইমাম আবু বকর জাসসাস হানাফি, কাজি ইয়াজ বিন মুসা ইয়াহসুবি, হাফেজ শামসুদ্দিন জাহাবি, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি, হাফেজ ইবনে কাসির, সাইয়িদ মানাজির আহসান গিলানি রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ। হাল্লাজের ব্যাপারে তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী, তা আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়েছে।

এতো সবের পরও আমরা যখন দেখতে পাই, মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ হাল্লাজের পক্ষে রচিত الْقَوْلُ الْمَنْصُوْرُ فِيْ ابْنِ الْمَنْصُوْرِ। কিতাবটি নিজ তত্ত্বাবধানে প্রকাশ করছেন এবং তার ভূমিকায় লিখছেন, 'ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনার সরলতা এবং সুযোগে অনেক কিছু বিকৃত ও অতিরঞ্জিত হয়ে তার ব্যাপারে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তারপরও যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম এবং আরেফবিল্লাহগণ

ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে আল্লামা কাশমিরির মতামত

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহিমাহুল্লাহ [১২৯২-১৩৫২ হি.] ঐ মর্মের 'ওয়াহদাতুল উজুদ' সম্পর্কে বলেছেন, যা হজরত থানবি রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন; হাল্লাজের 'ওয়াহদাতুল উজুদ' নিয়ে নয়। তিনি বলেছেন, 'জেনে রাখো, ওয়াহদাতুল উজুদে কোনো সমস্যা নেই। এমনটা হওয়া সম্ভব। তবে কেউ যদি এটাকে [ওয়াহদাতুল উজুদকে] আকিদার বিষয় মনে করে, যার ওপর ইমান আনা জরুরি, তাহলে তা মূর্খতা। কারণ, এর পক্ষে সর্বোচ্চ যা রয়েছে তা হলো, ওলি-আওলিয়াদের কাশফ। আবার কারো কাশফ এর বিপরীতও রয়েছে। বস্তুত ইমান আনার উপযুক্ত বিষয় হলো ওহি, অন্য কিছু নয়।'[১]

ওয়াহদাতুল উজুদ পরিভাষাটি আমাদের ব্যবহার না করাই ভালো হতো

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি। থানবি রাহিমাহুল্লাহ 'ওয়াহদাতুল উজুদ'-এর যে ব্যাখ্যা করেছেন এবং

ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো বিচার-বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে যাচাই করে হুসাইন ইবনে মানসুর রহ.কে আরেফবিল্লাহ এবং ফানাফিল্লাহ-এর মহান মাকামে অধিষ্ঠিত করেছেন।' ['মানছুর হাল্লাজ চরিত' পৃ. ২২]

তখন অন্য অসংখ্য বিষয়ে এ সকল ইমাম যখন পূর্বসূরি ফকিহগণের 'ইজমা' নকল করেন, আর নিকটবর্তী মাহবুব কোনো আকাবির বা ইলমি মারকাযের অবস্থান তার বিপরীত থাকে, তখন বর্তমান ও আগত প্রজন্ম সেসকল 'ইজমা'র প্রতি কী পরিমাণ ভরসা করবে, বা আল্লামা উসমানি হাফিজাহুল্লাহর মতো ব্যক্তিত্বদের ওপর কী পরিমাণ আস্থা রাখবে, তা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

১. فَيْضُ البَارِيْ খ. ৪, পৃ. ৪০৩

কাশমিরি রাহিমাহুল্লাহ যে অর্থের ভিত্তিতে 'তাতে কোনো সমস্যা নেই' বলেছেন, হাল্লাজের সমসাময়িক ফকিহগণ ও পূর্বোক্ত ইমামগণ 'ওয়াহদাতুল উজুদ'কে সেই অর্থে ব্যবহার করেননি। আমার সন্দেহ নেই যে, থানবি ও কাশমিরি রাহিমাহুমাল্লাহ যে ব্যাখ্যা করেছেন, আপনস্থানে সে ব্যাখ্যার সুযোগ আছে এবং নেক নিয়তেই তাঁরা তা করেছেন। তবে যেহেতু

- সালাফ 'ওয়াহদাতুল উজুদ' শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার করেননি,
- এই বিশেষ অবস্থা হাসিল করার জন্য নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবিগণও উদ্বুদ্ধ করেননি,
- এটা তাসাউফ ও সুলুকের বিশেষ কোনো স্তরও নয়, যেমনটি থানবি রাহিমাহুল্লাহ নিজেই বলেছেন,
- সর্বোপরি যেহেতু কিছু লোক ওয়াহদাতুল উজুদের এই ব্যবহারের সুযোগ নিচ্ছে এবং এর মাধ্যমে হাল্লাজের ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে দাবি করছে যে, তা এ অর্থেই ছিল; তা ঐ অর্থে ছিল না, যে অর্থের কারণে তার যুগের ফকিহগণ তার জিন্দিক হওয়া এবং রক্ত বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা করেছেন,

তাই আমরা যদি এই পরিভাষাটি ব্যবহার না করতাম, তাহলেই হয়তো ভালো হতো এবং তাতে কোনো ক্ষতিও বোধ হয় হতো না।

যাইহোক, মূলকথা হলো, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা কারো মধ্যে প্রবেশ করেন না, এবং কারো সাথে মিশে একীভূতও হয়ে যান না।

তাঁর সত্তায় কোনো নতুন জিনিস যুক্ত হয় না। সুতরাং তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে নতুনত্ব বলতে কিছু নেই। নতুনত্ব মূলত গুণগুলো যার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় সেই সম্পৃক্ততার মধ্যে। বস্তুত সম্পৃক্ততাটাও নতুন নয়। নতুন মূলত ঐ জিনিসগুলো, যেগুলোর সঙ্গে গুণগুলো যুক্ত হয়। তাই যখন যুক্ত হওয়ার বিষয়গুলো প্রকাশ পায়, তখন সেগুলোর ভিন্নতা অনুপাতে সম্পৃক্ততার বিধানগুলো ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। তিনি সকল বিবেচনায় নতুনত্ব ও অভিনবত্ব থেকে মুক্ত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ.

হে মানুষসকল! তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহই অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত। (সুরা ফাতির : ১৫)

মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা

মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন- তাঁর সত্তা ও গুণাবলি মাখলুকাতের প্রকাশের মুখাপেক্ষী নয়। [যেমন মাখলুকাতের প্রকাশ হোক বা না হোক, দয়া, রাগ ইত্যাদি গুণগুলো সর্বদা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান।] কেউ তাঁর প্রশংসা করুক বা না করুক, তিনি নিজ নাম ও গুণসমূহের মাধ্যমেই প্রশংসিত। তিনি স্থানান্তর ও পরিবর্তন থেকে মুক্ত। এমনকি তাঁর কর্মগত গুণাবলিও কখনো তাঁর থেকে বিলুপ্ত বা পৃথক হয় না। আপন সত্তাগত গুণাবলিতে তিনি [এতোটাই পরিপূর্ণ, যার ওপর পূর্ণতার আর কোনো মাত্রা হতে পারে না। তাই তিনি] সম্পূরকের মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহ তাআলার এ গুণগুলো যার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা নশ্বর হওয়ার কারণে গুণগুলো নশ্বর হয়ে যায় না। যেমন, মাখলুক [সৃষ্ট], মারজুক [রিজিকপ্রাপ্ত], মাসমু [শ্রবণযোগ্য], মুবসার [দৃষ্টিযোগ্য] এবং অন্যান্য বিদ্যমান ও সকল জ্ঞাত বিষয় [নশ্বর হওয়ার ফলে আল্লাহর খালক

(সৃষ্টি), রাজ্‌ক (রিজিকদান), সাম্‌উ (শোনা), বাসার (দেখা), ইলম (জ্ঞান) ইত্যাদি গুণগুলো নশ্বর হয়ে যায় না]।[১]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ.

তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা। সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই জন্য। (সুরা হাশর : ২৪)

আল্লামা বাবিরতি রাহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা

আল্লামা আকমালুদ্দিন বাবিরতি রাহিমাহুল্লাহ [৭১২-৭৭৬ হি.] বলেন, আল্লাহ তাঁর সকল গুণাবলিসহ অনাদি। কারণ,

১. তিনি অনাদিতেই কর্মগত গুণাবলি দ্বারা নিজের প্রশংসা করেছেন এই বলে- هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ.

   তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা। সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই জন্য। (সুরা হাশর : ২৪)

   অতএব, তিনি অনাদিতেই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও আকৃতি দানকারী; যখন কোনো সৃষ্ট, পালনকৃত ও আকৃতিপ্রাপ্ত ছিল না।

২. যদি কর্মগত গুণসমূহ তাঁর সত্তার সঙ্গে অস্থায়ীভাবে যুক্ত হয়, তাহলে তিনি অস্থায়ী জিনিসের ক্ষেত্র সাব্যস্ত হবেন! নাউজুবিল্লাহ। এটা বাতিল। আর গুণগুলো তাঁর সত্তার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে অন্য কোনো সত্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া কিংবা কোনো জায়গায়-ই প্রতিষ্ঠিত না হওয়া, এগুলো সবই অসম্ভব।[২]

---

১. شَرْحُ الفِقْهِ الأَكْبَرِ পৃ. ৫৩।

২. شَرْحُ العقيدةِ الطَّحَاوِيَّةِ আকমালুদ্দিন বাবিরতি রাহিমাহুল্লাহ, পৃ. ৫০, প্রথম প্রকাশ : ১৪০৯ হি./১৯৮৯ ঈসায়ি। প্রকাশক : وِزَارَةُ الأَوْقَافِ وَالشُّؤُوْنِ الإسلامِيَّةِ কুয়েত।

মোটকথা আল্লাহ তাআলার কর্মগত গুণগুলো যার সঙ্গে যুক্ত হয়, তা-ই মূলত অস্থায়ী, গুণগুলো নয়। ৭৮ নং পৃষ্ঠার 'আল্লাহ তাআলার প্রতিটি গুণ সত্তাগতভাবে এক...' শিরোনামের আলোচনায় বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি জাওহার নন এবং আর্‌য নন

জাওহার হলো এমন বস্তু, যা নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত; অস্তিত্ব প্রকাশে সে অন্যের মুখাপেক্ষী নয়। আর আর্‌য হলো এমন বস্তু, যা নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত নয়; অস্তিত্ব প্রকাশে সে অন্য কোনো দেহসত্তা বা জাওহারের মুখাপেক্ষী। যেমন, একটি দরজা ও তার ছায়া। এখানে দরজাটি জাওহার। এটি নিজ অস্তিত্ব প্রকাশে অন্য কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। আর ছায়া হলো আরয। দরজা ছাড়া এটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

যাইহোক ইতোপূর্বে 'তিনি অনাদি, অনন্ত' শিরোনামে ৬ নং পৃষ্ঠায় দুটি আয়াত অতিবাহিত হয়েছে–

১. اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ

আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। (সুরা বাকারা : ২৫৫)

২. هُوَ الۡاَوَّلُ وَ الۡاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الۡبَاطِنُ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ

তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গোপন। তিনি সকল জিনিস সম্পর্কে অবগত। (সুরা হাদিদ : ৩)

সেখানে বলা হয়েছে, আয়াতদুটি আল্লাহ তাআলা অনাদি ও অনন্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আর জাওহার ও আরয, দুটোই অস্থায়ী; অনাদি অনন্ত নয়। সুতরাং আল্লাহ জাওহারও নন, আরযও নন।

আরয অস্থায়ী হওয়ার ব্যাপারটি তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট! কারণ আরয বলা হয় এমন জিনিসকে, যার স্থায়িত্ব ও স্বকীয়তা নেই।

আর জাওহার অস্থায়ী হওয়ার ব্যাপারে বলা যায়, জাওহার বিষয়ক লোকদের বক্তব্য হলো, 'আরয গ্রহণকারী প্রতিটি জিনিসই জাওহার। জাওহার কখনো আরযশূন্য হয় না এবং আরযের আগেও প্রকাশ পায় না।' আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে জিনিস কোনো অস্থায়ী জিনিসের [আরযের] আগে প্রকাশ পায় না, তা নিজেও অস্থায়ী। সুতরাং আল্লাহ জাল্লা শানুহু জাওহার নন, আরযও নন।

কথিত আছে, জাওহার শব্দটি গ্রিক ও অন্যান্যদের কথা থেকে গৃহীত। যে জিনিস নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত, তাকে জাওহার আখ্যা দেওয়ার রীতিটি তাদের কথাতে পাওয়া যায়।

তাঁর কোনো দেহ নেই

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ.

আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। (সুরা বাকারা : ২৫৫)

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গোপন। তিনি সকল জিনিস সম্পর্কে অবগত। (সুরা হাদিদ : ৩)

আয়াতদুটো আল্লাহ তাআলা দেহবিশিষ্ট না হওয়ার প্রমাণ। কারণ, দেহ বিভিন্ন জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত এবং স্থান গ্রহণকারী। তা অস্থায়ী হওয়ার লক্ষণ। আর আল্লাহ তাআলা হলেন অনাদি ও অনন্ত।

তিনি কোনো স্থান বা দিকে নন। 'এখানে' বা 'সেখানে' বলে তাঁর দিকে ইশারা করা যায় না। তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে নড়াচড়া, স্থানান্তর ও পরিবর্তন প্রযোজ্য হয় না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ

তাঁর মতো কিছু নেই। (সুরা শুরা : ১১)

তিনি আরো ইরশাদ করেন, اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ

আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। (সুরা বাকারা : ২৫৫)

আল্লাহ তাআলার জন্য দিক বা স্থান সাব্যস্ত করলে, 'এখানে' বা 'সেখানে' বলে তাঁর প্রতি ইশারা করলে, তাঁর জন্য নড়াচড়া, স্থানান্তর ও পরিবর্তন সাব্যস্ত করলে, দেহের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য সাব্যস্ত করা হয়ে যায়! এমনিভাবে [এ বিষয়গুলো সাব্যস্ত করলে] আল্লাহ তাআলার জন্য অস্থায়িত্ব আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং তাঁর অনাদি হওয়ার গুণ বাতিল হয়ে যায়। সর্বোপরি এ বিষয়গুলো 'আল্লাহ মাখলুক থেকে অমুখাপেক্ষী' গুণের বিপরীত।

ইমাম আবুল মুইন নাসাফি রাহিমাহুল্লাহর পর্যালোচনা

ইমাম আবুল মুইন নাসাফি মাতুরিদি রাহিমাহুল্লাহ [৪১৮/৪৩৮-৫০৮ হি.] তাঁর 'আত তামহিদ লিকাওয়াইদিত তাওহিদ' কিতাবে লিখেছেন, বিরোধীপক্ষরা কুরআন-সুন্নাহর প্রসিদ্ধ কিছু আয়াত নিজেদের পক্ষের দলিল হিসেবে ব্যবহার করে। যথা,

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی.

দয়াময় [আল্লাহ] আরশে ইসতিওয়া করেছেন। (সুরা ত-হা : ৫)

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِی السَّمَآءِ اَنْ یَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ.

তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদেরসহ জমিনকে ধসিয়ে দেবেন না? (সুরা মুলক : ১৬)

وَهُوَ الَّذِیْ فِی السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِی الْاَرْضِ اِلٰهٌ.

তিনিই ইলাহ আসমানে, তিনিই ইলাহ জমিনে।[১] (সুরা যুখরুফ : ৮৪)

১. অর্থাৎ তাঁরই ইবাদত হয় আসমানে এবং তাঁরই ইবাদত হয় জমিনে।

এসব আয়াতের সঙ্গে তাদের দাবির কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, আয়াতগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে অনেকগুলো অসম্ভব বিষয় আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন–

- বাদশাহ যেভাবে সিংহাসনে থাকেন, আল্লাহ তাআলা সেভাবে আরশে থাকা।
- বস্তু যেভাবে স্থান দখল করে, আল্লাহ তাআলা সেভাবে আকাশে অবস্থান করা।
- আকাশে থাকার পাশাপাশি তিনি জমিনেও থাকা।

সবগুলো বিষয়ই অসম্ভব। আর অসম্ভব বিষয় প্রত্যাখ্যাত। শরিয়ত কোনো অসম্ভব বিষয় নিয়ে আসেনি।

অতএব, উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। অন্যথায় প্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞ সত্তা আল্লাহ তাআলার কালামে স্ববিরোধিতা দেখা দেবে। তাই আবশ্যক হলো, প্রতিটি আয়াতের এমন অর্থ গ্রহণ করা, যা আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাতের অনুকূল, হুজ্জাতুল্লাহ তথা বিবেকের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় এবং আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত উক্তির বিরোধী নয়–

لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ.

তাঁর মতো কিছু নেই। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সুরা শুরা : ১১)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অন্য সবকিছুর সাদৃশ্যকে নাকচ করা হয়েছে। বস্তুত স্থান ও স্থান গ্রহণকারী পরিমাপে সমান হয়। কারণ স্থান হলো, যে অংশটুকু স্থান গ্রহণকারী দখল করে রেখেছে, সেটুকু। অন্যটুকু তাঁর জন্য স্থান নয়। আয়াতে এই স্থানকেই নাকচ করা হয়েছে।

আয়াতটি দ্ব্যর্থহীন, তাতে কোনো ব্যাখ্যার সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে যে আয়াতসমূহ দ্বারা বিরোধীরা দলিল পেশ করে, সেগুলো

দ্ব্যর্থবোধক, বিভিন্ন কারণে সে আয়াতগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব, যেমনটি আমরা বলে এসেছি। হয়তো কোনো ধরণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই সে আয়াতগুলোর ওপর ইমান আনতে হবে। এটি উম্মাহর মহান ব্যক্তিবর্গ ও উলামায়ে ইসলামের অধিকাংশের মত। অথবা সেগুলোর এমন ব্যাখ্যা করতে হবে, যা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের অনুকূল এবং দ্ব্যর্থহীন আয়াতগুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিকও নয়। তাফসির ও কালাম বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের কিতাবসমূহ এই ধরণের ব্যাখ্যায় ভরপুর। আমাদের এই কিতাবে তা আলোচনা করা সম্ভব নয়।...

দুআর সময় আকাশের দিকে দুই হাত উত্তোলন করা নিছক একটি ইবাদত। যেমন সালাতে কাবা অভিমুখী হওয়া এবং সিজদায় চেহারা মাটিতে রাখা। এর মানে এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা কাবাতে আছেন কিংবা মাটির নিচে আছেন![১]

লেখকের 'এখানে বা সেখানে বলে তাঁর দিকে ইশারা করা যায় না।' উক্তিটি বাঁদির হাদিসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। যেখানে বলা হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বাঁদিকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'আল্লাহ কোথায়?' তখন সে আকাশের দিকে ইশারা করেছে।[২]

রাসুলের 'আল্লাহ কোথায়?' প্রশ্নটি লেখকের উল্লিখিত উক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, নবিজি থেকে 'আল্লাহ কোথায়?' প্রশ্নটি প্রমাণিত কি না, সে বিষয়টিই পর্যালোচনার দাবিদার। যদি তা প্রমাণিত হয়েও থাকে, তাহলে তার অর্থ হবে, 'তোমার কাছে

---

১. التَّمْهِيْدُ لِقَوَاعِدِ التوحيدِ কিতাবের উদ্ধৃতি সমাপ্ত হয়েছে। পৃষ্ঠা, ১৫৮-১৬৫। প্রথম প্রকাশ : ১৪০৬ হি.। প্রকাশক : دَارُ الطِّبَاعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ মিশর।

২. সহিহ মুসলিম, ১২২৭। دَارُ الْجِيْلِ বৈরুত ও دَارُ الْآفَاقِ الْجَدِيْدَةِ বৈরুত -এর যৌথ প্রকাশনা।

আল্লাহর মর্যাদা কেমন?'। আর বাঁদির 'আকাশে' ইশারা করার অর্থ ছিল, আল্লাহ তাআলা মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে রয়েছেন।

প্রিয় পাঠক, আপাতত এতটুকু জানাই আপনার জন্য যথেষ্ট। তবু যারা বিষয়টি আরো বিস্তারিত জানতে ও বুঝতে চান, তারা টিকায় উল্লিখিত আল্লামা যাহিদ কাওসারি রাহিমাহুল্লাহর [১২৯৬-১৩৭১ হি.] আলোচনাটি পড়ে নিন।[১]

---

১. **'আল্লাহ কোথায়?' প্রশ্ন বিষয়ে আল্লামা যাহিদ কাউসারির বিশ্লেষণ [আলেমদের জন্য]**

আল্লামা মুহাম্মাদ যাহিদ কাউসারি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'তাকমিলাতুর রাদ্দি আলা নুনিয়্যাতি ইবনিল কাইয়িম' কিতাবে লিখেছেন, হাদিসটি মুআবিয়া বিন হাকাম থেকে আতা বিন ইয়াসার বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন বর্ণনায় তিনি বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন।

তাঁর এক বর্ণনায় আছে, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার [অর্থাৎ বাঁদির] দিকে নিজ হাত প্রসারিত করলেন এবং ইশারায় জিজ্ঞাসা করলেন, আকাশে কে?...'।

এ থেকে বোঝা যায়, কথোপকথনটি হয়েছিল ইশারার মাধ্যমে। তাছাড়া একজন বোবা ও বধিরের সাথে মুখে কথা বলা অনর্থক কাজ।

সুতরাং কাসিদা রচয়িতা [ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ] ও লেখক [তাকিউদ্দিন সুবকি রাহিমাহুল্লাহ] যে শব্দের প্রতি ইশারা করেছেন, ['আল্লাহ কোথায়?'], তা ছিল কোনো রাবির নিজস্ব বুঝ অনুযায়ী ব্যবহার করা শব্দমাত্র; তা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত শব্দ নয়।

এ ধরনের হাদিস থেকে তো আমলের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ গ্রহণ করা যায়; কিন্তু আকিদার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ নয়। এ কারণেই সহিহ মুসলিমে হাদিসটি 'সালাতে কথা বলা হারাম' পরিচ্ছেদে আনা হয়েছে; 'ইমান' অধ্যায়ে নয়। কারণ, হাদিসটিতে সালাতে হাঁচির

জবাব ও এ ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধাজ্ঞা সংবলিত আলোচনা এসেছে। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটি 'সহিহ বুখারি'তে আনেননি, বরং 'খালকুল আফআল' পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন। তা-ও সংক্ষেপে শুধু ঐ অংশটুকু এনেছেন, যতটুকু হাঁচির জবাব বিষয়ক। আকাশে আল্লাহ তাআলার অবস্থান বিষয়ক অংশ তিনি উল্লেখই করেননি। তিনি হাদিসটি সংক্ষিপ্ত করার দিকে ইশারাও দেননি! আর মালেক থেকে লাইসির বর্ণনায় হাদিসটিতে 'কারণ সে ইমানদার' অংশটুকু নেই।

এই হাদিস দ্বারা আল্লাহর জন্য 'স্থান' সাব্যস্ত করার দলিল পেশ করা ভুল। কারণ, আল্লাহ তাআলা স্থান ও স্থান সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি এবং সময় ও সময় সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি থেকে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ.

বলুন, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা আছে, তা কার মালিকানাধীন? [তারপর তারা যদি উত্তর না দেয় তবে নিজেই] বলুন, আল্লাহরই মালিকানাধীন। (সুরা আনআম : ১২)

এ আয়াত থেকে বুঝে আসে, স্থান ও স্থানের মধ্যে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন,

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

রাত ও দিনে যা কিছু স্থিতি লাভ করে, তা তাঁরই। (সুরা আনআম : ১৩)

এ আয়াতটি প্রমাণ করছে যে, সময় এবং সময়ের মধ্যে যা কিছু আছে, সব আল্লাহ তাআলার অধিকারভুক্ত।

সুতরাং আয়াতদুটি দ্বারা স্পষ্ট বুঝে আসছে, স্থান ও স্থান সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি এবং সময় ও সময় সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি, সবই আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন। আর এটি এ বিষয়েরও প্রমাণ যে, আল্লাহ তাআলা স্থান ও কাল থেকে পবিত্র। যেমনটি ফখরুদ্দিন রাজি রাহিমাহুল্লাহর 'আসাসুত তাকদিস' কিতাবে রয়েছে।

হাদিসটিকে যাহাবি যদিও বড় করে দেখিয়েছেন এবং সহিহ আখ্যা দিয়েছেন; কিন্তু সনদ ও মতনের দিক থেকে এতে গরমিল রয়েছে। যাহাবির 'কিতাবুল উলু', 'মুআত্তা'-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও ইবনে খুযাইমা রচিত 'তাওহিদ'- এ কিতাবগুলোতে হাদিসটির সনদগুলো দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন, এটির সনদ ও মতনে গরমিলের পরিমাণ কী! এগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা আখ্যা দেওয়াটাও হাদিস ও ফিকহ উভয় শাস্ত্রে অবগাহনকারী ব্যক্তিবর্গের নিকট অগ্রহণযোগ্য। বস্তুত একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল বর্ণনাগুলোকে ইবনুল হাকামের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কাব বিন মালেকের হাদিসটি সহিহ নয়। এবং ঐ হাদিসটিও সহিহ নয় যা একজন নারী থেকে বর্ণিত। মালেক এ স্বীকারোক্তি ছাড়াই উমর বিন হাকাম থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন যে, তারা দুজন [কাব বিন মালেক ও উল্লিখিত নারী] ভুল করেছে। মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুআবিয়া বিন হাকাম থেকে। উভয় বর্ণনা পূর্বে গত হয়েছে। অবশ্য মালেকের বর্ণনায় 'কারণ সে ইমানদার' অংশটি নেই।

'মুআত্তা মালেকে' একজন আনসারি [প্রথম রেওয়াতের ঘটনা বর্ণনাকারী] থেকে ইবনু শিহাব যুহরির যে ভাষা বর্ণিত রয়েছে তা হলো, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে [বাঁদিকে] জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি এই সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল? সে বললো, হ্যাঁ।' তা হলে কোথায় এই হাদিস, আর কোথায় ওই হাদিস!?

কিতাবের শেষদিকে অচিরেই যাহাবির অবস্থা জানতে পারবেন। অতএব, এ বিষয়টি তাঁর বড় করে দেখানো ও তাঁর তাহরিফের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। হয়তো 'আল্লাহ কোথায়?' শব্দটা কোনো রাবি তাঁর বুঝ মোতাবেক পরিবর্তন করে বলেছেন। 'রিওয়ায়াত বিল মানা' তো সর্বযুগেই ছিল। কিন্তু কাজটা যখন ফকিহ রাবি ছাড়া অন্য কেউ করে, তখন তা অনেক অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়! আর ঘটনার বর্ণনাকারী কোনো ফকিহ সাহাবি ছিলেন না। নির্ভরযোগ্য মতানুসারে

এ হাদিসটি ছাড়া তাঁর থেকে অন্য কোনো হাদিস বর্ণিত নেই। উপরন্তু তিনি ছিলেন এমন একজন গ্রাম্য লোক, যিনি নামাজে কথা বলতেন।

তাছাড়া 'কোথায়' শব্দটি দ্বারা 'স্থান' সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হয়, 'মর্যাদা' সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হয়। প্রথমটি হাকিকত [প্রকৃত অর্থ]; দ্বিতীয়টি মাজায [রূপকার্থ]। অথবা দুটোই হাকিকত। আবু বকর ইবনুল আরাবি আবু রাযিনের হাদিসের ব্যাখ্যায় 'আল আরিযাতুল আহওয়াযি' কিতাবে লিখেছেন, আল্লাহ সম্পর্কে 'কোথায়' শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করলে তার উদ্দেশ্য হয় 'মর্যাদা'। কারণ, আল্লাহর জন্য 'স্থান' অসম্ভব। 'কোথায়' শব্দটি মর্যাদার জন্যও ব্যবহার করা হয়। কেউ কেউ বলেন, শব্দটি স্থানের জন্য হাকিকত, মর্যাদার জন্য মাজায। কেউ বলেন, স্থান ও মর্যাদা উভয়ের জন্যই হাকিকত। সঠিক কথা হলো, প্রত্যেক ভাষায় শব্দটির উভয় ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। প্রতিটি ব্যবহারের পক্ষে দু দল লোক রয়েছেন।

আবুল ওয়ালিদ বাজি 'আল মুনতাকা' গ্রন্থে লিখেছেন, 'অমুকের স্থান আসমানে' অর্থ, তাঁর অবস্থা, উচ্চতা ও সম্মান উর্ধ্বে। অতএব হয়তো বাঁদিটি আল্লাহ তাআলার উচ্চ মর্যাদা বোঝাতে চেয়েছে। যার মর্যাদা সুউচ্চ, এমন প্রত্যেককেই এই শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা যায়।

অতএব 'আল্লাহ কোথায়?' এর অর্থ হবে, তোমার নিকট আল্লাহ তাআলার মর্যাদা কেমন? 'আকাশে' বলার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে রয়েছেন। এ অর্থটি উল্লিখিত 'তুমি কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই? সে বললো, হ্যাঁ।'-এর অর্থের সঙ্গে মিলে যায়।

যদি বলা হয়, পূর্বোক্ত ধরনের বিপরীতে এটাও তো হতে পারে যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যবহৃত শব্দ ছিল 'আল্লাহ কোথায়?' আর বর্ণনাকারী 'রিওয়ায়াত বিল মানা' হিসেবে 'তুমি কি এই সাক্ষ্য দাও যে...' বলেছেন। এ কথার জবাব হলো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দীর্ঘ নবুওয়াত-জীবনে ইমান শেখানোর জন্য 'কোথায়' শব্দটি অথবা স্থানবোধক অন্য কোনো শব্দ একবারের জন্যও ব্যবহার করেছেন বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না,

এই গরমিলপূর্ণ বর্ণনাটি ছাড়া। বরং প্রমাণিত বিষয় হলো, তিনি কালিমাতুশ শাহাদাতের তালকিন করতেন। অতএব স্বাভাবিক নিয়মে প্রচলিত শব্দই রাসুলের শব্দ হওয়ার অধিক উপযুক্ত।

তাছাড়া মুহাক্কিক সাইয়িদ শরিফ জুরজানি 'শারহুল মাওয়াকিফ' গ্রন্থে বলেছেন, বাঁদির আকিদার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এই উদ্দেশ্যে 'কোথায়?' শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করা সম্ভব ছিল যে, সে জমিনের কোনো মূর্তির পূজারি, নাকি আকাশমণ্ডলের রব আল্লাহ তাআলার ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী?

কতক আলেম সাধারণ মানুষজনকে ভ্রান্তিমূলক শব্দ ব্যবহার করার ব্যাপারে মাজুর মনে করেন। তাঁরা আল্লাহ তাআলার ওপর মৌলিক বিশ্বাস থাকাকেই বিবেচনা করেন; যদিও বর্ণনা দিতে গিয়ে লোকেরা কোনো ভ্রান্তিমূলক শব্দ ব্যবহার করে বসে। ইমাম কুরতুবি সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল মুফহিম' কিতাবে এ ব্যাখ্যার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। ইবনুল জাওযি বলেন, আলেমদের নিকট এই বিষয়টি প্রমাণিত যে, আসমান-জমিন আল্লাহ তাআলাকে বেষ্টন করতে পারে না। দিগন্তসমূহও তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। ওই বাঁদির ইশারা দ্বারা তার কাছে স্রষ্টার মর্যাদার বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

উপরন্তু যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, নবিজি 'কোথায়' শব্দটিই বলেছিলেন, তাহলে বাজি ও ইবনুল আরাবি যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, সে অর্থ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই। আর হাদিস, ভাষা, আকিদা ও ফিকহে এই মহান দুই ইমামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা মূর্খ ছাড়া কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যে সাহাবি আকাশের ওপর 'মাযহার' চেয়েছেন, তাঁর উক্তিটি বাজি যেদিকে ইশারা করেছেন, তার পক্ষের একটি দলিল।

ঈষৎ পরিবর্তনসহ যাহিদ কাউসারি রাহিমাহুল্লাহ রচিত تَكْمِلَةُ الرَّدِّ عَلَى نُوْنِيَّةِ ابنِ القَيِّمِ গ্রন্থের বর্ণনা সমাপ্ত হয়েছে। এটি আবুল হাসান তাকিউদ্দিন সুবকি রাহিমাহুল্লাহ [৬৮৩-৭৫৬ হিজরি] রচিত السَّيْفُ الصَّقِيْلِ فِي رَدِّ نُوْنِيَّةِ ابن زَفِيْل কিতাবের টীকা। পৃ. ৮২-৮৪, المَكْتَبَةُ الأَزْهَرِيَّةُ لِلتُّرَاثِ মিসর।

তিনি অজ্ঞতা ও মিথ্যা থেকে পবিত্র

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ.

[হে নবি! আপনি তাদেরকে] বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর এমন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করছ, যা তিনি জানেন না? (সুরা ইউনুস : ১৮)

তিনি আরো ইরশাদ করেন, وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا

কথায় আল্লাহ অপেক্ষা বেশি সত্যবাদী কে হতে পারে? (সুরা নিসা : ১২২)

তিনি আরশে ইসতিওয়া গ্রহণ করেছেন, যেভাবে স্বয়ং বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু তা স্থান ও দিক হিসেবে নয়; বরং এই 'ইসতিওয়া গ্রহণ'-এর মূলরূপ একমাত্র তিনিই জানেন এবং সেসকল গভীর ইলমের অধিকারী ব্যক্তিরা, আল্লাহ যাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ইলম দান করেছেন।

লেখকের 'যেভাবে স্বয়ং বিবরণ দিয়েছেন' উক্তির উদ্দেশ্য হলো সুরা আরাফের ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ [অতঃপর তিনি আরশে ইসতিওয়া গ্রহণ করেছেন] আয়াতাংশটি।

ইসতিওয়া-এর মূলরূপ গভীর ইলমের অধিকারী ব্যক্তিদের জানার দাবির পর্যালোচনা

'সেসকল গভীর ইলমের অধিকারী ব্যক্তিরা[ও জানেন], আল্লাহ যাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ইলম দান করেছেন' বাক্যটিতে আপত্তি রয়েছে। কারণ সালাফের কেউই এ কথা বলেননি যে, গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরা 'আরশে আল্লাহর ইসতিওয়া' এবং মুতাশাবিহ অন্যান্য বিষয়গুলোর মূলরূপ জানেন! এ সম্পর্কে ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ-এর উক্তি সামনে আসছে। তাতে এক পর্যায়ে তিনি

বলেছেন, 'কারণ, তাঁদেরকে [গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদেরকে] যা দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে, তা তাঁরা জানেন ও বোঝেন। যদিও সকল বিষয়ের বাস্তবতা ও মূলতত্ত্ব তাঁরা জানেন না'।

প্রকৃত অবস্থাসহ মুতাশাবিহাতের বাস্তবতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরাও না জানার ব্যাপারে আমরা ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য উল্লেখ করব। এর পূর্বে নিজের ভাষায় তার একটি সারসংক্ষেপ উল্লেখ করছি–

ওয়াকফ-এর স্থানের ব্যাপারে কেরাত বিশেষজ্ঞগণের মতবিরোধ ও আয়াতের মর্মের ভিন্নতা

সুরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াতে এসেছে,

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ.

হাফেজ ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসিরগ্রন্থে এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে [অর্থাৎ 'ইল্লাল্লাহ' এর পরে] ওয়াকফ হবে নাকি হবে না, এ ব্যাপারে কেরাত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ওয়াকফ হবে। আর এ মতটি হজরত ইবনে আব্বাস, আয়িশা, উরওয়াহ, আবু শাসা, আবু নাহিক প্রমূখ থেকে বর্ণিত রয়েছে। রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম। তাফসিরে আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত আছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়াতটি এভাবে পড়তেন,

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ: آمَنَّا بِهِ.

এর বাস্তবতা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী তারা বলে, আমরা এর ওপর ইমান এনেছি।

ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কেরাত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছেন যারা وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ এর পর ওয়াকফ

করে থাকেন। অনেক মুফাসসির ও উসুলবিদ তাঁদের অনুসরণ করেছেন এবং বলেছেন, যা বুঝে আসে না, তা দ্বারা সম্বোধন করা দূরবর্তী বিষয়! ইবনে আবি নাজিহ মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'আমি সেসব গভীর জ্ঞানের অধিকারীদের একজন, যারা তার ব্যাখ্যা জানে!'

তখন আয়াতের মর্ম দাঁড়াবে, গভীর জ্ঞানের অধিকারীরা, তাদেরকে যা দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা জানেন ও বোঝেন। যদিও সকল বিষয়ের বাস্তবতা ও মূলতত্ত্ব তাঁরাও জানেন না।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত তাবিল শব্দের দুই অর্থ ও আয়াতের মর্মের ভিন্নতা

এখন ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহর ভাষায় তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করা হচ্ছে। তিনি বলেছেন, কতক আলেম এখানে বিশ্লেষণ করে বলেন, তাবিল শব্দটি পবিত্র কুরআনে দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-

এক. কোনো জিনিসের মূলতত্ত্ব ও বাস্তবতা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَرَفَعَ اَبَوَيۡهِ عَلَى الۡعَرۡشِ وَخَرُّوۡا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاۡوِيۡلُ رُءۡيَایَ مِنۡ قَبۡلُ قَدۡ جَعَلَهَا رَبِّیۡ حَقًّا.

তিনি [ইউসুফ আলাইহিস সালাম] তাঁর পিতা-মাতাকে সিংহাসনে ওঠালেন, আর তারা তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে গেল। তিনি বললেন, আব্বাজান! এই হলো আমার পূর্বের স্বপ্নের বাস্তবতা, আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করেছেন। (সুরা ইউসুফ : ১০০)

এবং এই আয়াত, هَلۡ يَنۡظُرُوۡنَ اِلَّا تَاۡوِيۡلَهٗ ؕ يَوۡمَ يَاۡتِیۡ تَاۡوِيۡلُهٗ.

তারা কি কেবল তার বাস্তবতার অপেক্ষা করছে? যেদিন তার বাস্তবতা সমাগত হবে। (সুরা আরাফ : ৫৩)

অর্থাৎ তারা কি পুনরুত্থানের ব্যাপারে তাদের যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তার প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষায় আছে?

যদি তাবিল দ্বারা এটি উদ্দেশ্য হয়, তা হলে 'আল্লাহ' শব্দের ওপর ওয়াকফ করতে হবে। কারণ, সকল বিষয়ের বাস্তবতা ও মূলতত্ত্ব কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। তখন وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ আয়াতাংশটি পূর্ণ বাক্য বিবেচিত হবে। এ হিসেবে وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ হবে 'উদ্দেশ্য' [মুবতাদা], আর يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ হবে 'বিধেয়' [খবর]।

দুই. কোনো জিনিস ব্যক্ত করা কিংবা ব্যাখ্যা করা।

যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী, نَبِّئْنَا بِتَأْوِيْلِهٖ.

আমাদেরকে তার ব্যাখ্যা অবগত করো। (সুরা ইউসুফ : ৩৬)

যদি এই অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ এর পর ওয়াকফ হবে। কারণ, তাঁদেরকে যা দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা তাঁরা জানেন ও বোঝেন। যদিও সকল বিষয়ের বাস্তবতা ও মূলতত্ত্ব তাঁরাও জানেন না।[১]

মুতাশাবিহ বিষয়গুলোর ব্যাপারে হজরত থানবির সতর্কবার্তা

হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'ফুরূউল ঈমান' কিতাবে লিখেছেন-

---

১. আল্লাহ তাআলার মুতাশাবিহ গুণগুলোর ব্যাপারে মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহর চমৎকার একটি প্রবন্ধ রয়েছে। مَقَالَاتُ الْعُثْمَانِيِّ কিতাব থেকে مُلَاحَظَاتٌ فِي صِفَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى শিরোনামে الْعَقِيْدَةُ الصَّفِيَّةُ عَلَى الْعَقِيْدَةِ الْحَسَنَةِ কিতাবের শেষেও তা যুক্ত করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন। খুব উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

জানা থাকা উচিত, আল্লাহ তাআলার সত্তা যেমন প্রশ্নাতীত ও ধারণাতীত, তেমনি তাঁর গুণাবলিও প্রশ্নাতীত ও ধারণাতীত। তাই আল্লাহ তাআলার গুণাবলির ব্যাপারে ধারণা ও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কথা বলা এবং তার ব্যাখ্যা ও আকৃতি নির্ধারণ করা মারাত্মক বিপজ্জনক। এ বিষয়ে অনেক সাধারণ মানুষের আকিদা খুবই নিরাপদ। তারা সংক্ষেপে আল্লাহ তাআলার গুণাবলির ওপর বিশ্বাস রাখে, এগুলোর ব্যাপারে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও অধিক টানা-হেঁচড়া করে না। পূর্বকালের বুযুর্গ তথা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম ও তাবেয়িগণের বিশ্বাসও এমনই ছিল। তারপর যখন বিদআতিদের দল ভারী হয়ে উঠল এবং তর্কশাস্ত্রের বিস্তার ঘটল, তখন আল্লাহ তাআলার গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা বৃদ্ধি পেল এবং বেশিরভাগ বিধি-বিধানের ব্যাপারে অসতর্ক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى.

দয়াময় [আল্লাহ] আরশে ইসতিওয়া গ্রহণ করেছেন। (সুরা তাহা : ৫)

এ আয়াত প্রসঙ্গে এই বিশ্লেষণ শুরু করা যে, ইসতিওয়া দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এর উদ্দেশ্যই বা কী? নিঃসন্দেহে এ জাতীয় আলোচনা ও গবেষণা নির্ভীক আচরণ। মানুষ নিজের গুণাবলির হাকিকত সম্পর্কেই যেখানে পূর্ণ অবগত নয়, সেখানে মহান স্রষ্টার গুণাবলির মর্ম সম্পর্কে কী জানবে? তাই সহজ সরল কথা হলো, সংক্ষেপে আকিদা পোষণ করবে যে, আল্লাহ তাআলা যা কিছু বলেছেন তা সত্য। তাঁর সত্তা যেমন, তাঁর ইসতিওয়া গ্রহণ করাও তেমন। অধিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনটাই বা কি! আমাদেরকে এভাবে বিশ্লেষণের নির্দেশও দেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে আমাদেরকে জিজ্ঞাসাও করা হবে না। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখবে যে, তাঁর ইসতিওয়া গ্রহণ করা আমাদের ইসতিওয়া গ্রহণ করার মতো নয়।

কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. কোনো কিছুই তাঁর মতো নয়। (সুরা শুরা : ১১)

বাকি রইল, তাহলে তাঁর ইসতিওয়া কেমন? এ নিয়ে আলোচনাই করবে না। আল্লাহ তাআলার ওপর সমর্পণ করবে।

কিংবা হাদিস শরিফে এসেছে–

يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا.

আমাদের প্রভু প্রতি রাতে নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন।[১]

এখন এ চিন্তায় পড়া যে, অবতরণের অর্থ কী? এবং কীভাবে তিনি অবতরণ করেন? এগুলো অর্থহীন কাজ। এ জাতীয় কাজে লিপ্ত হবে না। এগুলোর প্রকৃত তত্ত্ব কেউ কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারবে না। তাই এ নিয়ে সময় নষ্ট করবে না। বরং এ হাদিস বলা দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে লক্ষ্য, অর্থাৎ তখন মানুষ যেন আন্তরিকভাবে এবং আবেগ-উদ্দীপনা সহকারে জিকির ও ইবাদতে মগ্ন থাকে, আমাদেরও তাই করা উচিত। আল্লাহ তাআলার এ সমস্ত গুণাবলির মূল তত্ত্বের ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না। তাই এর পেছনে সময় ব্যয় করা নিজের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করার নামান্তর। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ.

---

১. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১১৪৫ ও সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৮০৮। অবশ্য বুখারি ও মুসলিমের শব্দ হলো, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا

সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তারা তার [কুরআনের] মুতাশাবিহ বিষয়গুলোর অনুসরণ করে, ফিতনার [ফিতনা সৃষ্টি করার] উদ্দেশ্যে এবং তার স্বরূপ খোঁজার জন্যে। (সুরা আলে-ইমরান : ৭)[১]

তিনি কিয়ামতের দিন দুইভাবে মুমিনদের দৃষ্টিগোচর হবেন–

১. মানুষ নিজ বিবেক খাটিয়ে যতটুকু পরিচয়ের ভিত্তিতে আল্লাহর ওপর ইমান আনে, তার চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে তিনি মানুষের সামনে প্রকাশ হবেন। যেন তা চোখে দেখা। তবে এতে মুখোমুখি ও সামনাসামনি হওয়ার বিষয় থাকবে না। কোনো দিক, রং বা আকৃতি কিছুই থাকবে না। মুতাজিলা ও অন্যান্যরা এতটুকু বলে। আর এটুকু সঠিক। তবে তাদের ভুল হলো, 'দেখা'কে এ অর্থ দ্বারা ব্যাখ্যা করা, কিংবা 'দেখা'কে এ অর্থে সীমাবদ্ধ করা।

২. তিনি বিভিন্ন আকৃতিতে মানুষের সামনে প্রকাশ হবেন, যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। ফলে মানুষ তাঁকে আকৃতি ও বর্ণ সহকারে মুখোমুখি অবস্থায় নিজ চোখে দেখবে। যেমনটি স্বপ্নে হয়ে থাকে। যেভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি আমার প্রতিপালককে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতিতে দেখেছি।' অতএব মানুষ তাঁকে সেখানে স্বচক্ষে দেখবে, যেভাবে দুনিয়াতে স্বপ্নে দেখে।

এই দুটো পন্থা আমরা বুঝি ও বিশ্বাস করি। যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল 'দেখা' দ্বারা ভিন্ন কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, তবে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যের ওপর ইমান রাখি, যদিও আমরা তার মূলরূপ না জানি।

---

১. 'ফুরূউল ঈমান' পৃ. ১১-১২, মাকতাবাতুল আশরাফ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০২২ ইসায়ি।

লেখক 'দেখা'-এর প্রথম ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করার পর, তাতে মুতাজিলাদের দুটি ভুলের কথা ব্যক্ত করেছেন-

আল্লাহ তাআলাকে দেখা বিষয়ে মুতাজিলাদের ভুলের বিবরণ

১. কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত 'দেখা'কে 'স্পষ্টরূপে প্রকাশ' [যেনো তা চোখে দেখা] অর্থে ব্যাখ্যা করা।

২. 'দেখা'কে 'স্পষ্টরূপে প্রকাশ' অর্থে সীমাবদ্ধ করে ফেলা।

প্রথমটিকে ভুল আখ্যা দেওয়া দ্বারা প্রতীয়মান হয়, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত উল্লিখিত 'স্পষ্টরূপে প্রকাশ'-এর বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করেন না। তাঁরা মূলত কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত 'দেখা'কে 'স্পষ্টরূপে প্রকাশ' বলে ব্যাখ্যা করাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত 'দেখা'কে 'চোখে দেখা' অর্থেই সীমাবদ্ধ রাখেন; একে 'স্পষ্টরূপে প্রকাশ' অর্থে গ্রহণ করেন না। মোটকথা, তাঁরা 'স্পষ্টরূপে প্রকাশ'-এর বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করেন না; তবে কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত 'দেখা'কে 'স্পষ্টরূপে প্রকাশ' বলে ব্যাখ্যা করাকে প্রত্যাখ্যান করেন।

দ্বিতীয়টিকে ভুল আখ্যা দেওয়া দ্বারা প্রতীয়মান হয়, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মধ্যে একটি দল এমন রয়েছেন, যারা কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত 'দেখা'কে 'স্পষ্টরূপে প্রকাশ' অর্থে ব্যাখ্যা করাকে গ্রহণ করে থাকেন। তবে তাঁরা এটাকে 'দেখা'র একমাত্র ব্যাখ্যা মনে করেন না। বরং তাঁরা মনে করেন 'দেখা' শব্দটি 'চোখে দেখা' এবং 'যেন চোখে দেখা' উভয় অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

কিয়ামতের দিন মুমিনরা আল্লাহ তাআলাকে দেখবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

সেদিন কিছু চেহারা হবে উজ্জ্বল। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সুরা কিয়ামাহ : ২২-২৩)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ.

যারা উত্তম [কাজ] করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম [পরিণতি] এবং অতিরিক্ত। (সুরা ইউনুস : ২৬)

আয়াতটিতে যে 'অতিরিক্ত' বলা হয়েছে, তা হলো আল্লাহ তাআলার দর্শন। ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ [২০৬-২৬১ হি.] হজরত সুহাইব রুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা কি কিছু চাও, আমি তোমাদের আরো বৃদ্ধি করে দেবো? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাননি?' [অর্থাৎ আমাদের আর চাওয়ার কিছু নেই] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তারপর আবরণ সরিয়ে দেওয়া হবে। [তখন মনে হবে] মহান প্রতিপালকের দিদার লাভের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় কিছু তাদের দেওয়া হয়নি।[১]

দীদার অস্বীকারকারীদের সন্দেহের অপনোদন

আখেরাতে আল্লাহ তাআলাকে চোখে দেখার বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহ এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত– উম্মাহর সালাফ, আইম্মায়ে কেরাম ও জুমহুর মুসলমানদের মত এটিই। আল্লাহ তাআলাকে দেখা বিষয়ে এতো পরিমাণ হাদিস বর্ণিত আছে যে, তা তাওয়াতুরের[২] পর্যায়ে

---

১. সহিহ মুসলিম, ২৯৭, دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيَّةِ বৈরুত।

২. **তাওয়াতুরের সংজ্ঞা :** 'তাওয়াতুর' অর্থ হলো, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে আমাদের পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে, এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা এ পরিমাণ থাকা যে, তাঁদের সকলের ভুল বা মিথ্যার ওপর একমত হয়ে যাওয়া যুক্তির নিরিখে অসম্ভব।

পৌঁছে গেছে। যারা 'দেখা'কে অস্বীকার করে, তারা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করে,

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ.

দৃষ্টিসমূহ তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। তিনি দৃষ্টিসমূহকে বেষ্টন করে রাখেন। (সুরা আনআম : ১০৩)

মূলত ভুলটা হয়েছে 'দেখা' এবং 'সর্বদিক থেকে বেষ্টনীর সাথে দেখা'কে গুলিয়ে ফেলার কারণে এবং এ দুয়ের মধ্যকার পার্থক্য না জানার কারণে। কেননা, 'দেখা'র অর্থ কখনোই 'সর্বদিক থেকে বেষ্টনীর সাথে দেখা' নয়। দেখা দ্বারা 'সর্বদিক থেকে বেষ্টনীর সাথে দেখা' আবশ্যকও হয় না। আর আল্লাহ তাআলাকে 'সর্বদিক থেকে বেষ্টনীর সাথে দেখা' অসম্ভব। কারণ, তাঁর মতো কিছু নেই (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)। সবদিক থেকে বেষ্টনীর সাথে দেখতে না পারা, 'দেখা'র অস্তিত্বকে নাকচ করে না। অতএব মুমিনরা জান্নাতে স্বচক্ষে আল্লাহ তাআলাকে দেখবে। তবে তাঁদের দৃষ্টি আল্লাহ তাআলাকে বেষ্টন করতে পারবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলাকে কোনো কিছুই বেষ্টন করতে পারে না, বরং তিনিই সকল কিছুকে বেষ্টন করে রাখেন।[১]

তিনি যা চান, তা-ই হয়; যা চান না, তা হয় না। অতএব, কুফর ও গুনাহ তাঁর সৃষ্টি; তাঁর ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়, তবে তাঁর সন্তুষ্টিতে নয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ

তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (সুরা দাহর : ৩০)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। (সুরা তাকবির : ২৯)

---

১. البَيَانُ فِي أَرْكَانِ الإِيمَانِ পৃ. ৩৮৫ দ্রষ্টব্য।

'কুফর ও গুনাহ তাঁর সৃষ্টি; তাঁর ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়, তবে তাঁর সন্তুষ্টিতে নয়।' এই বিষয়টি বোঝার জন্য পূর্বের ১৭-১৮ নং পৃষ্ঠার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

তিনি অমুখাপেক্ষী; সত্তা ও গুণাবলিতে তিনি কোনো জিনিসের মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

يَآَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ.

হে মানুষসকল! তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহই অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত। (সুরা ফাতির : ১৫)

অর্থাৎ তিনি সকল সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী। কারো আনুগত্য তাঁর কোনো উপকারে আসে না এবং কারো অবাধ্যতা তাঁর কোনো ক্ষতি করে না। তিনি ইরশাদ করেন, اَللّٰهُ الصَّمَدُ

আল্লাহ অমুখাপেক্ষী [আর সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী]। (সুরা ইখলাস : ২)

তাঁর ওপর কোনো বিচারক নেই। অন্য কারো চাপানো দ্বারা তাঁর ওপর কোনো কিছু আবশ্যক হয় না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ

আল্লাহ ফায়সালা দেন। তাঁর ফায়সালা রদকারী কেউ নেই। (সুরা রাদ : ৪১)

শাইখ আবদুর রহমান সাদি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১৩৭৬ হি.] বলেন, 'এই আয়াতে শরিয়তের সাথে সম্পৃক্ত হুকুম, তাকদির সংক্রান্ত হুকুম এবং প্রতিদান সংক্রান্ত হুকুম- সবই অন্তর্ভুক্ত।'[১]

---

১. تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرحمنِ فِي تفسيرِ كَلَامِ المَنَّانِ

আর 'তাঁর ফায়সালা রদকারী কেউ নেই' এর মর্ম হলো, তাঁর হুকুমকে প্রত্যাখ্যান কিংবা বাতিল করার অধিকার কারো নেই।[১]

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ.

তিনি যা করেন, সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। (সুরা আম্বিয়া : ২৩)

বিতরের নামাযে যে দুআয়ে কুনুত পাঠ করা হয়, তার একটি বর্ণনায় আছে, إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ

আপনি ফায়সালা করেন, আপনার ওপর ফায়সালা করা হয় না।[২]

অতএব, আল্লাহ তাআলা সকলের বিচারক। তিনি যা চান তা করেন এবং যা ইচ্ছা ফায়সালা দেন।

অবশ্য, তিনি কখনো ওয়াদা করে তা পূর্ণ করেন। যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- 'সে আল্লাহর দায়িত্বে'।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَعْدَ اللّٰهِ ۗ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ.

আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ তাঁর ওয়াদার বরখেলাপ করেন না। (সুরা রূম : ৬)

---

১. যে ভূমি আল্লাহ তাআলার বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে, তা দারুল হরব। আর যে ভূমি আল্লাহ তাআলার বিধানকে কবুল করে, তা দারুল ইসলাম। পাকিস্তান ও তার মতো গণতান্ত্রিক মুসলিম প্রধান দেশগুলো দারুল ইসলাম কি না, তা জানার জন্য ২৯৭-৩০১ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২. সুনানুত তিরমিযি : ৪৬৪, دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيَّةِ বৈরুত। এখানে দুআয়ে কুনুতের যে অংশ উল্লেখ করা হয়েছে, তা আমাদের মধ্যে প্রচলিত কুনুতে নেই। বস্তুত হাদিসে দুআয়ে কুনুত একাধিক ভাষায় বর্ণিত রয়েছে।

আরো ইরশাদ করেছেন,

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

তোমাদের প্রতিপালক দয়া করাকে নিজের দায়িত্বরূপে স্থির করে নিয়েছেন– তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অজ্ঞতাবশত কোনও মন্দ কাজ করে, তারপর তাওবা করে এবং [নিজেকে] সংশোধন করে, তবে তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সুরা আনআম : ৫৪)

আয়াতে বর্ণিত অজ্ঞতার ব্যাখ্যা

'অজ্ঞতাবশত' শব্দটির মর্ম হলো, পাপকাজটার পরিণাম সম্পর্কে এবং তা আল্লাহর ক্রোধ আবশ্যক করে তোলা সম্পর্কে অজ্ঞতা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সকল ভুলকারীই অজ্ঞ, যদিও কাজটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে তার জ্ঞান থেকে থাকে।

ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ [২০২-২৭৫ হি.] হজরত আবু উমামা বাহিলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে–

১. যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদে বের হলো, সে আল্লাহর দায়িত্বে। যদি সে মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন; আর [জীবিত থাকলে] সওয়াব ও গণিমতসহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন।

২. যে ব্যক্তি মসজিদে গমন করেছে, সে আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে। যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন; অন্যথায় সওয়াবসহ ফিরিয়ে আনবেন।

৩. যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করেছে। সে আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে।[১]

তাঁর সকল কাজেই হিকমত ও সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا.

আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এর মধ্যখানে যা-কিছু আছে, তা অনর্থক সৃষ্টি করিনি। যারা কুফর অবলম্বন করেছে, এটা [অর্থাৎ এমনি এমনিই সৃষ্টি করা] তাদের ধারণামাত্র। (সুরা সাদ : ২৭)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ.

আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাদের জন্য রিযিককে বিস্তার করে দিতেন, তাহলে পৃথিবীতে তারা বিদ্রোহ করত; বরং তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা, অবতীর্ণ করে থাকেন। (সুরা শুরা : ২৭)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রজ্ঞাবান। তিনি তাঁর প্রজ্ঞা ও মানুষের প্রয়োজন অনুসারে রিযিকের ব্যবস্থা করেন।

তাঁর ওপর বিশেষ আংশিক দয়া অথবা বিশেষ অধিক কল্যাণকর কাজ করা আবশ্যক নয়

বিশেষ আংশিক দয়ার ব্যাখ্যা

লেখক 'বিশেষ আংশিক দয়া' দ্বারা সম্ভবত ব্যক্তিবিশেষের প্রতি দয়া বুঝিয়েছেন। এমতাবস্থায় উক্তিটির মর্ম হবে, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি দয়া করা অথবা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যা অধিক কল্যাণকর, তা

---

১. সুনানু আবি দাউদ : ২৪৯৪, دَارُ الفِكْرِ বৈরুত।

করা আল্লাহ তাআলার জন্য আবশ্যক নয়। যেমন আমরা নিম্নবর্ণিত বনু কুরাইজার ঘটনায় লক্ষ্য করব, তাদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা দুনিয়া-আখেরাত কোনো জগতের বিবেচনায়ই, তাদের প্রতি দয়া বা তাদের জন্য অধিক কল্যাণকর ছিল না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ.

তিনি [আল্লাহ তাআলা] এ [উদাহরণ] দ্বারা বহু [মানুষ]কে পথভ্রষ্ট করেন এবং বহু [মানুষ]কে হেদায়েত দান করেন। তিনি গোমরাহ করেন কেবল তাদেরকেই, যারা নাফরমান। (সুরা বাকারা : ২৬)

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ.

আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। আর যে [তাঁর] অভিমুখী হয়, তিনি তাকে তাঁর দিকে পরিচালিত করেন। (সুরা রাদ : ২৭)[১]

বনু কুরাইজার হত্যাকাণ্ড

আল্লাহ তাআলার ওপর বিশেষ আংশিক দয়া আবশ্যক না হওয়ার ব্যাপারে আমরা এখানে নবিজির সিরাত থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। [আবদুল মালিক] ইবনে হিশাম রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ২১৩ হি.] তাঁর সিরাত গ্রন্থে 'বনু কুরাইজার হত্যাকাণ্ড' শিরোনামে লিখেছেন,

---

১. সামনে ২৬৪ পৃষ্ঠায় আগত 'তাকদির দ্বারা তাকদির প্রতিহত করা' শিরোনামের লেখাটি এখানেই দেখা যেতে পারে। তাহলে '[আল্লাহ তাআলা] বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেন' বা 'আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন' জাতীয় উক্তিগুলো দেখে পাঠকের মনে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে বাহ্যত যে আপত্তি উত্থাপিত হয়, তা অমূলক হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ইবনে ইসহাক বলেন, এরপর তারা [অর্থাৎ বনু কুরাইজা] চাইলো, নবিজি যেন তাদের ক্ষেত্রে নিজ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় বনু নাজ্জার গোত্রের এক নারী 'বিনতে হারিসে'র ঘরে তাদেরকে বন্দি করেন। তারপর নবিজি মদিনার বাজারে বেরিয়ে এলেন, যা আজও [মদিনার] বাজার। তিনি সেখানে কয়েকটি গর্ত খুঁড়লেন। তারপর তাদেরকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন। তখন তিনি তাদের গর্দান উড়িয়ে গর্তগুলোতে ফেলে দিলেন।

একের পর এক তাদেরকে বের করে আনা হচ্ছিল। আল্লাহর দুশমন হুয়াই বিন আখতাব এবং গোত্রপতি কাব বিন আসাদও তাদের মধ্যে ছিল। বন্দিদের মোট সংখ্যা ছিল ৬০০ কিংবা ৭০০। যারা তাদের সংখ্যা আরো বেশি মনে করেন, তাদের মতানুসারে ওদের সংখ্যা ছিল ৮০০ ও ৯০০-এর মাঝামাঝি। তাদেরকে যখন দলে দলে রাসুলের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তারা কাব বিন আসাদকে বলল, কাব! তুমি কী মনে করো? আমাদের সাথে কী করা হবে? কাব বলল, তোমরা কি কিছুই বুঝতে পারছ না? তোমরা কি দেখছ না, আহ্বানকারী অবিরাম ডেকেই যাচ্ছে! আর যাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সে আর ফিরছে না!? আল্লাহর শপথ! সকলকে হত্যা করা হবে। এভাবে সকলকে খতম করেই রাসুল ক্ষান্ত হলেন।[১]

---

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

বস্তুত আল্লাহর রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ; এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। (সুরা আহযাব : ২১)

এরপর আল্লাহর শত্রু হুয়াই বিন আখতাবকে নিয়ে আসা হলো। তখন সে একটি নকশাকার চাদর পরিহিত ছিল। সে চাদরটার সবদিকে কয়েক আঙুল করে ছিঁড়ে রেখেছিলো! যেন চাদরটা ছিনিয়ে না নেওয়া হয়! তার দুই হাত ঘাড়ের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধা ছিল। যখন সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখল, তখন বলে উঠল, তোমার সাথে দুশমনি করার কারণে আমি মোটেও অনুতপ্ত নই। কিন্তু যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে, সে নিজেই পরিত্যাক্ত হয়। এরপর সে মানুষের দিকে ফিরে বলল, হে লোকসকল! আল্লাহর আদেশে আমার কোনো আপত্তি নেই। আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের ওপর কিতাব, তাকদির ও যুদ্ধ নির্ধারণ করে রেখেছেন। এরপর সে বসল আর তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হলো।[১]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, জুমহুর উলামায়ে কেরামের মত হলো, আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে এমন কাজের আদেশ দেন, যাতে তাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং এমন কাজ থেকে বারণ করেন, যাতে রয়েছে তাদের অকল্যাণ। আদেশকৃত কাজটি বাস্তবায়নের মধ্যে কার্যসম্পাদনকারীর জন্য রয়েছে ভরপুর কল্যাণ। আর রাসুল প্রেরণের মধ্যেও রয়েছে ব্যাপক কল্যাণ, যদিও নিজ অপরাধের কারণে কতক মানুষের তাতে ক্ষতিও রয়েছে।[২]

---

১. সিরাতে ইবনে হিশাম ২ : ২৪০-২৪১, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৩৭৫ হিজরি, প্রকাশক : مَكْتَبَةُ وَمَطْبَعَةُ مُصْطَفَى البَابِيِّ الحَلَبِيِّ মিশর।

২. مِنْهَاجُ السُّنَّةِ খ. ১, পৃ. ৪৬২

তাঁর থেকে কোনো খারাপ কাজ প্রকাশ পায় না

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ.

তারা [কাফেররা] যখন কোন অশ্লীলতা করে, তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপ পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এর আদেশ করেছেন। [তাদেরকে] বলুন, আল্লাহ অশ্লীলতার আদেশ করেন না। (সুরা আরাফ : ২৮)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ.

তোমার যা-কিছু কল্যাণ লাভ হয়, তা আল্লাহর পক্ষ হতে; আর যা-কিছু অকল্যাণ ঘটে, তা তোমার নিজের পক্ষ থেকে। [অর্থাৎ নিজের অপরাধ ও গোনাহের কারণে।] (সুরা নিসা : ৭৯)

অর্থাৎ মন্দ কাজগুলো মানুষের হাতের কামাই; যদিও ভাল-মন্দ উভয় বিষয় আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা পূর্বের আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

তাদের [মুনাফিকদের] যদি কোনো কল্যাণ লাভ হয়, তাহলে বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে [illegible]র যদি মন্দ কিছু ঘটে, তাহলে বলে, এটা আপনার পক্ষ [illegible] বলুন, প্রতিটি আল্লাহর পক্ষ হতে। (সুরা নিসা : ৭৮)[১]

---

১. সামনে ২৭১ নং পৃষ্ঠায় 'সৃষ্টি ও অর্জন' সম্পর্কে আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি যা করেন কিংবা যে নির্দেশ দেন, সে কারণে তাঁকে জালেম ও অত্যাচারী বলা যায় না

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.

নিশ্চয় আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না। (সুরা নিসা : ৪০)

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

[ফসল ধ্বংস করে] আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি; বরং [কুফরি ও অপরাধ করে] তারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। (সুরা আলে ইমরান : ১১৭)

মাত্র গত হওয়া 'তাঁর থেকে কোনো খারাপ কাজ প্রকাশ পায় না' শিরোনামের কথাগুলো এখানেও প্রযোজ্য।

তিনি যা সৃষ্টি করেন ও যে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাতে হিকমতের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। এমন নয় যে, কোনো জিনিস দ্বারা তাঁর সত্তা ও গুণাবলি পূর্ণতা লাভ করে কিংবা তা দ্বারা তাঁর কোনো প্রয়োজন বা লক্ষ্য পূরণ হয়! কারণ এটা দুর্বলতা ও নিন্দনীয়।

৭০ নং পৃষ্ঠায় হিকমত সংক্রান্ত আলোচনায় আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীটি উল্লেখ করা হয়েছে,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا.

আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এর মধ্যখানে যা-কিছু আছে, তা অনর্থক সৃষ্টি করিনি। যারা কুফর অবলম্বন করেছে, এটা [অর্থাৎ এমনি এমনিই সৃষ্টি করা] তাদের ধারণামাত্র। (সুরা সাদ : ২৭)

আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে ব্যক্তির নিজের উপকার হয়। তা দ্বারা আল্লাহ তাআলার কোনো উপকার হয়

না। বস্তুত অন্য কারো দ্বারা কোনো প্রয়োজন পূরণ হওয়া থেকে তিনি ঊর্ধ্বে। কুরআন পাকে তিনি ইরশাদ করেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করো, যেন তোমাদের ওপর রহম করা হয়। (সুরা আলে ইমরান : ১৩২)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন,

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ.

যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে নিজেরই উপকারার্থে। আর যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হয়, [সে জেনে রাখুক] আমার প্রতিপালক [বান্দা ও তার কৃতজ্ঞতার] মুখাপেক্ষী নন; তিনি মহানুভব। (সুরা নামল : ৪০)

তিনি ছাড়া কোনো বিচারক নেই

লেখকের পরবর্তী উক্তি থেকে মনে হয়, এ বাক্যের উদ্দেশ্য হলো, কোনো জিনিস ভালো বা মন্দ হিসেবে বিবেচিত হয় আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুসারে, শুধু মানববিবেকের ফায়সালায় নয়।

অতএব কোনো বস্তু ভালো বা মন্দ হওয়া এবং কোনো কাজ সওয়াব বা শাস্তির কারণ হওয়ার ক্ষেত্রে বিবেকের কোনো দখল নেই। বরং বস্তু ভালো বা মন্দ বিবেচিত হয় আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত ও ফায়সালায় এবং বান্দার প্রতি তাঁর আদেশের ভিত্তিতে।

সেগুলোর মধ্যে কতক এমন, যার কারণ, কল্যাণ এবং সওয়াব ও শাস্তির উপযুক্ত হওয়ার বিষয়টি বিবেক বুঝতে পারে। আর কতক এমন, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসুলগণের সংবাদ প্রদান ছাড়া বিবেক বুঝতে পারে না।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। এ ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাক্তন মহাপরিচালক কারি মুহাম্মদ তাইয়িব কাসিমি রাহিমাহুল্লাহ [১৩১৫-১৪০৩ হি.]-এর একটি প্রবন্ধ রয়েছে। তার গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে–[১]

কারি তাইয়িব রাহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা

উদাহরণস্বরূপ বিবেক এটা বোঝে যে, ইলম ভালো। কিন্তু কোন ধরণের ইলম উপকারী এবং কোন ধরণের ইলম ক্ষতিকর, কোনটা কাঙ্ক্ষিত ইলম আর কোনটা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, কোন স্তর পর্যন্ত ইলম অর্জন করা বৈধ আর কোন স্তরে অবৈধ, কোনটা উদ্দিষ্ট মৌলিক ইলম আর কোনটা নিছক মাধ্যম, এ বিষয়গুলো কেবল শরিয়তের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব। অনুরূপ ইনসাফ, পবিত্রতা ইত্যাদি বিষয়গুলোর মূলনীতিও এর ওপর অনুমান করে বোঝা যায়। তবে এর সীমা নির্ধারণ করা এবং সে বিষয়ের কাজের সীমারেখা নির্দেশ করা; এর দ্বারা কোনটি উদ্দেশ্য, আর কোনটি উদ্দেশ্য নয়; এর কোন দিকটি উপকারী, এবং কোন দিকটি ক্ষতিকর; এর কোন্ কোন্ প্রভাব রয়েছে, যা দুনিয়া ও আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত, সবগুলোই এমন বিষয়, যা কেবল শরিয়ত কর্তৃক আবশ্যক করা ও বারণ করা এবং প্রশংসা করা ও নিন্দা করার মাধ্যমেই জানা যায়।

---

১. বিস্তারিত জানতে দেখুন عُلَمَاءُ دِيُوْبَنْد : اِتِّجَاهُهُمُ الدِّيْنِيُّ وَمِزَاجُهُمُ الْمَذْهَبِيُّ পৃ. ২৫৪-২৬৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪৩৩ হিজরি/২০১২ ইসায়ি, প্রকাশক : জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত; এবং العَقِيْدَةُ الصَّفِيَّةُ عَلَى العَقِيْدَةِ الحَسَنَةِ পৃ. ১৯৮-২০৮, প্রথম মুদ্রণ ১৪৪৩ হিজরি/২০২১ ইসায়ি, প্রকাশক : ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

আল্লাহ তাআলার প্রতিটি গুণ সত্তাগতভাবে এক; সম্পৃক্ততা ও নতুনত্বের বিচারে অনেক। উল্লিখিত ব্যাখ্যা অনুসারে নতুনত্ব মূলত যার সঙ্গে গুণটি যুক্ত হয়, তাতে।

আল্লাহ তাআলার কোনো গুণ [যেমন : শ্রবণ] সত্তাগতভাবে একাধিক নয়। কারণ একাধিক হওয়া নশ্বর হওয়ার লক্ষণ। আর আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলি অবিনশ্বর। তবে নতুনভাবে প্রকাশিত হওয়া ও সম্পৃক্ত হওয়ার, [যেমন : শ্রুত জিনিসসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার] প্রতি লক্ষ্য করলে মনে হয়, তাঁর প্রতিটি গুণ বহুসংখ্যক।

যার সাথে গুণগুলো যুক্ত হয়, তা নশ্বর হওয়ার কারণে গুণগুলো নশ্বর হওয়া আবশ্যক হয় না। যেমন : 'মাখলুক' নশ্বর, কিন্তু আল্লাহর 'আল-খালকু' [সৃষ্টি করা] গুণটি অবিনশ্বর। 'মারজুক' [যাকে রিজিক দেওয়া হয়] নশ্বর, কিন্তু তাঁর 'আর-রাজ্‌কু' [রিজিক দান করা] গুণটি অবিনশ্বর। অনুরূপ 'মাসমু' [যা শোনা যায়] এবং 'মুবসার' [যা দেখা যায়] নশ্বর, কিন্তু তাঁর 'আস-সামউ' [শ্রবণ করা] এবং 'আল-বাসারু' [দেখা] গুণ অবিনশ্বর।

মুতাজিলাদের আপত্তির উত্তর

উপরের উক্তি দ্বারা দেহলবি রাহিমাহুল্লাহর উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলার গুণাবলি অবিনশ্বর হওয়ার ব্যাপারে মুতাজিলাদের আপত্তির জবাব দেওয়া। তাদের আপত্তি হলো, আল্লাহ তাআলার গুণসমূহ উদাহরণস্বরূপ 'আস-সামউ' [শোনা] গুণটি একাধিক এবং বারবার নতুনভাবে অস্তিত্বলাভ করে। আর তা এভাবে যে, আল্লাহ তাআলা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল মাখলুকের কথা শোনেন। আর কোনো জিনিস একাধিক হওয়া এবং বারবার নতুন করে সংঘটিত হওয়াটা নশ্বর হওয়ার প্রমাণ। তা হলে আল্লাহ তাআলার গুণাবলি অবিনশ্বর হয় কী করে?

লেখক জবাব দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলার কর্মগত কোনো গুণ সম্পৃক্ত হওয়া ও নতুনভাবে প্রকাশিত হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করলে একাধিক মনে হয়। কিন্তু আপন স্থানে তা একাধিক নয়; বরং তা সত্তাগতভাবে একটিই। আপন স্থানে বলতে উদ্দেশ্য হলো, গুণটি কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত না হওয়া। যেমনটি ইমাম আবু জাফর তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ [২৩৮-৩২১ হি.] 'আল আকিদাতুত তাহাবিয়্যাহ'-তে বলেছেন,

ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহর বিবরণ

মাখলুক সৃষ্টির পর তিনি 'খালেক' [সৃষ্টিকর্তা] নামে ভূষিত হননি এবং সৃষ্টিজগত বানানোর পর তিনি 'বারি' [স্রষ্টা] নামটি গ্রহণ করেননি [বরং এসব সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তিনি খালেক, বারি]। তাঁর মধ্যে 'রুবুবিয়্যাত' [পালনকর্তা হওয়া] গুণটি রয়েছে, যখন কোনো 'মারবুব' [যাকে প্রতিপালন করা হয়] ছিল না। তাঁর মধ্যে খালিকিয়্যাত [সৃষ্টিকর্তা হওয়া] গুণটি রয়েছে, যখন কোনো 'মাখলুক' ছিল না। মৃতকে জীবন দান করার পর যেমন তিনি 'মুহয়ি' [জীবনদানকারী], তদ্রূপ কোনো মৃতকে জীবন দান করার পূর্বেও তিনি 'মুহয়ি' গুণে গুণান্বিত ছিলেন। অনুরূপ কোনো মাখলুক সৃষ্টির পূর্বেও তিনি 'খালেক' গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

এ উক্তির পূর্বে তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, কোনো কিছু সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তিনি আপন গুণাবলিসহ 'কাদিম' [অবিনশ্বর]। সৃষ্টির ফলে তাঁর গুণাবলিতে এমন কিছু বৃদ্ধি পায়নি যা সৃষ্টির পূর্বে ছিলো না। তিনি আপন গুণাবলিসহ যেমন অনাদি, তেমনি অনন্তও।

আল্লামা বাবিরতির ব্যাখ্যা

'আল আকিদাতুত তাহাবিয়্যাহ' কিতাবের ব্যাখ্যাকার আল্লামা আকমালুদ্দিন বাবিরতি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ইমাম তাহাবি

রাহিমাহুল্লাহর এ কথার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা অনাদি-অনন্তকাল ধরেই সর্বোচ্চ সুন্দর নামসমূহ এবং সুউচ্চ গুণাবলি দ্বারা গুণান্বিত। চাই সে গুণাবলি সত্তাগত হোক, যেমন : হায়াত [জীবন], কুদরত [ক্ষমতা], ইলম [জ্ঞান], ইরাদাহ ও মাশিআহ [ইচ্ছা], সামৃউ [শ্রবণ করা] এবং বাসার [দেখা]। অথবা সে গুণাবলি কর্মগত হোক, যেমন : তাখলিক ও তাকওয়িন [সৃষ্টি করা], ইহইয়া [জীবন দান করা] এবং ইমাতাহ [মৃত্যু দান করা]। এ সবই তাঁর এমন গুণাবলি, যা তাঁর সত্তার সঙ্গে যুক্ত এবং বিলুপ্তি থেকে মুক্ত।[১]

আল্লাহ তাআলার সত্তাগত গুণাবলি তথা 'সিফাতুল মাআনি' বিষয়ে ১৪ নং পৃষ্ঠায় কিছু আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলিতে ইলহাদ [বিকৃতি] জায়েয নেই, তাই শরিয়তে বর্ণিত শব্দাবলি ব্যবহারের ওপর ক্ষান্ত থাকতে হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

সর্বোত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তাঁকে সেসব নামে ডাকো। যারা তাঁর নামসমূহের ক্ষেত্রে বক্রতা অবলম্বন করে, তাদেরকে বর্জন করো। অচিরেই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে। (সুরা আরাফ : ১৮০)

ইমাম রাগেব আসফাহানির ব্যাখ্যা

ইমাম রাগেব [হুসাইন বিন মুহাম্মাদ] আসফাহানি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৫০২ হি.] বলেছেন, আল্লাহ তাআলার নামের মধ্যে বিকৃতি দু-ভাবে হয়-

---

১. شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ পৃ. ৪২ প্রকাশক : دَارُ الْبَيْرُوْتِيِّ দামেশক।

১. তাঁর এমন বিবরণ দেওয়া, যা তাঁর উপযুক্ত নয়।
২. তাঁর গুণগুলোর এমন ব্যাখ্যা করা, যা তাঁর মর্যাদা পরিপন্থি[১]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই[২], তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তর, প্রতিটি অঙ্গ সম্পর্কে [কিয়ামতের দিন] জিজ্ঞেস করা হবে। (সুরা বনি ইসরাইল : ৩৬)

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহর সতর্কবার্তা

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ [১৬৪-২৪১ হি.] বলেছেন, আল্লাহ তাআলার গুণগুলো সেভাবেই বর্ণনা করতে হবে, যেভাবে তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন, অথবা তাঁর রাসুল বর্ণনা করেছেন। কুরআন এবং হাদিসকে অতিক্রম করা যাবে না।

কোনো বস্তু সম্পর্কে জানার উপায়

কতক আলেম বলেছেন, কোনো বস্তুর বিবরণ পেশ করতে হলে আগে তার সম্পর্কে জানতে হয়। জানার পদ্ধতি তিনটি–

১. সরাসরি বস্তুটি দেখা।
২. তার অনুরূপ কিছু দেখা।
৩. যিনি তার সম্পর্কে জানেন তার থেকে বিবরণ শোনা।

---

১. الْمُفْرَدَاتُ فِي غَرِيْبِ القرآنِ, রাগিব আসফাহানি, পৃষ্ঠা : ৭৩৭, প্রকাশক : دَارُ الْقَلَمِ – دَارُ الشَّامِيَّةِ দিমাশক-বৈরুত, প্রথম প্রকাশ : ১৪১২ হি.।

২. অর্থাৎ অস্তিত্বের জগতে কোনো জ্ঞান না থাকার কারণে জ্ঞান নেই। এমন নয় যে, বাস্তবে জ্ঞান ও যৌক্তিকতা আছে, কিন্তু এই ব্যক্তির উক্ত জ্ঞান ও যৌক্তিকতা অর্জন নেই।

আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর নাম ও গুণসমূহ জানার মাধ্যম শুধু তৃতীয়টি। তাঁর সম্পর্কে যিনি জানেন তার থেকে বিবরণ শুনে জানতে হবে। আর আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন স্বয়ং তিনি নিজে, তারপর তাঁর রাসুলগণ, যাদের প্রতি তিনি ওহি প্রেরণ করেছেন। তাই আল্লাহ তাআলার নামসমূহ ও গুণাবলি জানতে ওহির ওপর নির্ভর করা আবশ্যক। কেননা, আমরা দুনিয়াতে তাঁকে দেখিনি, যার ভিত্তিতে তাঁর বর্ণনা দেব; সৃষ্টিজগতে তাঁর অনুরূপ কিছু নেই, যার ওপর নির্ভর করে আমরা তাঁর বিবরণ দেব! আমাদের প্রতিপালক এ থেকে উর্ধ্বে এবং পবিত্র।[১]

মানব জীবনে আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনার প্রভাব

১. আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনার মাধ্যমে বান্দা দুনিয়া-আখেরাতে চির সৌভাগ্য অর্জন করে। বরং উভয় জগতে বান্দার সৌভাগ্য লাভ করা নির্ভর করে আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনার ওপর। বস্তুত আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত এবং নাম ও সিফাতের প্রতি ইমান অনুপাতে বান্দার সৌভাগ্য অর্জন হয়।

২. আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলির প্রতি ইমান আনয়ন করা, আল্লাহকে ভয় করা, তাকওয়া অর্জন করা এবং তাঁর আনুগত্য বাস্তবায়নের অন্যতম উপায়। মূলত বান্দা নিজ প্রতিপালক সম্পর্কে যত জানবে, তাঁর তত নিকটবর্তী হবে, তাঁকে তত বেশি ভয় করবে এবং তাঁর ইবাদতে তত বেশি মনোনিবেশ করবে। সর্বোপরি তাঁর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিজেকে তত অধিক দূরে রাখবে।

---

১. أُصُوْلُ الإيمانِ في ضَوْءِ الكتابِ والسُّنَّةِ পৃ. ৯২-৯৩। প্রকাশক : مُجَمَّعُ المَلِكِ فَهْد لِطِبَاعَةِ المُصْحَفِ الشَّرِيْفِ মদিনা মুনাওয়ারা, ১৪২১ হি.।

৩. আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনার মাধ্যমে বান্দা লাভ করে আত্মিক প্রশান্তি ও মনের তৃপ্তি। একইসঙ্গে অর্জন করে দুনিয়া-আখেরাতের হেদায়েত ও নিরাপত্তা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

যারা ইমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়। (সুরা রাদ : ২৮)

৪. আখেরাতের সওয়াব লাভ করা নির্ভর করে আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনয়ন এবং এর বিশুদ্ধতার ওপর। আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনয়ন এবং এর অপরিহার্য দাবিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে, বান্দা পরকালের মহা পুরস্কার লাভে ধন্য হয়। সে এমন জান্নাতে প্রবেশ করবে, যার প্রশস্থতা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতুল্য। তাতে রয়েছে এমন সব নায-নিয়ামত, যেগুলো দুনিয়ায় না কোনো চোখ প্রত্যক্ষ করেছে, না কোনো কান শ্রবণ করেছে, আর না তা কোনো মানব-অন্তর কল্পনা করেছে। এর মাধ্যমে বান্দা জাহান্নাম ও তার কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করবে। এ সব কিছুর চেয়েও বড় হলো, বান্দা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে, যার পর তিনি আর কখনো তার ওপর নারাজ হবেন না। তাছাড়া কিয়ামতের দিন বান্দা আল্লাহর দর্শন লাভের স্বাদ উপভোগ করবে।

৫. আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমানই আমলকে বিশুদ্ধ করে এবং তাকে গ্রহণযোগ্য বানায়। ইমান ছাড়া আমল গ্রহণযোগ্য হয় না। বরং তা আমলকারীর প্রতি ছুঁড়ে মারা হয়, তা যত বেশিই হোক এবং যত ধরনেরই হোক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ.

যেকেউ ইমান প্রত্যাখ্যান করবে, তার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা মায়িদা : ৫)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا.

যে ব্যক্তি মুমিন হয়ে আখেরাত কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, ওদের চেষ্টা পুরষ্কারযোগ্য। (সুরা বনি ইসরাইল : ১৯)

৬. আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশুদ্ধ ইমান ব্যক্তিকে হক আঁকড়ে ধরতে এবং সঠিকভাবে হক জানতে ও অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাকে কল্যাণকর উপদেশমালা এবং কার্যকর শিক্ষা গ্রহণের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুত করে। স্বভাবকে বিশুদ্ধ করে, নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে. কল্যাণের প্রতি আগ্রহী বানায়, মন্দ ও হারাম বর্জন করতে প্রেরণা যোগায়, এবং উত্তম চরিত্র, প্রশংসনীয় গুণাবলি ও উপকারী শিষ্টাচারে গুণান্বিত করে।

৭. জীবনে যত রকম অবস্থা ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যেমন আনুগত্য-অবাধ্যতা, ভয়-নিরাপত্তা, সুখ-দুঃখ, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি ইমানই হয় মুমিনের একমাত্র আশ্রয়স্থল।

আনন্দ-খুশির মুহূর্তে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ইমানের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে এবং নেয়ামতসমূহ রবের পছন্দনীয় কাজে ব্যবহার করে।

কষ্ট-ক্লেশ ও দুঃখ-দুর্দশার সময়ও ইমানের দ্বারস্থ হয়। ইমানের সওয়াব ও পুরষ্কারের সান্ত্বনা গ্রহণ করে।

ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তার সময় ইমানের শরণাপন্ন হয়। ফলে তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। ইমান বৃদ্ধি পায় এবং রবের প্রতি আস্থা বেড়ে যায়।

আনুগত্য ও নেকআমলের তাওফিকপ্রাপ্তির সময়ও আল্লাহর প্রতি ইমানের আশ্রয় গ্রহণ করে। রবের নেয়ামতরাজির স্বীকৃতি দেয়। এর ওপর অটল-অবিচল থাকতে রবের সাহায্য কামনা করে। কবুলিয়তের জন্য তাঁর তাওফিক প্রার্থনা করে।

কোনো পাপ কাজে নিপতিত হয়ে গেলেও রবের প্রতি ইমানের আশ্রয় গ্রহণ করে। পাপ থেকে দ্রুত তাওবা করে। অবাধ্যতার অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। এভাবে সর্বাবস্থায় ও সকল পরিস্থিতিতে মুমিন বান্দার একমাত্র আশ্রয় হয় আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান।

৮. আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলির জ্ঞান অন্তরে তাঁর মুহব্বত ও ভালোবাসা পয়দা করে। কারণ, তাঁর নাম ও গুণাবলি সর্ব দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ। আর মানবাত্মা সৃষ্টিগতভাবে পূর্ণাঙ্গতা ও উন্নত গুণাবলিকে ভালোবাসে। এ কারণে অন্তরে যখন আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনিতেই আমলের প্রতি সক্রিয় হয় এবং সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়, যার জন্য মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে। (সুরা যারিয়াত : ৫৬)

৯. আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলির জ্ঞান মুমিন হৃদয়ে গোটা সৃষ্টিজগত পরিচালনায় তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতার দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি করে। যার ফলে উভয় জগতের কল্যাণ লাভের জন্য আল্লাহ তাআলার ওপর উপযোগী তাওয়াক্কুল ও নির্ভরশীলতা প্রকাশ পায়। এতেই রয়েছে বান্দার কল্যাণ ও সফলতা। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভর করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

১০. আল্লাহ তাআলার উত্তম নামসমূহ আয়ত্ত করা এবং সেগুলোর জ্ঞান অর্জন করা যাবতীয় জ্ঞান লাভের মুল ভিত্তি। কারণ, অন্য সকল জ্ঞান হয়ত আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি অথবা তাঁর আদেশ। অন্য ভাষায়, সেগুলো জগত সংশ্লিষ্ট অথবা শরিয়ত সংশ্লিষ্ট। আর আল্লাহ তাআলার উত্তম নামসমূহ উভয় জ্ঞানেরই উৎস। উভয় প্রকার জ্ঞানই তাঁর নামসমূহের দাবি। তাই যে ব্যক্তি মাখলুকের উপযোগী স্তরে আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহ আয়ত্ত করল, সে যেন সমস্ত জ্ঞান ধারণ করল।[১]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৬ দ্রষ্টব্য।

ফেরেশতাদের প্রতি ইমান

আল্লাহ তাআলার অনেক ফেরেশতা রয়েছেন

আল্লাহ তাআলার একটি মাখলুক হলেন ফেরেশতা। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে নুর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের ওপর ইমান আনয়ন করা ইমানের ৬টি রোকনের একটি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ.

রাসুল সেই বিষয়ের প্রতি ইমান এনেছেন, যা তাঁর ওপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিল করা হয়েছে এবং [তাঁর সাথে] মুমিনগণও। প্রত্যেকে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি ইমান এনেছে। (সুরা বাকারা : ২৮৫)

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا.

যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণকে ও পরকাল দিবসকে অস্বীকার করবে, সে সুদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হবে। (সুরা নিসা : ১৩৬)

তাঁরা উর্ধ্বে বসবাস করেন

অর্থাৎ তাঁদের বাসস্থান আকাশে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ.

তিনি নিজ নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা, ওহিসহ ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করেন। (সুরা নাহল : ২)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন,

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ.

[হে নবি!] আপনি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবেন, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবিহ পাঠ করছে। (সুরা যুমার : ৭৫)

আয়াতদুটি প্রমাণ করে, ফেরেশতারা আসমানের অধিবাসী। সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ তাআলার আদেশসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য তাঁদেরকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। বান্দার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় তাঁরা আঞ্জাম দিয়ে থাকেন।

তাঁরা আল্লাহর সান্নিধ্যভাজন

ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্যভাজন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ.

মাসিহ [ইসা আলাইহিস সালাম] কখনও আল্লাহর বান্দা হওয়াতে লজ্জাবোধ করেন না এবং নৈকট্যভাজন ফেরেশতাগণও না। (সুরা নিসা : ১৭২)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.

তারা [মুশরিকরা] বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র; বরং [তাঁরা অর্থাৎ ফেরেশতাগণ] সম্মানিত বান্দা। (সুরা আম্বিয়া : ২৬)

কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করার কাজে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. كِرَامًا كَاتِبِينَ. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ.

তোমাদের ওপর [নিযুক্ত] রয়েছে কতক রক্ষণাবেক্ষণকারী, সম্মানিত, লেখক। তোমরা যা কর, তা তারা জানেন। (সুরা ইনফিতার : ১০-১২)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন,

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.

যখন [আমল] গ্রহণকারী [ফেরেশতাদ্বয় আমল] গ্রহণ করেন। একজন উপবিষ্ট [থাকেন] ডানে [এবং একজন] বামে। সে [অর্থাৎ মানুষ] যে কথাই উচ্চারণ করে, তার নিকট থাকে একজন প্রস্তুত পর্যবেক্ষক। (সুরা কাফ : ১৭-১৮)

অর্থাৎ মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য দুজন ফেরেশতা সর্বদা নিয়োজিত থাকেন। একজন ডানদিকে, অপরজন বামদিকে। মানুষ যে কথাই বলুক, যে কাজই করুক, প্রহরী ফেরেশতা তা লিখে নেন। রাতে-দিনে, আবাসে-প্রবাসে সর্বদাই ফেরেশতা মানুষকে ছায়ার মত অনুসরণ করেন।

কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত মানুষকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার কাজে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ.

তার সামনে ও পেছনে রয়েছে পালাক্রমে আগমনকারী কয়েকজন প্রহরী [ফেরেশতা]। আল্লাহর নির্দেশে তারা তাকে হেফাজত করে। (সুরা রাদ : ১১)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ.

এমন কোন জীব নেই, যার জন্য কোনো হেফাজতকারী [ফেরেশতা] নেই। (সুরা তারিক : ৪)

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের জন্যই আল্লাহ হেফাজতকারী ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন, যারা মানুষের কর্মসমূহ লিখে রাখেন এবং তাদেরকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন।

কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত কল্যাণের প্রতি আহ্বানের কাজে। তাঁরা মানুষের ওপর কল্যাণের পরশ বুলিয়ে থাকেন।

'কল্যাণের পরশ' মানে হলো, তাঁরা মানুষের হৃদয়ে কল্যাণমূলক ভাবনা প্রবেশ করান।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.

যারা বলেছে, আমাদের রব আল্লাহ! তারপর অবিচল থেকেছে, [মৃত্যুর সময়] তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে [তারা বলবে], তোমরা [ভবিষ্যতের ব্যাপারে] ভয় করো না এবং [অতীতের ব্যাপারে] চিন্তা করো না, আর সুসংবাদ গ্রহণ করো সেই জান্নাতের, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হত। আমরা পার্থিব জীবনেও তোমাদের সাথি ছিলাম এবং আখেরাতেও থাকব। (সুরা ফুসসিলাত/হা-মিম সাজদাহ : ৩০-৩১)

অতএব ফেরেশতারা দুনিয়া ও আখিরাতে মুমিনদের রক্ষাকারী এবং সাহায্যকারী। যেসকল বিষয় তাঁদের জন্য উভয় জগতে কল্যাণকর, তাঁরা তাদের সেদিকে পথনির্দেশ করেন। যেমন- মৃত্যুর সময় অবতরণ করে মুমিনের হৃদয়কে ইমানের ওপর সুদৃঢ় করেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন, وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ.

এবং তিনি [আল্লাহ] আপন রুহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। (সুরা মুজাদালাহ : ২২)

এক বর্ণনামতে এখানে রুহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম। যেমনটি তাফসিরে 'রুহুল মাআনি'তে রয়েছে।

ফেরেশতার স্পর্শ ও শয়তানের স্পর্শ

ইমাম তিরমিযি [২০৯-২৭৯ হি.] ও ইবনে হিব্বান রাহিমাহুমাল্লাহ [২৭০-৩৫৪ হি.] সাহাবি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আদম সন্তানের প্রতি শয়তানের এক স্পর্শ রয়েছে এবং ফেরেশতারও এক স্পর্শ রয়েছে। শয়তানের স্পর্শ হচ্ছে মন্দ কাজের প্ররোচনাদান ও সত্যকে অস্বীকার করা। ফেরেশতার স্পর্শ হচ্ছে কল্যাণকর কাজে উৎসাহ প্রদান এবং সত্যকে সত্যায়ন করা। কাজেই যে ব্যক্তির মধ্যে এরূপ অনুভূত হবে, সে যেন বুঝে নেয়, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এবং এজন্য যেন সে আল্লাহ তাআলার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। আর যে ব্যক্তির মধ্যে এর বিপরীত অনুভূত হবে, সে যেন তখন বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন,

الشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ.

শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। (সুরা বাকারা : ২৬৮)

তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদিসটি হাসান গারিব।[১]

তাঁদের প্রত্যেকেরই রয়েছে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের ভাষায় ইরশাদ করেছেন,

وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ.

আর [ফেরেশতাগণ বলেন,] আমাদের প্রত্যেকেরই আছে এক নির্দিষ্ট স্থান। (সুরা সাফফাত : ১৬৪)

---

১. সুনানে তিরমিযি, ২৯৮৮, সহিহ ইবনে হিব্বান, ৯৯৭

অর্থাৎ প্রত্যেক ফেরেশতারই সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও স্তর রয়েছে। কেউ তা অতিক্রম করেন না। তাঁদের কেউ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসুলদের নিকট ওহি পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত। কেউ বৃষ্টি বর্ষণের কাজে, কেউ শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার কাজে, কেউ রুহ কবজের কাজে, কেউ পাহাড়ের দায়িত্বে, কেউ মাতৃগর্ভের দায়িত্বে, কেউ আরশ বহনের দায়িত্বে, কেউ জান্নাতের প্রহরী হিসেবে, কেউ জাহান্নামের প্রহরী হিসেবে, –আল্লাহ তাআলা আমাদের জাহান্নাম থেকে নাজাত দান করুন– কেউ বাইতুল মামুরের তাওয়াফে, কেউ যিকিরের মজলিসের তালাশে, কেউ সম্মানিত লেখকের দায়িত্বে এবং কেউ কবরের পরীক্ষা ও কবরের প্রশ্নোত্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।[১]

তাঁরা আল্লাহ তাআলার কোনো আদেশের অবাধ্যতা করেন না; তা-ই করেন যা তাঁদের আদেশ করা হয়

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

তাতে [জাহান্নামে] নিয়োজিত আছেন কঠোর স্বভাবের, নির্মম হৃদয়ের অনেক ফেরেশতা। তারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়। (সুরা তাহরিম : ৬)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ.

---

১. أُصُوْلُ الإِيمانِ فِي ضَوْءِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ পৃ. ১১৩-১১৮। ফেরেশতাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহিমাহুল্লাহ রচিত الحَبَائِكُ فِي أَخْبَارِ المَلَائِكِ এবং আল্লামা আবদুল্লাহ সিরাজুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ রচিত الإِيمانُ بِالمَلَائِكَةِ কিতাবদুটি দ্রষ্টব্য।

তারা [ফেরেশতারা] তাঁর [আল্লাহর] আগে বেড়ে [নিজেদের পক্ষ থেকে] কথা বলেন না এবং তারা তাঁর আদেশ অনুযায়ীই কাজ করেন। (সুরা আম্বিয়া : ২৭)

ফেরেশতাদের প্রতি ইমান আনয়নের কিছু ফলাফল

ফেরেশতাদের প্রতি ইমান আনয়নের রয়েছে মুমিন জীবনে অনেক প্রভাব। নিম্নে কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হলো।

১. ফেরেশতাদের প্রতি ইমানের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য, এবং তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়।

২. বান্দাদের প্রতি রবের অনুগ্রহ ও অনুকম্পার অনুভূতি জাগ্রত হয়। কারণ, রব তাদের দুনিয়া-আখেরাতের নানান কল্যাণকর কাজে ফেরেশতাদের নিয়োজিত রেখেছেন। যেমন বান্দাদের নিরাপত্তা দান, আমলনামা লিপিবদ্ধ করা প্রভৃতি।

৩. অন্তরে ফেরেশতাদের প্রতি মুহব্বত ও ভালোবাসা জন্ম নেয়। কারণ, তাঁরা পুর্ণাঙ্গরূপে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার ব্যবস্থা করেন, মুমিনদের সাহায্য করেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[১]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

শয়তান প্রসঙ্গ

আল্লাহ তাআলার একটি সৃষ্টি হলো শয়তান

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا.

এভাবেই আমি [পূর্ববর্তী] প্রত্যেক নবির জন্য শত্রু সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ মানব ও জিনদের মধ্য হতে শয়তানদেরকে, যারা ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একে অন্যের নিকট [সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত] চমৎকার কথা প্রেরণ করে। (সুরা আনআম : ১১২)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

যারা ইমান আনে না, আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি। (সুরা আরাফ : ২৭)

যেসকল জিন অথবা মানুষ আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাদেরকেই শয়তান বলা হয়।

মানুষের ওপর তার মন্দ স্পর্শ রয়েছে

শয়তানের স্পর্শ হচ্ছে মন্দ কাজের প্ররোচনাদান ও সত্যকে অস্বীকার করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ.

শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ করে। (সুরা বাকারা : ২৬৮)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ

বলুন, হে আমার রব! আমি শয়তানদের প্ররোচনা হতে আপনার আশ্রয় চাই। (সুরা মুমিনুন : ৯৭)

কুরআন পাকের প্রতি ইমান

কুরআন আল্লাহর কালাম

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ

মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম [কুরআন] শুনতে পারে। তারপর তাকে পৌঁছে দাও তার নিরাপদ স্থানে। (সুরা তাওবা : ৬)

আয়াতটিতে মুসলমানদের আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিলকৃত কুরআন মুশরিকদের শোনায়। প্রকৃত অর্থেই এটি আল্লাহর কালাম; রূপকার্থে নয়।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

كِتَابٌ اُحْكِمَتْ آيَاتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ.

এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহকে [ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত রেখে দলিল-প্রমাণ দ্বারা] সুদৃঢ় করা হয়েছে। অতঃপর প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে [আদেশ-নিষেধ এবং হালাল-হারাম] বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (সুরা হুদ : ১)

আল্লাহ তাআলা এটি আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহিরূপে নাযিল করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ.

আমার প্রতি ওহিরূপে এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করি এবং [কেয়ামত পর্যন্ত আরব-

অনারব] যাদের নিকট [এ কুরআন] পৌঁছাবে তাদেরকেও। (সুরা আনআম : ১৯)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

[হে নবি!] আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের সামনে সেই সব [অস্পষ্ট] বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা করে। (সুরা নাহল : ৪৪)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ.

কোনো মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন, ওহির মাধ্যম ব্যতীত, অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে, অথবা তিনি কোনো দূত পাঠাবেন, অতঃপর তিনি যা চান, সে তাঁর অনুমতিক্রমে তা প্রেরণ করে। (সুরা শুরা : ৫১) এটাই ওহির প্রকৃত মর্ম।

আয়াতটির মর্ম হলো, কোনো মানুষের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কথা বলার মাধ্যম তিনটি–

১. ইলহামের[১] মাধ্যমে কিংবা স্বপ্নে ওহির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার সঙ্গে কথা বলবেন।

২. পর্দার আড়ালে থেকে। যেভাবে তিনি মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছেন।

৩. আল্লাহ তাআলা তার নিকট ফেরেশতা পাঠাবেন, যিনি তার নিকট ওহি নিয়ে আসবেন! যেমন আল্লাহ তাআলা সাধারণত জিবরাইল আলাইহিস সালামকে রাসুলদের নিকট ওহি দিয়ে প্রেরণ করতেন।

---

১. ইলহাম : মনে কোনো চেতনা জাগ্রত করা।

আখেরাতের প্রতি ইমান

মানুষের দেহসমূহ সমবেত করে দৈহিক পুনরুত্থানের বিষয়টি সত্য ও প্রমাণিত। তখন তাতে রুহসমূহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মানুষকে ওই সকল দেহই দেওয়া হবে যা দুনিয়াতে ছিলো;

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ.

সে আমার সম্পর্কে উপমা রচনা করেছে, অথচ নিজ সৃষ্টির কথা ভুলে বসে আছে। সে বলেছে, কে এই অস্থিগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন এগুলো পচে-গলে যাবে? বলে দিন, সেগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি সেগুলোকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। (সুরা ইয়াসিন : ৭৮-৭৯)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ.

তিনি প্রাণহীন থেকে প্রাণবানকে বের করে আনেন এবং প্রাণবান থেকে প্রাণহীনকে বের করে আনেন। তিনি ভূমিকে তার মৃত্যুর পর [অনুর্বর থাকার পর] সঞ্জীবিত করেন। আর এভাবেই তোমাদেরকে [কবর থেকে] বের করা হবে। (সুরা রুম : ১৯)

পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানের নমুনা

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতে শস্যকণা থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন এবং উদ্ভিদ থেকে শস্যকণা, বীজ থেকে গাছ এবং গাছ

থেকে বীজ, মানুষ থেকে বীর্য এবং বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করেন। এই অসাধারণ অলৌকিক বিষয়সমূহ মানুষ প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে দেখে থাকে। কিন্তু বারবার দেখার কারণে এবং এগুলোর কাছাকাছি থাকার কারণে মানুষ এ থেকে উদাসীন।

ডিম ফেটে পাখি কিংবা মুরগির জন্ম হয়, সেই মুরগি আবার ডিম দেয়। বীজ ফেটে বের হয় খেজুর গাছ, তাতে খেজুর ফলে, সেই খেজুর থেকে আবার বীজ বেরিয়ে আসে! পুরুষ স্ত্রীর গর্ভে বীর্য রাখে, সেখান থেকে কী চমৎকার মানুষের জন্ম হয়, যে শোনে ও দেখে! যারা চিন্তাশক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে ভাবে, তাদের জন্য এগুলো অবিরাম আশ্চর্য এক চক্র। এগুলোই পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানের নমুনা।

এই কারণেই আয়াতটি সমাপ্ত করা হয়েছে وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ [আর এভাবেই তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে] বলে। অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ তাআলা শুষ্ক ও অনুর্বর ভূমিকে বৃষ্টি দিয়ে সজীব করেন, তারপর তা থেকে উৎপন্ন করেন ফল-ফলাদি ও বিভিন্ন উদ্ভিদ। সেভাবেই তিনি পুনরুত্থানের জন্য মানুষকে কবর থেকে বের করবেন। আল্লাহ তাআলার কী বিরাট কুদরত এ সৃষ্টিজগৎ! মানুষ, প্রাণহীন এক ফোঁটা তুচ্ছ বীর্য মাত্র! অথচ এর থেকেই সৃষ্টি হয় জীবন্ত, সবাক, দৃষ্টিসম্পন্ন এবং শ্রবণশক্তিবিশিষ্ট মানুষ। একই কথা প্রতিটি উদ্ভিদ, শস্য, গাছ, ফল, গবাদিপশু ও চতুষ্পদ প্রাণীর ক্ষেত্রে। এমন অসাধারণ অলৌকিক ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন; বরং প্রতিটি মুহূর্তেই। অতএব, যিনি এই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, মৃত্যুর পর তিনিই আবার জীবন দান করবেন।[১]

---

১. التفسيرُ الواضِحُ المُيَسَّرُ

যদিও কারো দেহ বৃহদাকারের হবে, আর কারো হবে স্বাভাবিক গড়নের। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, কাফেরের মাড়ির দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মতো! জান্নাতবাসীদের বর্ণনায় এসেছে, তাঁরা হবেন হালকা গড়নের। এ পরিবর্তন ঠিক সেভাবেই হবে, যেভাবে শিশুই যুবক হয়, তারপর বৃদ্ধ হয়। যদিও দেহের অঙ্গসমূহে হাজারবার পরিবর্তন হয়। পুনরুত্থানকালে মানুষকে দুনিয়ার দেহগুলোই দেওয়ার বিষয়টি শরিয়তের দলিল ও প্রথাগত দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

পুনরুত্থান দুনিয়ার দেহে হওয়ার শরয়ি দলিল

'কাফেরের মাড়ির দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মতো!' হাদিসটি সহিহ মুসলিমে[১] এসেছে। এর অর্থ হলো, জাহান্নামে কাফেরের একটা 'মাড়ির দাঁত' উহুদ পাহাড়ের মতো বড় হবে। আর দাঁত হলো মানবদেহের ক্ষুদ্র একটি অঙ্গ মাত্র! তাহলে তার দুই হাত, দুই পা ইত্যাদি অঙ্গসমূহ কেমন হবে!? তাদের দুনিয়ার দেহকেই বৃহদাকার বানানো হবে, যেন তারা ভালো করে শাস্তি ভোগ করে।

উল্লেখ্য, উহুদ পাহাড় দৈর্ঘ্যে ৭ কিলোমিটারেরও বেশি, আর উচ্চতায় প্রায় ৩০০ মিটার! এটি উত্তর দিক থেকে মদিনা মুনাওয়ারাকে বেষ্টন করে রেখেছে।

মুমিনদের দেহের ব্যাপারে তাবারানি রাহিমাহুল্লাহ 'আল মুজামুল কাবির' গ্রন্থে মিকদাম বিন মাদিকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, '...যে ব্যক্তি জান্নাতের অধিবাসী হবে, তার দৈর্ঘ্য হবে আদম আলাইহিস সালামের মতো, সৌন্দর্য হবে ইউসুফ আলাইহিস সালামের মতো,

১. হাদিস নং ৭৩৬৪।

অন্তর হবে আইয়ুব আলাইহিস সালামের মতো। আর যে জাহান্নামের অধিবাসী হবে, তাকে পাহাড়ের মত বিশাল ও বৃহদাকার বানানো হবে।'[১]

প্রথাগত দলিল

পুনরুত্থানকালে মানুষকে দুনিয়ার দেহগুলোই দেওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত হাদিসসমূহ হলো শরয়ি দলিল। এগুলোর প্রতি ইঙ্গিত প্রদানের পর লেখক প্রথাগত দলিল উল্লেখ করেছেন। তা হলো, একটি শিশু যখন ধীরে ধীরে বড় হয়, তার দেহের অঙ্গপ্রতঙ্গ পরিবর্তন হতে থাকে। একসময় সে যুবকে পরিণত হয়। তারপর ধীরে ধীরে সে-ই আবার বৃদ্ধ হতে থাকে, দেহের অঙ্গসমূহ পরিবর্তন হতে থাকে। এভাবে হাজারবার পরিবর্তন হলেও তার দেহ কিন্তু সেটিই। এমনিভাবে দুনিয়ার দেহটিই তাকে আখেরাতে দেওয়া হবে; যদিও তাতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হবে।

ভালো-মন্দের প্রতিদান [সত্য]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ.

সেদিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের উপযুক্ত প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন। (সুরা নুর : ২৫)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.

---

১. الْمُعْجَمُ الكَبِيْرُ তাবারানি, হাদিস নং ৬৬৩, প্রকাশক : مَكْتَبَةُ العُلُوْمِ وَالحِكَمِ মসুল, ইরাক। দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৪০৪ হি./১৯৮৩ঈসায়ি।

যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি কি তাদেরকে সেই সব লোকের মতো গণ্য করব, যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে? না আমি মুত্তাকিদেরকে পাপাচারীদের মতো গণ্য করব? (সুরা সোয়াদ : ২৮)

সৃষ্টিজগতের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আখেরাত এবং সেখানে প্রতিদান প্রদানের প্রয়োজনীতা, এ দুটি বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আখেরাত থাকার যৌক্তিকতা

আয়াতের মর্ম হলো, মুমিন-কাফের এবং নেককার-পাপাচারীর সঙ্গে একই আচরণ করা কী ইনসাফ ও প্রজ্ঞার নিদর্শন? ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে কী নেককার ও পাপাচারী এবং সংস্কারকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সমান জ্ঞান করা হবে? যদি আখেরাতের অস্তিত্ব না থাকে এবং প্রতিদানের ব্যবস্থা না থাকে -যেমনটা কাফেরদের ধারণা-, তা হলে তো আল্লাহ তাআলার নিকট ভালো ও মন্দ লোকেরা সমান হয়ে যেতো! সংস্কারকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীরা সমান হয়ে যেতো! আর যে উভয় প্রকার লোকদের সঙ্গে একই আচরণ করে, সে নির্বোধ ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তাআলা সব ধরণের নিরর্থক কাজ থেকে পবিত্র। তাই আখেরাত এবং সেখানে প্রতিদান দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস রাখা আবশ্যক।

আমরা পৃথিবীতে অনেক জালেমদের দেখি, তাদের পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, ভোগসামগ্রী বেড়েই চলছে, তারা শাস্তি না পেয়েই মারা যাচ্ছে! অপরদিকে অসংখ্য দুর্বল ও মজলুমদের দেখি, তারা দুশ্চিন্তা ও বিপদে জর্জরিত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে! এর পেছনে অবশ্যই মহান প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তাআলার হিকমত আছে। তিনি তাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। আর এটা যেহেতু দুনিয়াতে ঘটছে না,

তাহলে অবধারিতভাবেই প্রমাণিত হচ্ছে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আরো একটি জগত রয়েছে। আর তা-ই হলো আখেরাত।[১]

হিসাব-নিকাশ [সত্য]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ.

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ.

অতঃপর যাকে আমলনামা দেওয়া হবে তার ডান হাতে, সে [খুশিতে আত্মহারা হয়ে লোকদের] বলবে, 'নাও, তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখো। আমি বিশ্বাস করেছিলাম, আমি [কিয়ামতের দিন] আমার হিসাবের সম্মুখীন হব।' সুতরাং সে থাকবে সন্তোষজনক জীবনে। সমুন্নত জান্নাতে। তার ফলমুল থাকবে নিকটে [বসে বা শুয়েও তা হাতের নাগালে পাবে। তাদেরকে বলা হবে] বিগত জীবনে তোমরা যা পাঠিয়েছিলে, তার বিনিময়ে স্বাচ্ছন্দ্যে খাও ও পান করো।

আর যাকে আমলনামা দেওয়া হবে বাম হাতে, সে [আফসোস করে] বলবে, 'আহ! আমাকে যদি আমার আমালনামা দেওয়াই না হত! আমি জানতেই না পারতাম, আমার হিসাব কী!? আহ! যদি তা [দুনিয়ার মৃত্যু] সমাপ্তকারী হত! [ঐ মৃত্যুর মাধ্যমে সবকিছু সমাপ্ত হয়ে যেত! তারপর আখেরাতের জীবন না হত!] আমার সম্পদ আমার

---

১. التفسيرُ الواضِحُ المُيَسَّرُ

কোনো কাজে আসেনি। আমার ক্ষমতা আমার থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল!' [এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে জাহান্নামের দারোগাদের আদেশ দেওয়া হবে,] ধরো তাকে এবং তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। তারপর ওকে প্রচণ্ড প্রজ্জলিত আগুনে সেঁকো। তারপর তাকে এমন শিকলে আবদ্ধ করো যার দৈর্ঘ্য সত্তর গজ। (সুরা হাক্কাহ : ১৯-৩২)

সহজ হিসাবের ব্যাখ্যা

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তিরই হিসাব নেওয়া হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে!' আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন, তিনি কী এ কথা বলেননি যে,

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.

[অতঃপর যাকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে; তার থেকে সহজ হিসাব নেওয়া হবে]? নবিজি বললেন, সহজ হিসাব মানে আমলনামা পেশ করা। যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে।[১]

বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার আমল

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ ইমরান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার উম্মতের ৭০ হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে।' লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসুল, তারা কারা?

---

১. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৪৯৩৯, প্রকাশক : دَارُ طَوْقِ النَّجَاةِ বৈরুত। প্রথম প্রকাশ : ১৪২২ হি.।

নবিজি বললেন, 'যারা [অন্যের কাছে] ঝাঁড়ফুক চায় না, অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে না এবং নিজেদের প্রভুর ওপর ভরসা করে।'[১]

অশুভ লক্ষণ গ্রহণ বিষয়ে হজরত থানবির ব্যাখ্যা

হজরত থানবি রাহিমাহুল্লাহ 'ফুরুউল ঈমান' পুস্তিকায় লিখেছেন, অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করার অর্থ হলো, যেমন যাত্রাপথে হাঁচি দেওয়াকে বা কোনো পশু সম্মুখ দিয়ে চলে যাওয়াকে অশুভ মনে করে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়া এবং যাত্রাকে অশুভ মনে করা। কারণ, প্রকৃত প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী হলেন মহান আল্লাহ পাক। তাই এত অধিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও খটকায় আক্রান্ত হওয়া উচিত নয়। তবে ভালো লক্ষণ গ্রহণ করা উত্তম, যদিও তাতেও প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রভাব নেই, কিন্তু যেহেতু তাতে আল্লাহর রহমতের আশা পোষণ করা হয়, তাই তা উত্তম। পক্ষান্তরে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করার মধ্যে আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশা সৃষ্টি হয়।

তাওয়াক্কুলের স্বরূপ ও একটি বিভ্রান্তির নিরসন

বর্তমানে তাওয়াক্কুলের অর্থ এই প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, সব ধরনের উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে যাওয়া। এ অর্থ সম্পূর্ণ ভুল। চেষ্টা করা এবং উপকরণ গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হওয়ার প্রমাণে কুরআন-হাদিস পরিপূর্ণ। বরং তাওয়াক্কুলের এ অর্থ সম্পূর্ণ অবাস্তব ব্যাপার। কারণ, বিনা চেষ্টায় খাদ্য-পানীয় কিছু পাওয়া গেলেও তা খাওয়ার জন্য কি মুখেও দিতে হয় না? তা কি চিবুতেও হয় না? গিলতেও হয় না? তাহলে এ সবই তো খাদ্যকে পাকস্থলীতে পৌঁছানোর উপায় ও তদবির। তাহলে আর তাওয়াক্কুল থাকলো কোথায়? এটাই যদি তাওয়াক্কুলের অর্থ হয়, তাহলে তো আজ পর্যন্ত

---

১. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৫৪৭, প্রকাশক : دَارُ الْجِيْلِ বৈরুত এবং دَارُ الْآفَاقِ الْجَدِيْدَةِ বৈরুত।

কোন নবি বা ওলিও তাওয়াক্কুলকারী হতে পারেননি। অতএব, এমনতর তাওয়াক্কুলের দাবি কে করতে পারে?

মূলত তাওয়াক্কুলের অর্থ আর কাউকে উকিল বানানোর অর্থ একই। অর্থাৎ মামলা পরিচালনার জন্য কাউকে উকিল বানানো হয়। তাই বলে কি যার মামলা সে চেষ্টা তদবির করা ছেড়ে দেয়? কিন্তু এতদসত্ত্বেও মামলার সফলতা উকিলের যোগ্যতা, দক্ষতা, বাকপটুতা ও কুশলতার ফল মনে করা হয়। মামলার সফলতাকে নিজের চেষ্টা তদবিরের ফল আখ্যা দেওয়া হয় না। ঠিক একই অবস্থা তাওয়াক্কুলেরও। শরিয়তসম্মত যে কোনো চেষ্টা-তদবির ও উপায়-উপকরণ গ্রহণ করবে ঠিকই, কিন্তু তাকে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী মনে করবে না। বরং এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, কাজ যখন হবে, তখন তা আল্লাহ পাকের হুকুম ও দয়াতেই হবে।

বাস্তবেও আল্লাহর দয়াতেই উপায়-উপকরণ কার্যকর হয়ে থাকে। মানুষের এতে কিছুমাত্র দখল থাকে না। যেমন জমিতে বীজ বপণ করা, এটা হলো মানুষের চেষ্টা। এখন যথাসময়ে বৃষ্টি হওয়া, মাটি ফুঁড়ে গাছ অঙ্কুরিত হওয়া, ফসল পাকা, জলবায়ুর দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি মানুষের ক্ষমতাধীন মোটেও নয়। তাই সফলতাকে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের ফল মনে করা আবশ্যক। আর এটিই হলো 'তাওয়াক্কুল'।

অনেকের মানসিক অস্থিরতার কারণ

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ মুসলমানই তাওয়াক্কুলের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত। তবে কিছু কিছু মানুষের চিন্তাধারার কিছুটা সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। বাকি রইলো, মামলা মোকদ্দমা ও জীবিকা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে অনেকের মানসিক অস্থিরতা দেখা দেয়, তার কারণ মানুষের মধ্যে তাওয়াক্কুলের গুণ নেই বা আল্লাহর ওয়াদার ওপর ভরসা নেই, তা

নয়। বরং এ অস্থিরতার কারণ কেবল এই যে, সফলতার উপায় ও সময় সুনির্দিষ্ট নয়। অনির্ধারিত ও অস্পষ্ট বিষয়ে দ্বিধা ও সংশয় জন্মাবে এটাই স্বাভাবিক।

কারামত তাওয়াক্কুলের ফল নয়

কতক তাওয়াক্কুলকারী উপায় গ্রহণ করা ছাড়াই যে কিছু পেয়ে যান, তা কারামতের অন্তর্ভুক্ত, যা তাওয়াক্কুলের অনাবশ্যক প্রভাব। তা প্রকৃত তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত নয়। বিষয়টি ভালো করে বুঝে নাও।[১]

১৫২ নং পৃষ্ঠায় 'কাঙ্ক্ষিত বিষয় ইসতিকামাত, কারামাত নয়' আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পুলসিরাত [সত্য]

পুলসিরাত হলো জাহান্নামের ওপর প্রস্তুতকৃত সেতু। হিসাব-নিকাশের স্থান থেকে প্রস্থানের পর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলে এই সেতু অতিক্রম করবে। জান্নাতবাসীরা সেতু পার হয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। আর জাহান্নামিরা জাহান্নামে পড়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَاِنۡ مِّنۡكُمۡ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتۡمًا مَّقۡضِيًّا. ثُمَّ نُنَجِّىۡ الَّذِيۡنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيۡنَ فِيۡهَا جِثِيًّا.

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তা [জাহান্নাম] অতিক্রম করবে না [/তাতে প্রবেশ করবে না]। এটা আপনার রবের অনিবার্য ফায়সালা। অতঃপর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদেরকে আমি নিষ্কৃতি দেব। আর যারা জালেম, তাদেরকে তাতে [জাহান্নামে] নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব। (সুরা মারইয়াম : ৭১-৭২)

---

১. 'ফুরূউল ঈমান' পৃ. ৪২-৪৩

আল-উরুদ শব্দের মর্ম বিষয়ে মুফাসসিরগণের মতভিন্নতা

الورود [আল-উরুদ] শব্দটি নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে, এর অর্থ কি 'প্রবেশ করা', না 'অতিক্রম করা'? এর সম্মুখীন কি শুধু কাফেররা হবে, না মুসলমানরাও এর সম্মুখীন হবে? যদি মুমিন-কাফের সকলেই এর সম্মুখীন হয়, তাহলে কি সকলের জন্য তা একই ধরনের হবে, না ভিন্ন ভিন্ন ধরনের? যেমন- মুমিনদের 'উরুদ' হবে অতিক্রম করা অর্থে, কিংবা দুনিয়াতে জ্বর ও বিভিন্ন রোগ-বালাইয়ের শিকার হওয়া অর্থে। আর কাফেরদের 'উরুদ' হবে জাহান্নামে প্রবেশ করা অর্থে।

আল্লামা জালালুদ্দিন মাহাল্লি রাহিমাহুল্লাহর মত হলো, এই আয়াতে 'উরুদ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রবেশ করা। আর তা ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে জুরাইজ রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত রয়েছে। তাবারিসহ অন্যান্য মুফাসসিরগণ এটি বর্ণনা করেছেন।[১]

'প্রবেশ করা' অর্থ উদ্দেশ্য হলে নেককার ইমানদারদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর লক্ষ্য হবে, তাঁরা যেন স্বচক্ষে দেখতে পান, দুনিয়া থেকে ইমানদার ও নেককার হয়ে না আসলে এই পরিণতি ভোগ করতে হত। এই প্রবেশের ফলে জাহান্নামের কোনো শাস্তি তাঁদের স্পর্শ করবে না।

পুলসিরাতের নিকটে মুনাফিকরা মুমিনদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

---

১. মতামতগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন তাফসিরে তাবারি (১৬/১০৮-১১৪), তাফসিরে ইবনে কাসির (৫/২৪৭-২৫১), যাদুল মাসির (৫/২৫৪-২৫৭) এবং مَوْسُوْعَةُ التفسيرِ المَأْثُوْرِ

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ.

সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদেরকে বলবে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন, যাতে আমরা আপনাদের থেকে কিছুটা আলো গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে, তোমরা তোমাদের পেছনে [দুনিয়ায়] ফিরে যাও, তারপর আলো তালাশ করো। এরপর তাদের মাঝখানে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা থাকবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত, আর বাইরের দিকে থাকবে আযাব। (সুরা হাদিদ : ১৩)

মিজান সত্য

মিজান শব্দের অর্থ নিক্তি, দাঁড়িপাল্লা, তুলাদণ্ড। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا.

কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের তুলাদণ্ড স্থাপন করব। ফলে কারও প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। (সুরা আম্বিয়া : ৪৭)

মানুষের আমল ওজন করার জন্য আল্লাহ তাআলা হিসাবের স্থানে তুলাদণ্ড স্থাপন করবেন। প্রত্যেকেই তার ভালো কিংবা মন্দের কর্মফল যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গরূপে পাবে, যদিও তা তিল বা অনু পরিমাণ হয়! এভাবেই আল্লাহর ন্যায়বিচার সমাপ্ত হবে।

আয়াতে মিজান [তুলাদণ্ড] শব্দটির বহুবচন আনা হয়েছে। এ ব্যাপারে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত হলো, মিজান তথা তুলাদণ্ড একটিই হবে। তার দুটো পাল্লা থাকবে ও একটি দণ্ড থাকবে। যেহেতু সেই তুলাদণ্ডে অনেকের আমল মাপা হবে, সেদিকে লক্ষ্য করেই বহুবচন আনা হয়েছে।[১]

---

১. الْبَيَانُ فِي أَرْكَانِ الإِيمَانِ পৃ. ৩৬৩

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন–

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، نَارٌ حَامِيَةٌ.

অনন্তর যার [আমলের] পাল্লা ভারী হবে, সে থাকবে সন্তোষজনক জীবনে। আর যার [আমলের] পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। কোন জিনিস তোমাকে জানাবে, তা কী? তা উত্তপ্ত আগুন। (সুরা : কারিআ : ৬-১১)

হিসাব আগে হবে, না ওজন আগে হবে?

হিসাব হবে ভালো-মন্দ আমলগুলো পৃথক করার জন্য; আর ওজন হবে সেগুলোর পরিমাণ জেনে তদনুযায়ী প্রতিদান দেওয়ার জন্য। তাই হিসাব-নিকাশ শেষে প্রত্যেকে স্ব স্ব আমলনামা বুঝে পাওয়ার পরই সেগুলো ওজন করা হবে।[১]

জান্নাত সত্য

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ.

আল্লাহ মুমিন নর ও নারীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন উদ্যানরাজির, যার তলদেশে বহমান থাকবে নহর। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এবং [প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] শান্তিময় জান্নাতসমূহে উৎকৃষ্ট বাসস্থানাদির। (সুরা তাওবা : ৭২)

---

১. الإيمانِ البَيَانُ فِي أَرْكَانِ পৃ. ৩৬৩-এর বরাতে ইমাম কুরতুবি রচিত التَّذْكِرَةُ فِي أَحْوَالِ المَوْتَى وأُمُوْرِ الآخِرَةِ পৃ. ৩০৯

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন,

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا.

এটাই সেই জান্নাত, আমি যার মালিক বানাব আমার বান্দাদের মধ্যে যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদেরকে। (সুরা মারইয়াম : ৬৩)

জাহান্নাম সত্য

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا.

নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত মুনাফিক ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে একত্র করবেন। (সুরা নিসা : ১৪০)

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ.

আর যারা কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, ওরা জাহান্নামবাসী। (সুরা বাকারা : ৩৯)

এ দুটি বর্তমানে বিদ্যমান আছে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ، فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ.

আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে থাকো এবং সেখান থেকে যা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে খাও। এই গাছের নিকটে যেয়ো না। অন্যথায় তোমরা জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। অতঃপর শয়তান তাদেরকে সেখান থেকে বিচ্যুত করল এবং তারা যার [যে জান্নাতের] ভেতর ছিল, তা থেকে তাদেরকে বের করল! (সুরা বাকারা : ৩৫-৩৬)

আয়াতটিতে এ কথা একেবারেই স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা আদিপিতা আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাতে থাকার আদেশ করেছিলেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, জান্নাত বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় আছে। এমন নয় যে, কিয়ামতের পর আল্লাহ তাআলা জান্নাত সৃষ্টি করবেন।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.

সুতরাং ভয় করো সেই আগুনকে, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর। তা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (সুরা বাকারা : ২৪)

আয়াতটিতে বলা হয়েছে, কাফেরদের জন্য জাহান্নাম 'প্রস্তুত করা হয়েছে'। প্রস্তুত করা হবে বলা হয়নি। অতএব জাহান্নামও বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় আছে।

তবে এগুলো বর্তমানে কোথায়, এ বিষয়ে কুরআন-হাদিসে কিছু উল্লেখ নেই। বরং আল্লাহ তাআলা যেখানে চেয়েছেন, সেখানেই আছে। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও জগতসমূহের ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ.

সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে। তারই কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া। (সুরা নাজম : ১৪-১৫)

আয়াতে বলা হয়েছে, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল আলাইহিস সালামকে তাঁর ফেরেশতা-আকৃতিতে দ্বিতীয়বার দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে।[১] সেখানেই অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া।

---

১. প্রথমবার দেখেছিলেন জমিনে ওহি নাযিলের শুরুর দিকে, যার পর সুরা মুদ্দাসসির নাযিল হয়েছিল।

আর এ কথা তো সকলেরই জানা যে, সিদরাতুল মুনতাহা সপ্তম আকাশে অবস্থিত। তাহলে বোঝা গেল, জান্নাত সপ্তম আকাশে। তাছাড়া আবু নুআইম আসফাহানি রাহিমাহুল্লাহ [৩৩৬-৪৩০ হি.] তাঁর 'সিফাতুল জান্নাহ'[১] কিতাবে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, জান্নাত হলো সপ্তম আকাশে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এটিকে যেখানে ইচ্ছা, সেখানে রাখবেন। আর জাহান্নাম হলো সপ্তম জমিনে।

এ ব্যাপারে আরো বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কিছু বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, জাহান্নাম সাত স্তর সাগরের নিচে, আর কিছু বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, জাহান্নাম সাত জমিনের নিচে। আবার কিছু বর্ণনাতে এটাও পাওয়া যায় যে, সাগরই মূলত জাহান্নাম!

মিরাজের হাদিসে আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি।' আর এটি তো জানা কথা, মিরাজ হয়েছিল সাত আসমানের ওপরে।

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, জান্নাত চতুর্থ আকাশে। যেদিন কিয়ামত হবে, আল্লাহ তাআলা সেদিন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে তা রাখবেন। আর জাহান্নাম আছে সপ্তম জমিনে। যেদিন কিয়ামত হবে, সেদিন তিনি যেখানে ইচ্ছা, সেখানে তা রাখবেন।

কিন্তু এই বর্ণনাগুলোর একটিও এমনভাবে প্রমাণিত নয়, যা দ্বারা আত্মপ্রশান্তি অর্জন হয়। তাই প্রণিধানযোগ্য কথা সেটিই, যা লেখক বলেছেন। তা হলো, এগুলো বর্তমানে কোথায়, এ বিষয়ে কুরআন-হাদিসে কিছু উল্লেখ নেই। বরং আল্লাহ তাআলা যেখানে চেয়েছেন, সেখানেই আছে।

---

১. হাদিস নং : ১৩২, دَارُ الْمَأْمُوْنِ لِلتُّرَاثِ দামেশক।

কবিরা গুনাহে লিপ্ত মুসলমান জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর, তোমরা যদি তা থেকে বিরত থাক, তাহলে আমি তোমাদের লঘুতর পাপগুলো মোচন করব। (সুরা নিসা : ৩১) অর্থাৎ সালাত ও কাফফারা দ্বারা মিটিয়ে দেব।

আল্লাহ তাআলা কবিরা গুনাহও ক্ষমা করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ 'তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করা'[র অপরাধ] ক্ষমা করবেন না। এর নিচের স্তরে যা [যেসকল অপরাধ] আছে, যার জন্য ইচ্ছা, ক্ষমা করবেন। (সুরা নিসা : ৪৮)

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ সহিহ মুসলিমে হজরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে অতঃপর মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' আমি বললাম, যদি সে যিনা করে এবং চুরি করে? তিনি বললেন, 'যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে!' আমি বললাম, যদি সে যিনা করে এবং চুরি করে? তিনি বললেন, 'যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে!' এভাবে ৩ বার বললেন। এরপর চতুর্থবারে বললেন, 'আবু যরের নাক ধূলায় ধূসরিত হলেও!' [অর্থাৎ বিষয়টি আবু যরের বোধগম্য না হলেও।] বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবু যর

রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কথা বলতে বলতে বের হলেন, 'আবু যরের নাক ধুলায় ধূসরিত হলেও!'[১]

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জাহান্নামিদের মধ্যে যারা প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামি, তারা সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না! [অর্থাৎ শান্তির বাঁচা বাঁচবে না।] তবে যে মানুষেরা তাদের পাপের কারণে [অথবা তিনি বলেছেন, ভুলের কারণে] জাহান্নামে যাবে, তাদেরকে এক ধরণের নির্জীব করে রাখা হবে। এক পর্যায়ে তারা কয়লা হয়ে যাবে। তখন তাদের জন্য সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হবে। এরপর তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দলে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জান্নাতের নহরে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসীরা, তাদের ওপর পানি ঢেলে দাও। ফলে বন্যায় ভেসে-আসা পলি মাটিতে গজিয়ে ওঠা শস্য দানার ন্যায় তারা সজীব হয়ে উঠবে।[২]

সম্ভবত লেখক এখানে

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ.

আয়াতটি উল্লেখ করেছেন কবিরা গুনাহের আলোচনা সংবলিত একটি আয়াত হিসেবে। জাহান্নামে কবিরা গুনাহকারীদের চিরস্থায়ী হওয়া না-হওয়ার আলোচনার সঙ্গে, এ আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর বক্তব্য অনুসারে আয়াতের মর্ম হলো, বান্দা যদি কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তাহলে তার সগিরা গুনাহগুলো সালাত ও অন্যান্য আমলের অসিলায় ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

---

১. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৫৪, প্রকাশক : دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيَّةِ বৈরুত।

২. সহিহ মুসলিম : ৩০৬

বস্তুত দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাআলার কর্মসমূহ দু-ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে– ১. নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

আল্লাহ তাওবা কবুলের যে দায়িত্ব নিয়েছেন তা কেবল ওই সকল লোকের জন্য, যারা অজ্ঞাতবশত[১] গুনাহ করে, তারপর জলদি তাওবা করে নেয়। সুতরাং আল্লাহ ওদের তওবা কবুল করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সুরা নিসা : ১৭)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

তাওবা [কবুলের বিষয়টি] তাদের জন্য নয়, যারা অসৎকর্ম করতে থাকে। পরিশেষে তাদের কারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলে, এখন তাওবা করলাম। এবং তাদের জন্যও নয়, যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি ওদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (সুরা নিসা : ১৮)

২. স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে। যেসকল মানুষ তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাআলা চাইলে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে তাদের কবিরা গুনাহও ক্ষমা করতে পারেন। অনুরূপ বান্দার হক বিনষ্ট করার গুনাহও স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীতে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন। এই হলো বাহ্যত পরস্পরবিরোধী আয়াত ও হাদিসগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের পদ্ধতি।

---

১. ৬৯ পৃষ্ঠায় 'অজ্ঞতাবশত'-এর ব্যাখ্যা অতিবাহিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ.

আর নিশ্চয়ই মানুষ জুলুম করা সত্ত্বেও [এমনকি যখন জুলুম করছে তখনও] তাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক ক্ষমাপ্রবণ। এবং [এটাও সত্য যে,] তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে কঠোর। (সুরা রাদ : ৬)

এক মুহূর্তের তাওহিদ ও একশ বছরের কুফর

আল্লামা বাবিরতি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আয়াতটি এই বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, তাওবা ছাড়াও আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করতে পারেন। কারণ, এক মুহূর্তের তাওহিদ একশ বছরের কুফরকেও মিটিয়ে দেয়। তাহলে খানিক সময়ের গুনাহ কিভাবে ধ্বংস না হয়! তবে হ্যাঁ, কবিরা গুনাহকারীর শাস্তির বিষয়টিও আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তারপরও, অন্তত ক্ষমার আশা তো করা যায়।[১]

বাহ্যত পরস্পরবিরোধী আয়াতসমূহের একটি উদাহরণ হলো উপরোক্ত আয়াত এবং তার পূর্বে উল্লিখিত সুরা নিসার ১৮ নম্বর আয়াত-وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ

শাফাআত সত্য। আল্লাহ তাআলা যাকে শাফাআতের অনুমতি দেবেন, সে শাফাআত করতে পারবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ.

যার জন্য তিনি [সুপারিশের] অনুমতি দেন, সে ছাড়া [অন্য কারও] সুপারিশ তাঁর নিকট কাজে আসবে না। (সুরা সাবা : ২৩)

---

১. شَرْحُ العَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ পৃ. ১১৩।

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন,

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.

দয়াময় [আল্লাহ] যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন, সে ছাড়া অন্য কারো সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না। (সুরা তাহা : ১০৯)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যখন সুপারিশকারীকে সুপারিশের অনুমতি দেবেন এবং সুপারিশকৃত ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন, তখনই কেবল সুপারিশ কাজে আসবে।

উম্মাহর কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর রাসুলের শাফাআত সত্য। তাঁর শাফাআত গ্রহণ করা হবে।

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তির জন্য আমার শাফাআত থাকবে।'[১]

জাহান্নামি-জান্নাতি

ইমরান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'একদল লোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফাআতে জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে বলা হবে জাহান্নামি।'[২]

---

১. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১৩২২২, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৪২০ হি./১৯৯৯ ইসায়ি, প্রকাশক : مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ বৈরুত। সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ২৪৩৫ ও সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ৪৭৩৯

২. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৬৫৬৬। 'জাহান্নামি' অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে আযাদকৃত।

যেসকল বর্ণনায় শাফাআত গৃহীত না হওয়ার কথা এসেছে, সেগুলো দ্বারা ওই শাফাআত উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ তাআলার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত হবে।

যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.

সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের উপকারে আসবে না। (সুরা মুদ্দাসসির : ৪৮)

আল্লাহ তাআলা কাঠমিস্ত্রি হাবিব রাহিমাহুল্লাহর ভাষায় ইরশাদ করেছেন,

أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ.

আমি কি তাঁকে [আল্লাহকে] বাদ দিয়ে এমন কিছু ইলাহকে গ্রহণ করব, রহমান আমার কোনো ক্ষতির ইচ্ছা করলে যাদের সুপারিশ আমার থেকে কোনো [ক্ষতি] দূর করবে না এবং আমাকে [সেই ক্ষতি থেকে] বাঁচাবে না? (সুরা ইয়াসিন : ২৩)

কবরের আযাব সত্য

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ.

তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আগুনের সামনে পেশ করা হয়। আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন [আদেশ করা হবে] ফেরাউনের সম্প্রদায়কে কঠিনতম শাস্তিতে প্রবেশ করাও। (সুরা মুমিন : ৪৬)

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, আগুনের সামনে পেশ করার বিষয়টি কিয়ামতের আগে হবে। ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতের

তাফসিরে লিখেছেন, 'অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত হলো, আগুনের সামনে পেশ করার বিষয়টি কবর-জগতে হবে।'

ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতে কবরে আযাব হওয়ার বিষয়টি সত্য। এর পক্ষে এই আয়াতটি অনেক বড় দলিল।'

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

مِمَّا خَطِيْٓـَٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا.

তাদের গুনাহের কারণেই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, তারপর তাদেরকে প্রবেশ করানো হয়েছে আগুনে। তারপর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহকে ছাড়া কোনো সাহায্যকারী পায়নি। (সুরা নুহ : ২৫)

আরবি ব্যাকরণ অনুসারে ফা[১] একটি সংযোজক অব্যয়।[২] পূর্ববর্তী বিষয়টি ঘটার পর, কালক্ষেপণ ব্যতীত সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী বিষয়টি ঘটে যাওয়ার অর্থ বোঝানোর জন্য, মধ্যখানে এ অব্যয়টি ব্যবহার হয়। উল্লিখিত আয়াতটিতে 'ডুবিয়ে মারা'র কথা বলার পর, এ অব্যয়যোগে 'আগুনে প্রবেশ করানো'র কথা বলা হয়েছে। তাহলে অর্থ দাঁড়ায়, 'তাই ডুবিয়ে মারার পরপরই তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে'। আর তা কবরে।

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন, 'কুশাইরি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এ আয়াতটি কবরের আযাবের প্রমাণ বহন করে।'

---

১. ف
২. حرف عطف

ইমানদারকে কবরে আরামদায়ক জীবন দান করার বিষয়টি সত্য

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ.

যারা বলেছে, আমাদের রব আল্লাহ! তারপর তাতে অবিচল থেকেছে, নিশ্চয়ই তাদের নিকট [মৃত্যুর সময়] ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে [তারা বলবে], তোমরা [মৃত্যু এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য] ভয় করো না এবং [দুনিয়াতে যা রেখে এসেছো যেমন : স্ত্রী, সন্তান, সম্পদ ইত্যাদি সেগুলোর কোনো কিছুর জন্য] চিন্তিত হয়ো না, আর সুসংবাদ গ্রহণ করো সেই জান্নাতের, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হত। (সুরা ফুসসিলাত/হা-মিম সাজদাহ : ৩০)

ওয়াকি বিন জাররাহ রাহিমাহুল্লাহ [১২৯-১৯৭ হি.] বলেছেন, আয়াতে সুসংবাদ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সুসংবাদটি তিন স্থানে- মৃত্যুর সময়, কবর-জগতে এবং পুনরুত্থানের পর।[১]

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.

যারা ইমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে সুদৃঢ় কথা দ্বারা স্থিতি দান করেন, দুনিয়ার জীবনেও এবং আখেরাতেও। (সুরা ইবরাহিম : ২৭)

মুহিউস সুন্নাহ বাগাবি রাহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা

মুহিউস সুন্নাহ বাগাবি রাহিমাহুল্লাহ [৪৩৩-৫১৬ হি.] বলেছেন, আয়াতে উল্লিখিত 'সুদৃঢ় কথা' দ্বারা তাওহিদের কালিমা তথা 'লা

---

১. মুহিউস সুন্নাহ বাগাবি রাহিমাহুল্লাহ কৃত مَعَالِمُ التَّنْزِيْلِ কিতাবে এই আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উদ্দেশ্য। 'দুনিয়ার জীবন' দ্বারা উদ্দেশ্য মৃত্যুর পূর্বের জীবন। আর 'আখেরাত' দ্বারা উদ্দেশ্য কবর-জগত। এটি অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত। কেউ কেউ বলেছেন, 'দুনিয়ার জীবন' দ্বারা কবরের প্রশ্নোত্তরের সময়কাল উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে 'আখেরাত' দ্বারা উদ্দেশ্য পুনরুত্থান।

মুনকার-নাকিরের প্রশ্ন সত্য

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ [১৯৪-২৫৬ হি.] সাহাবি হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, বান্দাকে যখন কবরে রেখে তার সাথিরা চলে যায় [অর্থাৎ এতটুকু দূরে চলে যায় যে,] তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়, এমন সময় তার নিকট দুজন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে দেন। অতঃপর তাঁরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখিয়ে প্রশ্ন করেন, তাঁর সম্পর্কে তুমি কী বলতে? তখন সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুল। তখন তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থানের জায়গাটি দেখে নাও, যার পরিবর্তে আল্লাহ্ তাআলা তোমার জন্য জান্নাতে একটি স্থান নির্ধারণ করেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন সে দুটি স্থান একই সময় দেখতে পাবে।[১]

আর যারা কাফের বা মুনাফিক, তারা [উত্তরে] বলবে, আমি জানি না। অন্য লোকেরা যা বলত আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, না তুমি নিজে জেনেছ, আর না তিলাওয়াত করে শিখেছ!

---

১. আল্লাহ তাআলা এই বইয়ের লেখক, পাঠক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে রাখুন। আমিন!

অতঃপর তার দুই কানের মাঝখানে লোহার মুগুর দিয়ে এমন জোরে মারা হবে যে, সে প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠবে, তার আশপাশের সবাই তা শুনতে পাবে দুই জাতি [মানুষ ও জিন] ছাড়া।[১]

ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ হজরত বারা বিন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, এবং দুজন ফেরেশতা আসবেন। তাকে বসাবেন। তারপর তাকে বলবেন, 'তোমার রব কে?' সে বলবে, 'আমার রব আল্লাহ।' তারা বলবেন, 'তোমার দীন কী?' সে বলবে, 'আমার দীন ইসলাম।' তারা তাকে বলবেন, 'এই লোকটি কে, যাকে তোমাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছে?' সে বলবে, 'ইনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।' তারা বলবেন, '[এসব] তুমি কীভাবে জেনেছ?' সে বলবে, 'আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, তাঁর ওপর ইমান এনেছি এবং তা সত্যায়ন করেছি।'... এটাই আল্লাহ তাআলার يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا [যারা ইমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে স্থিতি দান করেন] বাণীর ব্যাখ্যা। অতঃপর আসমান থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, 'আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও; জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও এবং জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও।' নবিজি বলেন, এরপর তার নিকট জান্নাতের স্নিগ্ধ বাতাস ও সুগন্ধি আসতে থাকবে। দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কবর প্রশস্ত হয়ে যাবে।

বর্ণনাকারী বলেন, নবিজি কাফেরের মৃত্যুর আলোচনা করে বলেছেন, তার দেহে রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তার নিকট দুজন ফেরেশতা এসে তাকে বসাবেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করবেন,

---

১. সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ১৩৩৮

'তোমার রব কে?' সে বলবে, 'হায়! আমি কিছুই জানি না।' তাঁরা তাকে বলবেন, 'তোমার দীন কী?' সে বলবে, 'হায়! আমি কিছুই জানি না।' তাঁরা বলবেন, 'এই লোকটি কে, যাকে তোমাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছে?' সে বলবে, 'হায়! আমি কিছুই জানি না।' এরপর আসমান থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, 'সে মিথ্যা বলেছে[১]। তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও; জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।' নবিজি বলেন, অতঃপর তার কাছে জাহান্নামের তাপ ও লু-হাওয়া আসতে থাকবে। তার কবর সঙ্কীর্ণ হয়ে যাবে। তার পাঁজরের হাড় এলোমেলো হয়ে যাবে।

জারির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একই হাদিসে একটু বৃদ্ধি রয়েছে। তিনি বলেন, তার ওপর একজন অন্ধ ও বোবা ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। তাঁর কাছে থাকবে লোহার হাতুড়ি। সেই হাতুড়ি দিয়ে যদি পাহাড়ে আঘাত করা হয়, তা ধূলায় পরিণত হয়ে যাবে! তিনি বলেন, সেটি দিয়ে তাকে প্রচণ্ড আঘাত করা হবে, যা পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যকার সবাই শুনতে পাবে দুই জাতি [মানুষ ও জিন] ছাড়া। এরপর সে মাটি হয়ে যাবে [অর্থাৎ মাটির সঙ্গে মিশে যাবে]। অতঃপর [শাস্তি অব্যাহত রাখার জন্য] আবার তাতে রুহ ফেরত দেওয়া হবে![২]

---

১. অর্থাৎ পরোক্ষভাবে সে এই দাবি করেছে যে, দীন তার কাছে পৌঁছায়নি! অথচ দীন পৃথিবীর সকল প্রান্তে পৌঁছেছে। [দেখুন, بَذْلُ الْمَجْهُوْدِ فِيْ حَلِّ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُد (১৩/১৭৯)।]

২. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ৪৭৫০

আখেরাতের প্রতি ইমান আনয়নের কিছু ফলাফল

মুমিন জীবনে আখেরাতের প্রতি ইমানের অনেক প্রভাব রয়েছে। অতীব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক নিম্নরূপ–

১. আখেরাতের পুরষ্কারের আশায় বান্দা আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি আগ্রহী হয়। এবং আখেরাতের শাস্তির ভয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানি থেকে দূরে থাকে।

২. জাগতিক যেসব নায-নেয়ামত ও ভোগ-সামগ্রী মুমিন ব্যক্তির হাতছাড়া হয়ে যায়, তার কারণে সে হতাশ ও পেরেশান হয় না। কারণ, পরকালীন সুখ-শান্তি ও মহা পুরষ্কারের বিষয় তাকে সর্বদা আশান্বিত ও ব্যাকুল করে রাখে।

৩. আখেরাতের প্রতি ইমান আনয়নের মাধ্যমে মুমিন বান্দার মনে মহান আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ ন্যায়-ইনসাফের অনুভূতি জাগ্রত হয়। কারণ সে জানে, বান্দাদের প্রতি দয়া ও রহমতের কারণে প্রত্যেককেই তিনি তার আমলের পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন।[১]

---

১. أُصُوْلُ الإيمانِ في ضَوْءِ الكتابِ والسُّنَّةِ পৃ. ২৪০

নবি-রাসুলগণের প্রতি ইমান

মাখলুকের নিকট রাসুল প্রেরণের বিষয়টি সত্য

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ.

রাসুল সেই বিষয়ের প্রতি ইমান এনেছেন, যা তাঁর ওপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিল করা হয়েছে এবং [তাঁর সাথে] মুমিনগণও। তারা সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি ইমান এনেছে। (সুরা বাকারা : ২৮৫)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِیْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসুল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত পরিহার করো। (সুরা নাহল : ৩৬)

রাসুল প্রেরণের দুটি লক্ষ্য

এ আয়াতে রাসুল প্রেরণের দুটি লক্ষ্য উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত এ দুটোই তাওহিদের কালিমার রোকন। ১. একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা। ২. তাগুত বর্জন করা।

২৬ নং পৃষ্ঠায় ইবাদত বিষয়ক আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

তাগুতের সংজ্ঞা

آسان ترجمۂ قرآن কিতাবে সুরা নিসা-র ৬০ নং আয়াতের অধীনে রয়েছে, তাগুতের আভিধানিক অর্থ ঘোর অবাধ্য। কিন্তু শব্দটি শয়তানের জন্যও ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক বাতিলপন্থির জন্যও ব্যবহৃত হয়। এখানে শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য এমন শাসক, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানাবালি থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে বিচার করে; অথবা তাঁদের বিপরীত আইন দ্বারা বিচার করে। আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি মুখে নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসুলের বিধানাবলির ওপর অন্য কোনো বিধানকে প্রাধান্য দেয়, তার মুসলমান থাকার সুযোগ নেই।[১]

'ঈমান সবার আগে' বইয়ে এসেছে, তাগুতের অর্থ আল্লাহর ঐ বিদ্রোহী বান্দা, যে আল্লাহর মোকাবিলায় নিজেকে বিধানদাতা মনে করে এবং মানুষের ওপর তা কার্যকর করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে কোনো তাগুত ব্যক্তি বা দলের বানানো আইনকানুন হচ্ছে সত্য দীন ইসলামের বিপরীতে বিভিন্ন ধর্ম, যা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা ছাড়া ইমান সাব্যস্ত হয় না। আল্লাহর বিরুদ্ধে কিংবা আল্লাহর সাথে তাগুতের উপাসনা বা আনুগত্য করা কিংবা তা বৈধ মনে করা, অদ্রূপ আল্লাহর দীনের মোকাবিলায় বা তার সাথে তাগুতের আইন-কানুন

---

১. آسان ترجمۂ قرآن লেখক : মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অনবগত কতক লোক মনে করে, পাকিস্তান প্রভৃতি মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর শাসকবৃন্দ এমন নয়। তাদের অবগতির জন্য ২৯৭-৩০১ নং পৃষ্ঠায় পাকিস্তানের কিছু অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। তাতে সামান্য চিন্তা করেই যেকেউ বুঝতে সক্ষম হবেন যে, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হলেও, সেখানকার শাসকবৃন্দ তেমনই, যাদের আলোচনা আল্লামা উসমানি এখানে করেছেন।

গ্রহণ করা বা গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করা, সরাসরি কুফর ও শিরক। তাগুত ও তার বিধি-বিধান থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ছাড়া ঈমানের দাবি নিফাক ও মুনাফেকি।[১]

তাগুত বর্জনের উপায়

তাগুত বর্জনের উপায় তিনটি- ১. অন্তরের মাধ্যমে। ২. মুখের মাধ্যমে। ৩. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে।

১. অন্তরের মাধ্যমে তাগুত বর্জন হলো, তাগুতের উপাসনা বাতিল বলে বিশ্বাস করা এবং তাদের সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা। অন্তরের মাধ্যমে তাগুত বর্জন কোনো অবস্থাতেই রহিত ও স্থগিত হয় না।

২. মুখের মাধ্যমে তাগুত বর্জন হলো, তাগুতকে প্রত্যাখ্যানের কথা মুখে প্রকাশ করা, তাদেরকে তাকফির করা [কাফের আখ্যা দেওয়া] এবং তাদের দীন ও অনুসারীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ.

অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ, যখন তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছেন, আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের থেকে সম্পর্কহীন। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা

---

১. ঈমান সবার আগে, পৃ. ৬৭, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৮ খ্রি. লেখক : মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক।

তন্মধ্যে একটি হলো, তাঁদের দ্বারা মুজিযা তথা স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত বিষয় প্রকাশ পাওয়া।

নবি-রাসুলগণের কয়েকটি মুজিযার বিবরণ নিম্নরূপ–

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

سُبْحَانَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا.

পবিত্র তিনি যিনি নিজ বান্দাকে এক রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। (সুরা বনি ইসরাইল : ১)

এ আয়াতে স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত বিষয়টি হলো, ইসরা বা রাতের সফর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন, যার দূরত্ব ১,২৩৫ কিলোমিটার।

২. আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى، اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى، لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى.

বস্তুত তিনি তাঁকে [জিবরাইলকে] আরো একবার দেখেছেন। সিদরাতুল মুনতাহার কাছে। তারই নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া। তখন বরই গাছটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই জিনিস, যা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।[১] [রাসুলের] চোখ বিভ্রান্ত হয়নি এবং

১. অর্থাৎ যে জিনিসটি সে গাছটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তা বর্ণনার অতীত। বস্তুত তখন নবিজিকে দেখার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা সোনার প্রজাপতি আকারে সে গাছে একত্র হয়েছিল।

সীমালংঘন করেনি। তিনি তাঁর প্রতিপালকের বড়-বড় নিদর্শনের মধ্য হতে বহু কিছু দেখেছেন। (সুরা নাজম : ১৩-১৮)

এ আয়াতগুলোতে স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত বিষয় হলো মিরাজের ঘটনা। মিরাজ হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমিন থেকে সপ্তাকাশে এবং সিদরাতুল মুনতাহায় আরোহণ করা!

আত তাফসিরুল মুয়াসসারে এ আয়াতগুলোর মর্ম লেখা হয়েছে এভাবে, দ্বিতীয়বার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল আলাইহিস সালামকে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন সপ্ত আকাশে অবস্থিত সিদরাতুল মুনতাহায়। অর্থাৎ শেষ প্রান্তে অবস্থিত বরই গাছের নিকট। জমিন থেকে যা ওপরে ওঠে, তা সেখানে গিয়ে পৌঁছে [এবং সেখান থেকে তা গ্রহণ করা হয়]। তদ্রুপ উর্ধ্বলোক থেকে যা কিছু অবতরণ হয়, তাও এ পর্যন্ত এসে পৌঁছে [এবং সেখান থেকে তা গ্রহণ করা হয়]। তার কাছেই অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া, মুমিনদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

সে সময় বরই গাছটিকে আল্লাহর আদেশে বড় একটি জিনিস আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, যার বিবরণ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুগত্য ও দৃঢ়তার মহান গুণে অটল ছিলেন। ডানে-বাঁয়ে তাঁর দৃষ্টি যায়নি এবং যা দেখার আদেশ করা হয়েছে, তা ছাড়া অন্য কিছু তিনি দেখেননি। মিরাজের রাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বড়-বড় নিদর্শন দেখেছেন, যেগুলো আল্লাহ তাআলার কুদরতের প্রমাণ বহন করে। যেমন, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি।

৩. আল্লাহ তাআলা হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন,

وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَا مُوسَىٰ لَا
تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ ۖ فِيْ تِسْعِ اٰيَاتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ.

তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। তারপর সে যখন দেখল, সেটি নড়াচড়া করছে, যেন সেটি একটি সাপ, তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাল, পেছন দিকে ফিরল না। [বলা হল] হে মুসা! ভয় পেও না, আমার সামনে রাসুলগণ ভয় পায় না। তবে যে ব্যক্তি যুলুম করল, তারপর মন্দ কাজের পর তার বদলে ভালো কাজ করল, আমি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমার হাত নিজ জাইব [জামার সামনের খোলা অংশ]-এর ভেতর প্রবেশ করাও। তা শুভ্র হয়ে বের হয়ে আসবে কোনো রোগ ছাড়া। [এ দুটি] সেই নয়-নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত, যা [তোমার মাধ্যমে] ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে [পাঠানো হচ্ছে]। (সুরা নামল : ১০-১২)

'নয়-নিদর্শন' হলো, ১. লাঠি; ২. হাত; ৩. প্লাবন; ৪. পঙ্গপাল; ৫. উকুন; ৬. ব্যাঙ; ৭. রক্ত; ৮. কয়েক বছরের অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ঘাটতি; ৯. প্লেগ মহামারি।[১] এগুলো দ্বারা আল্লাহ তাআলা ফেরাউন ও তার জাতির সামনে মুসা আলাইহিস সালামের রিসালাতকে সুদৃঢ় করেছেন।

তাঁদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁদের স্বভাব-প্রকৃতি নিখুঁত এবং নৈতিকতা পূর্ণাঙ্গ। এছাড়াও তাঁদের রয়েছে আরো অনেক বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত। (সুরা নুন/কলাম : ৪)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ.

---

১. الْمُعِيْنُ عَلَى تَدَبُّرِ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ পৃ. ৩৭৭, সুরা নামল : ১২।

কোনো নবির পক্ষে সম্ভব নয় যে, তিনি গনিমতের সম্পদে খেয়ানত করবেন। (সুরা আলে ইমরান : ১৬১)

নবিগণ সৃষ্টিগতভাবেই দৈহিক ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন। হজরত মুসা আলাইহিস সালামের দৈহিক ত্রুটির ব্যাপারে বনি ইসরাইলের অপবাদের আলোচনা করতে গিয়ে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, [মুসা আলাইহিস সালামের এ ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যে,] নবিরা চরিত্রে ও গঠনে পূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে রয়েছেন। যে ব্যক্তি কোনো নবির ব্যাপারে সৃষ্টিগত ত্রুটির অভিযোগ করল, সে নবিকে কষ্ট দিল। এমন ব্যক্তির ব্যাপারে কুফরির আশঙ্কা রয়েছে।[১]

নবিগণ কুফর ও ইচ্ছাকৃত কবিরা গুনাহ করা এবং সগিরা গুনাহে অবিচল থাকা হতে পবিত্র

আল্লাহ তাআলা ইবলিস শয়তানের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন,

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.

সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, তাই আমি দুনিয়াতে অবশ্যই তাদের [মানুষের] জন্য [গুনাহের কাজকে] শোভনীয় করে তুলব এবং তাদের সকলকে বিপথগামী করব। তাদের মধ্যে থাকা আপনার নির্বাচিত বান্দাগণ ব্যতীত। (সুরা হিজর : ৩৯-৪০)

আল্লাহ তাআলা নবিগণের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন,

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ.

---

১. فَتْحُ البَارِي খ. ৬, পৃ/ ৪৩৮, طَبْعَةُ دَارِ المَعْرِفَةِ বৈরুত, ১৩৭৯ হি.।

আমি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাঁদেরকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছি। তা হলো [আখেরাতের] নিবাসের স্মরণ। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা আমার কাছে মনোনীত, উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা সোয়াদ : ৪৬-৪৭)

নবিগণের নিষ্পাপ হওয়া বিষয়ে হজরত থানবির ব্যাখ্যা

হজরত আশরাফ আলি থানবি রাহিমাহুল্লাহ 'ইমদাদুল ফাতাওয়া' গ্রন্থে লিখেছেন-

অকাট্য, সর্বজনস্বীকৃত, যুক্তিভিত্তিক ও বর্ণনাগত একটি মূলনীতি[১] হলো, জাহের[২] যখন মুহকামের[৩] সাথে বিরোধপূর্ণ হবে, তখন জাহেরকে মুহকামের অনুগামী ব্যাখ্যা করা হবে।

---

১. مِنَ القواعدِ العقلية والنقلية القَطعية المسلَّمَة

২. **জাহের-এর সংজ্ঞা :** জাহের বলা হয় শব্দের এমন অর্থকে, যেটা কথার মূল উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তা বুঝে আসে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন- وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا [অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। -সুরা বাকারা : ২৭৫] আয়াতটিতে ক্রয়-বিক্রয় হালাল ও সুদ হারাম হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করা। যেমনটি পূর্বাপর দেখলেই বুঝে আসে। কিন্তু আয়াতটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রয়-বিক্রয় হালাল ও সুদ হারাম হওয়ার বিষয়টি বুঝে আসে। এটি হলো জাহের।

উল্লেখ্য, জাহের যেহেতু এমন অর্থকে বলা হয়, যা কথার মূল উদ্দেশ্য নয়, তাই সেখানে ভিন্ন কিছু উদ্দেশ্য হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। অতএব যখন শক্তিশালী দলিলের আলোকে ভিন্ন সম্ভাবনাটি অধিক মজবুত হয়, তখন জাহেরের পরিবর্তে সেটিই গ্রহণ করা হয়।

৩. **মুহকাম-এর সংজ্ঞা :** মুহকাম বলা হয় এমন অর্থকে, যা শক্তিশালি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাতে ভিন্ন ব্যাখ্যা বা রূপকার্থের সম্ভাবনা থাকে না। মুহকাম কখনো রহিত হয় না।

এই ভূমিকার পর জেনে নাও, নবিগণ মাসুম [নিষ্পাপ] হওয়ার দলিলসমূহ হলো মুহকাম; আর এর বিপরীতে যে দলিলগুলো রয়েছে তার অধিকাংশ জাহেরও নয়। উদাহরণস্বরূপ–

'জুলুম'-এর শাব্দিক অর্থ হলো, কোনো জিনিসকে অপাত্রে রাখা। সুতরাং যেসকল কাজ অপাত্রে হয় তা জুলুম। যদিও শরিয়ত এ ব্যাপারে হারাম বা মাকরুহ হওয়ার হুকুম না দেয়!

অনুরূপ 'দলাল[১] শব্দটির অর্থ হলো, পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া। যদি বিচ্যুতিটি পথ সম্পর্কে জানার পূর্বে হয়, তাহলে তা নিন্দনীয় নয়। আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীতে এই অর্থটিই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى

তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথ সম্পর্কে অনবহিত। অতঃপর পথের দিশা দিয়েছেন। (সুরা দুহা : ৭)

তবে যদি পথচ্যুতটা পথ সম্পর্কে জানার পর হয়, তবে তা নিন্দনীয়। নিম্নোক্ত বাণীতে এই অর্থটি উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

যাদের প্রতি ক্রোধ অবতীর্ণ হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্ট নয়।[২] (সুরা ফাতিহা : ৭)

কারো মধ্যে 'মাকসাম' [বিভাজনক্ষেত্র] পাওয়া গেলেই নির্দিষ্ট 'কিসিম' [বিভাজিত] পাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে না।[৩] [অতএব

---

১. الضَّلَالُ

২. صِرَاطَ غيرِ المغضوبِ عليهم ولا الضالِّيْنَ - যাদের প্রতি ক্রোধ অবতীর্ণ হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্ট নয় তাঁদের পথ।

৩. **মাকসাম ও কিসিম :** মাকসাম [বিভাজনক্ষেত্র] বলা হয় যে জিনিস বণ্টন করা হয়। আর কিসিম [বিভাজিত] বলা হয় বণ্টিত জিনিসের প্রতিটি অংশকে। যেমন ধরুন প্রাণিজগৎ একটি মাকসাম। এ থেকে

আমাদের নবিজির ক্ষেত্রে যখন 'দলাল' শব্দটির প্রয়োগ পাওয়া গেছে, তখন এর অর্থ এই নয় যে, শব্দটির সকল অর্থ (কিসিম) তাঁর মধ্যে থাকতে হবে। তদ্রূপ উদাহরণস্বরূপ সুরা তাহা-র ১২১ নং আয়াতে বর্ণিত 'আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে বিভ্রান্ত হলো' দ্বারা এই অর্থ আবশ্যক হয় না যে, 'আল্লাহর হুকুম অমান্য করা'র ও 'বিভ্রান্ত হওয়া'র সকল কিসিম তাঁর মধ্যে পাওয়া গেছে।]

অনুরূপ হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উক্তি,

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا.

বরং তাদের [মূর্তিগুলোর] এই বড়টা তা করেছে। (সুরা আম্বিয়া : ৬৩)

এখানে স্বাভাবিকভাবে রূপক অর্থও গ্রহণ করা যাচ্ছে না, কারণ বাহ্যিক অবস্থা একে মিথ্যা বলছে। তাছাড়া আয়াতের শেষ অংশ, إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ [যদি তারা কথা বলে] রূপকার্থে হওয়ার সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়।

মোটকথা, উক্ত মর্মগুলো জাহের নয়। যদি জাহের মেনেও নেওয়া হয়, তখনও মুহকামের সাথে বিরোধপূর্ণ হওয়ায় তা প্রত্যাখ্যাত হবে। অতএব বলা হবে, এ ধরণের শব্দগুলোকে অবাধ্যতা, ভ্রষ্টতা, জুলুম, পথচ্যুতি, পাপ ও ফিতনার বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতি বোঝানোর জন্য রূপকার্থে আনা হয়েছে। তেমনিভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উক্তি فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ [তাদের বড়টা তা করেছে] রূপক অর্থে গ্রহণ করা হবে। আর কীভাবেই বা রূপক অর্থ গ্রহণ না করে থাকা যাবে, অথচ এ ধরণের ব্যবহারগুলো মানুষের কথোপকথন ও আলাপচারিতায়

বণ্টিত মনুষ্যজগৎ, জিনজগৎ, মৎসজগৎ, সরীসৃপজগৎ ইত্যাদি প্রতিটি একেকটি কিসিম।

ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে! এগুলো ব্যবহারে কেউ কোনো প্রতিবাদ বা সংকোচবোধ করে না।[১]

শিরোনাম থেকে হয়তো কেউ এই ধারণা করতে পারে যে, নবিগণ অনিচ্ছাকৃত কবিরা গুনাহ এবং মাঝে মাঝে সগিরা গুনাহ করেছেন! অথচ বিষয়টি মোটেও এমন নয়। উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে আমি কাজি ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'আশ শিফা বিতারিফি হুকুকিল মুসতফা' কিতাব থেকে কিছু চয়নিকা তুলে ধরছি :

নবিগণের নিষ্পাপ হওয়া বিষয়ে কাজি ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহর চয়নিকা

মুসলমানদের ইজমা রয়েছে যে, নবিগণ অশ্লীলতা এবং ধ্বংসাত্মক কবিরা গুনাহ থেকে পবিত্র।... এ ব্যাপারেও কোনো মতবিরোধ নেই যে, তাঁরা রিসালাত গোপন করা এবং তাবলিগে ত্রুটি করা থেকে পবিত্র।... মুহাক্কিক ফকিহ ও কালামবিদদের একটি দল এই মত গ্রহণ করেছেন যে, তাঁরা যেমন কবিরা গুনাহ থেকে পবিত্র, তেমনি সগিরা গুনাহ থেকেও পবিত্র।...

আমাদের কিছু ইমাম বলেছেন,... তাঁরা অধিক পরিমাণে এবং বারবার সগিরা গুনাহ করা থেকে পবিত্র। কারণ, তা কবিরা গুনাহের সঙ্গেই মিলিয়ে দেয়। তাঁরা এমন সকল সগিরা গুনাহ থেকেও মুক্ত, যা লজ্জাশীলতা বিলুপ্ত করে দেয়, আভিজাত্যকে ক্ষুন্ন করে এবং লাঞ্ছনা ও হীনতা আবশ্যক করে! সর্বসম্মতিক্রমে এগুলো থেকেও নবিগণ ছিলেন পবিত্র।... কেউ কেউ তো এ কথাও বলেছেন যে, নবিগণ ইচ্ছাকৃত মাকরুহে লিপ্ত হওয়া থেকেও মাসুম ছিলেন।...

---

১. হজরত থানবি রাহিমাহুল্লাহর বিবরণ সমাপ্ত হয়েছে। বিবরণটি নেওয়া হয়েছে 'দারুল উলুম দেওবন্দ...' কিতাবের ৫৭৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত তাঁর আলোচনার আরবি অনুবাদ থেকে। ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৬/১১৬-১১৭ দ্রষ্টব্য।

আর যেসকল কাজ মুবাহ[১], সেগুলো করা নবিদের জন্য দোষণীয় নয়।... তবে তাঁরা... মুবাহ কাজের মধ্য হতেও প্রয়োজন পরিমাণই গ্রহণ করতেন, যদ্বারা নিজেরা চলার জন্য এবং দীনের কল্যাণ ও দুনিয়াবি প্রয়োজন পূরণের জন্য শক্তি অর্জন করতেন। এ হিসেবে তাঁরা যে মুবাহ কাজগুলো করেছেন, সেগুলোও আল্লাহর সান্নিধ্য ও আনুগত্যে পরিণত হয়েছে।... অতএব আমাদের নবিসহ সমস্ত নবির ওপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ, তিনি তাদের [স্বাভাবিক] কাজগুলোকেও সান্নিধ্য ও আনুগত্য বানিয়ে দিয়েছেন। সেগুলোকে মতবিরোধের কারণ এবং গুনাহের লক্ষণ হওয়া থেকে দূরে রেখেছেন।[২]

আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে নিষ্পাপ রেখেছেন তিনভাবে–

১. তিনি তাঁদেরকে সৃষ্টি করেছেন নিষ্কলুষ স্বভাব-প্রকৃতি এবং চারিত্রিক পূর্ণ ভারসাম্য দিয়ে। ফলে তাঁরা গুনাহের প্রতি আগ্রহী হন না; বরং গুনাহকে অপছন্দ করেন।

এ সম্পর্কে কিছু কথা সামান্য পূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত। (সুরা নুন/কলাম : ৪)

তিনি আরো ইরশাদ করেন, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ

---

১. মুবাহ বলা হয় এমন কাজকে, যার ব্যাপারে শরিয়ত আদেশ বা নিষেধ কিছুই করেনি। এটি করা বা না-করার সঙ্গে সাওয়াব বা গোনাহের কোনো সম্পর্ক নেই।

২. 'আশ শিফা' কিতাবের ৬৬৭-৬৭২ পৃষ্ঠাগুলো থেকে এই চয়নিকা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম প্রকাশ : ১৪৩৪ হি.। প্রকাশনা : جَائِزَةُ دُبَيِّ الدَّوْلِيَّةُ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

কোনো নবির পক্ষে সম্ভব নয় যে, তিনি গনিমতের সম্পদে খেয়ানত করবেন। (সুরা আলে ইমরান : ১৬১)

২. তিনি তাঁদের নিকট এই মর্মে ওহি প্রেরণ করেছেন যে, পাপ করলে শাস্তি দেওয়া হয়, আর আনুগত্য করলে সওয়ার দেওয়া হয়। এই ওহি তাঁদেরকে গুনাহ থেকে বিরত রেখেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ.

সুতরাং আপনি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকবেন না, তা হলে আপনিও শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। (সুরা শুআরা : ২১৩)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ. اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ.

সুতরাং আপনাকে যে বিষয়ে আদেশ করা হচ্ছে, প্রকাশ্যে তার ঘোষণা দিন এবং মুশরিকদের এড়িয়ে চলুন। আপনার জন্য বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই যথেষ্ট। (সুরা হিজর : ৯৪-৯৫)

৩. আল্লাহ তাআলা কোনো সূক্ষ্ম অদৃশ্য জিনিস সামনে আনার মাধ্যমে, তাঁদের এবং গুনাহের মাঝে অন্তরাল হয়ে যান। যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনায়, আঙুল কামড়ে ধরা অবস্থায় ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আকৃতি প্রকাশিত হওয়া।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ.

এবং [হে নবি!] আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকলে, তাদের একটি দল তো আপনাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেই ফেলেছিল। (সুরা নিসা : ১১৩)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَـٰنَ رَبِّهِۦ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ.

সে তো তাঁকে [ইউসুফ আলাইহিস সালামকে] কামনা করেছিল, আর তাঁর [ইউসুফ আলাইহিস সালামের] মনেও তার [স্ত্রীলোকটির] প্রতি ইচ্ছা জাগ্রত হয়ে যেত, যদি-না সে নিজ রবের নিদর্শন দেখতে পেত। অসৎকর্ম ও অশ্লীলতাকে তাঁর থেকে দূরে রাখার জন্যই আমি এরূপ [করেছিলাম]। নিশ্চয়ই সে আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা ইউসুফ : ২৪)

রবের পক্ষ থেকে প্রমাণ দ্বারা উদ্দেশ্য

ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ [৫১০-৫৯৭ হি.] তাঁর তাফসিরগ্রন্থ 'যাদুল মাসিরে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'রবের পক্ষ থেকে প্রমাণ' সম্পর্কে ৬টি মত আছে।... ষষ্ঠ মত হলো, আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন এবং যা হারাম করেছেন, তা তাঁর স্মরণ হলো। ফলে যিনা হারাম হওয়ার বিষয়টি তাঁর সামনে ভেসে উঠলো।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর মন্তব্য

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তাঁর সম্পর্কে যে-সকল কথা বর্ণনা করা হয়- তিনি কাপড় খুলে ফেলেছেন, নারীর ওপর পুরুষের বসার মতো বসেছেন, এমন সময় হাত কামড়ানো অবস্থায় ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আকৃতি দেখেছেন। এ জাতীয় যতো বর্ণনা আছে, কোনোটাই আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেননি। এগুলো মূলত ইহুদিদের থেকে গৃহীত, যারা মানবেতিহাসে নবিদের ব্যাপারে সর্বনিকৃষ্ট মিথ্যাবাদী ও

নিন্দাকারী। মুসলমানরা এ ধরণের যা বর্ণনা করে, তা তাদের থেকেই গৃহীত। এগুলোর একটা অক্ষরও আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নয়।[১]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবি। তাঁর পর কোনো নবি নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ.

[হে মুমিনগণ!] মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, কিন্তু তিনি [হলেন] আল্লাহর রাসুল এবং নবিদের [ধারা] সমাপ্তকারী। (সুরা আহযাব : ৪০)

ইমাম বুখারি ও মুসলিম রাহিমাহুমাল্লাহ হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমার ও আমার পূর্বেকার নবিদের উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির [নির্মাণ-করা ঘরের] মতো, যে একটি ঘর বানালো, তারপর তাকে সজ্জিত করলো, এবং চমৎকার করে তুললো। তবে এক প্রান্তে একটি ইটের জায়গা ফাঁকা রাখলো। মানুষ সেই ঘরটি ঘুরে ঘুরে দেখে এবং মুগ্ধ হয়। আর বলে, এই ইটটি কেন রাখা হলো না! নবিজি বললেন, 'আমিই সেই ইট, আমিই শেষ নবি'।[২]

---

১. ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ রচিত الفتاوى الكبرى খ. ৫ পৃ. ২৬১।

২. সহিহ বুখারি : ৩৫৩৫, সহিহ মুসলিম : ৬১০১

তাঁর দাওয়াত সমগ্র মানবজাতি ও জিনজাতির জন্য ব্যাপক

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

[হে নবি!] আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমতরূপে পাঠিয়েছি। (সুরা আম্বিয়া : ১০৭)

জেনে রাখা ভালো, ডাক্তার যেমন কল্যাণকামিতার মানসিকতা থেকে রোগির অঙ্গ কাটা-ছেঁড়া করেন, তেমনি বিশ্বজগতের প্রতি কল্যাণকামিতার মনোভাব থেকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেককে হত্যাও করেছেন। তিনি একদিনেই আল্লাহর শত্রু বনু কুরাইজার ৬০০ থেকে ৯০০ ইহুদিকে জবাই করে বিশ্বজগতের প্রতি দয়া করেছেন। ৭২-৭৩ নং পৃষ্ঠায় 'সিরাতে ইবনে হিশাম'-এর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا.

মহিমাময় সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দার প্রতি [সত্য ও মিথ্যার মধ্যে] মীমাংসাকারী [কিতাব] নাযিল করেছেন, যাতে তা বিশ্ববাসীর জন্য হয় সতর্ককারী। (সুরা ফুরকান : ১)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে, আয়াতে لِلْعٰلَمِيْنَ [বিশ্ববাসী] শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য সকল মানুষ ও জিন।[১]

---

১. তাফসিরে তাবারিতে উল্লিখিত আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

তিনি এই বৈশিষ্ট্য এবং এ জাতীয় অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দ্বারা সকল নবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ওপরে উল্লিখিত আয়াতদুটিতে সকল নবি-রাসুলের ওপর আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি পরিষ্কার। পাশাপাশি আরো বহু গুণে তিনি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

আমি আপনার জন্য আপনার খ্যাতিকে করেছি সমুচ্চ। (সুরা ইনশিরাহ : ৪)

এ আয়াতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা এবং তাঁকে স্মরণ করার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে; সকল মাখলুকের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। ইমাম ইবনে হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি ইরশাদ করেছেন, জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার নিকট এসে বললেন, আমার ও আপনার প্রতিপালক আপনাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'কীভাবে আমি [আল্লাহ তাআলা] আপনার খ্যাতি উঁচু করেছি?' তিনি বললেন, আল্লাহই ভালো জানেন। জিবরাইল [আল্লাহর ভাষায়] বললেন, 'যখন আমার আলোচনা হবে, তখন আমার সঙ্গে আপনাকেও স্মরণ করা হবে।'[১]

এটি নবিজির আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ.

---

১. সহিহ ইবনে হিব্বান : ৩৩৮২, দ্বিতীয় প্রকাশ, مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ বৈরুত।

[স্মরণ করুন সে সময়ের কথা,] যখন আল্লাহ নবিগণ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমাহ দান করেছি, তারপর তোমাদের নিকট একজন রাসুল আগমন করবেন, যিনি তোমাদের কাছে যা [যে কিতাব] আছে তা সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা অবশ্যই তাঁর প্রতি ইমান আনবে এবং অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি [তাঁদেরকে] বললেন, তোমরা কি স্বীকার করেছ এবং এ ব্যাপারে আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ? তারা বলেছে, আমরা স্বীকার করেছি। তিনি বললেন, তবে তোমরা [একে অন্যের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে] সাক্ষী থাকো এবং আমি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত আছি। (সুরা আলে ইমরান : ৮১)

এ আয়াতে যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, তা হলো, আল্লাহ তাআলা সকল নবি থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তাঁরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ইমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। অন্য নবিদের উম্মতের কাছ থেকেও আল্লাহ তাআলা একই অঙ্গীকার নিয়েছেন।

এটি আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যসমূহ জানতে উদাহরণস্বরূপ দেখুন আল্লামা সুয়ুতি রাহিমাহুল্লাহ [৮৪৯-৯১১ হি.] রচিত 'আল-খাসাইসুল কুবরা' এবং শাইখ সালেহ আহমাদ শামি ফাক্কাল্লাহু আসরাহু[১] [১৯৩৪- ই.] রচিত 'মিন মায়িনিল খাসাইসিস নাবাবিয়্যাহ'।

---

১. ফাক্কাল্লাহু আসরাহু : আল্লাহ তাঁকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করুন। আমিন!

আমরা সকল নবি-রাসুল ও তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহের ওপর ইমান রাখি। [ইমান আনার ক্ষেত্রে] রাসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।

আমরা আল্লাহর সকল নবি, রাসুল ও তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহের ওপর ইমান রাখি। তাঁর রাসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। যেমনটি তিনি আমাদের আদেশ করেছেন–

إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ.

নিশ্চয় এটি [এই দীন হলো] তোমাদের দীন। একই দীন [অর্থাৎ তা সকল নবির দীন]।[১] আর আমি তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমার ইবাদত করো। (সুরা আম্বিয়া : ৯২)

অর্থাৎ হে মানুষেরা, তাওহিদের ঝাণ্ডাবাহী এই দীন, সকল নবি-রাসুলের দীন এবং তোমাদেরও দীন। সকল নবি-রাসুলই নিজ নিজ জাতিকে এই দীন তথা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন।

জেনে রাখুন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর তাওহিদ কেবল তাঁর অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ বিষয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ইয়াহুদি হোক আর খৃস্টান হোক,

---

১. মাদরাসার ছাত্রদের জন্য :

استُعمِلَت كلمةُ «الأُمَّة» ههنا بمعنى المِلَّة. و«هذه» اسمُ إِنَّ و«أُمَّتُكُم» خبَرُ إِنَّ، فمعنى «إنّ هذه أُمَّتُكُم» : إِنّ هذه المِلَّةَ [مِلَّةَ توحيدِ الأُلُوهِيَّة] هي مِلَّتُكُم. و«أُمَّةً واحدةً» وقعَت في التركيب حالًا مِن «هذه»، أيْ : إنّ مِلَّة توحيدِ الأُلُوهِيَّة حالَ كونِها مِلَّةَ جميعِ الرسل والأنبياء هي مِلَّتُكُم أيها الناسُ، فقد دعا جميع الرسل والأنبياءِ أُمَمَهم إلى توحيدِ الأُلُوهِيَّة.

যে ব্যক্তিই আমার রিসালাতের খবর শুনেছে অথচ আমার রিসালাতের ওপর ইমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, অবশ্যই সে জাহান্নামি হবে।[১]

সকল নবি, রাসুল ও তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহের ওপর ইমান আনা এবং তাঁর রাসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য না করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ.

রাসুল তার প্রতি ইমান এনেছেন, যা তাঁর ওপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিল করা হয়েছে, এবং [তাঁর সাথে] মুমিনগণও। তারা সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি ইমান এনেছে। [তারা বলে,] আমরা তাঁর রাসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না [যে, কারো প্রতি ইমান আনব এবং কারো প্রতি আনব না। বরং আমরা সকলের প্রতিই ইমান রাখি]। (সুরা বাকারা : ২৮৫)

১. সহিহ মুসলিম : ৪০৩

ওলিদের আলোচনা

ওলিদের কারামত সত্য। আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা কারামত দ্বারা সম্মানিত করেন। তিনি যাকে চান, তাঁকে নিজ রহমত বিশেষভাবে দান করেন। উল্লেখ্য, ওলি ওই সকল ইমানদারদেরকে বলা হয়, যারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে অবগত এবং নিজেদের ইমানের ক্ষেত্রে মুখলিস।

কারামত হলো স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত অলৌকিক কিছু বিষয়, যা নবি নন– এমন ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পায়।[১] কারামত বস্তুত প্রকাশ পায় এমন ব্যক্তি থেকে, যার সততা সর্বজনবিদিত, আকিদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ এবং যিনি নেক আমল করেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

যখনই যাকারিয়া ইবাদতখানায় তাঁর [মারইয়ামের] নিকট যেতেন, তাঁর নিকট কোনো রিযিক পেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মারইয়াম! তোমার নিকট এসব জিনিস কোত্থেকে আসে? সে বলল, তা আল্লাহর নিকট থেকে। (সুরা আলে ইমরান : ৩৭)

বিশিষ্ট তাবেয়ি মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ [২১-১০৪ হি.] বলেন, মারইয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট গ্রীষ্মকালের ফল শীতকালে, এবং শীতকালের ফল গ্রীষ্মকালে দেখা যেত।[২]

---

১. নবুওয়াতের দাবির সাথে যুক্ত হলে সেটা কারামাত নয়, মুজিযা। ১৫১ নং পৃষ্ঠায় আলোচনা আসছে।

২. তাফসিরে তাবারি।

আল্লাহ তাআলা সুরা কাহাফে আসহাবে কাহাফের যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তাও ওলিদের কারামতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا.

[তাদের দেখলে] তোমার মনে হত, তারা জাগ্রত, অথচ তারা ছিল নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাচ্ছিলাম ডানে ও বামে। আর তাদের কুকুর গুহামুখে সামনের পা দুটি ছড়িয়ে [বসা] ছিল। তুমি যদি তাদেরকে উঁকি মেরে দেখতে, তবে তুমি তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে। (সুরা কাহাফ : ১৮)

আউলিয়ায়ে কেরাম নিষ্পাপ নন

আসমাউর রিজালের গ্রন্থাবলিতে এবং সালাফ ও খালাফের আচরণবিধিতে এ ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, আউলিয়ায়ে কেরাম মাসুম বা নিষ্পাপ নন। তারা যা বলেন ও করেন, তার সব অনুসরণযোগ্য নয়। দারুল উলুম দেওবন্দ তার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে[১] কুরআন-সুন্নাহ বোঝা এবং আকাবির-আউলিয়ার অনুসরণের ক্ষেত্রে আকাবিরে দেওবন্দের কর্মপন্থা ও মূলনীতি স্পষ্টরূপে তুলে ধরেছে। সেখানে বলা হয়েছে :

---

১. তারিখ ৩, ৪, ৫ জুমাদাল উলা ১৪০০ হিজরি মোতাবেক ২১, ২২, ২৩ মার্চ ১৯৮০ ইসায়ি, শুক্র, শনি ও রবিবার।

আকাবিরে দেওবন্দের কর্মপন্থা ও মূলনীতি

'দারুল উলুম দেওবন্দের আকাবিরদের এই জা[illegible] কুরআন-সুন্নাহ থেকে আলোগ্রহণ ব্যতীত পূর্বসূরি আলেমদের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর করেননি। তারা সালাফের ইলমি ঐতিহ্য, রুচি ও নির্দেশনা থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে কুরআন-সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে নিজেদের মত-অভিমতের ওপর একগুঁয়ে হননি। বরং তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সালাফের অনুসরণ করা এবং সালাফের মত-অভিমত ও বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত ইলমি রুচির আলো গ্রহণ করে কুরআন-সুন্নাহর উদ্দেশ্য বোঝা। কিতাব ও রিজালের এই সমন্বয়ের ফলে তারা চিন্তা ও কর্মে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হননি।'[১]

অতএব এ মূলনীতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। বিশেষত যদি আপনি নিজেকে দেওবন্দি মনে করে থাকেন।

সায়্যিদুনা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাণী

সায়্যিদুনা আলি কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেছেন, ব্যক্তিদের মাধ্যমে হক চেনা যায় না। হক চেনো, তাহলে হকওয়ালাদের চিনতে পারবে।[২]

অতএব, আমরা যখন কিতাবুল্লাহ ও নবিজির সুন্নাহ আঁকড়ে ধরব, তখন হক চিনতে পারব। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। তা

---

১. এ অনুবাদের মূল আরবি ইবারতের জন্য, শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে দারুল উলুম থেকে প্রকাশিত الدَّاعِيْ সাময়িকীর ৮০ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২. তাফসিরে কুরতুবি, সুরা বাকারার ৪২ নম্বর আয়াতের তাফসির, আল্লামা যামাখশারি ও আবুল হাইয়ান আন্দালুসি রাহিমাহুমাল্লাহর সুরা ক্বাফ-এর ১৫ নম্বর আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনোই বিচ্যুত হবে না। তা হলো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবির সুন্নাহ।[১]

দীন বিকৃত হওয়ার একটি বিশেষ কারণ

এই পুস্তিকা [আল আকিদাতুল হাসানাহ]র লেখক তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কিতাবে দীন বিকৃত হওয়ার সাতটি মাধ্যম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো, ইসতিহসানুল মাশাইখ; অর্থাৎ আকাবিরগণ যা পছন্দ করেছেন, পরবর্তী প্রজন্ম তার সবকিছুকেই দীন মনে করা। এভাবেও দীন বিকৃত হয়।[২]

হজরত গাঙ্গুহির ভাষায় শরিয়তের দলিল

আল্লামা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহ [১২৪৪-১৩২৩ হি.] বলেছেন, আকাবির ও মাশাইখের উক্তি ও আমল শরিয়তের দলিল নয়। বরং দলিল হলো শরিয়ত-প্রণেতার উক্তি ও কর্ম, এবং মুজতাহিদ ইমামদের অভিমত।[৩]

আকাবিরের আমল কখন দলিলযোগ্য?

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাক্তন শাইখুল হাদিস মুফতি সাইদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ [১৩৬০-১৪৪১ হি.] বলেছেন, আকাবিরের আমল তখনই দলিলযোগ্য হবে, যখন তা কিতাব-সুন্নাহ ও কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত তিন প্রজন্ম কর্তৃক সমর্থিত হবে। সর্বাবস্থায়

---

১. মুআত্তা মালিক : ১৫৯৪, প্রকাশক : دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ العَرَبِيَّةِ মিশর।

২. حُجَّةُ اللهِ البَالِغَةُ খ. ১, পৃ. ৪০২, মাকতাবাতু হিজায দেওবন্দ, ১৪৩১ হি., ২০১০ ইসায়ি।

৩. الفَتَاوَى الرَّشِيْدِيَّةُ পৃ. ১১৭

আকাবিরের আমল মান্য করাকে আকাবিরের অনুসরণ বলা হয় না; আকাবির-পূজা বলা হয়।

অলৌকিক বিষয়াদির প্রকারভেদ

এখানে অলৌকিক বিষয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা তুলে ধরা উপযোগী মনে হচ্ছে। শাইখ নিদাল বিন ইবরাহিম আলু রশি মাতুরিদি হাফিজাহুল্লাহ[১] বলেন, অলৌকিক বিষয় ৭ প্রকার। ইরহাস, মুজিযা, ইহানাত, কারামত, মাউনাত, ইসতিদরাজ এবং সিহর[২]।

যদি নবুওয়াতের দাবিদার কোনো ব্যক্তি থেকে অলৌকিক কিছু প্রকাশ পায়, তা নবুওয়াতপ্রাপ্তির আগে হলে ইরহাস, নবুওয়াতপ্রাপ্তির পরে হলে মুজিযা। তবে শর্ত হলো, তা তাঁর নবি হওয়ার দাবির অনুকূল হতে হবে। যদি প্রকাশিত অলৌকিক জিনিসটি নবুওয়াতের শিক্ষার পরিপন্থি হয়, তাহলে তা ইহানাত এবং তাকযিব।

যদি ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবিদার না হয়, বরং নিজ সময়ের নবির অনুসারী হয়, তাহলে তিনি ওলি হয়ে থাকলে অলৌকিক বিষয়টি হবে কারামত। আর সাধারণ মানুষ হয়ে থাকলে বিষয়টি হবে মাউনাত। আর যদি সে নিজ জামানার নবির অনুসারী না হয়, বরং সাধনাকারী পাদ্রী হয়, তাহলে তার অলৌকিক জিনিসটিকে বলা হবে ইসতিদরাজ। কারণ, আল্লাহ তাআলা আমলকারীর প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

পক্ষান্তরে যদি কোনো অলৌকিক বিষয় কোনো মন্দ ও নিকৃষ্ট ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পায়, আর তা শেখা ও শেখানোর মাধ্যমে অর্জনযোগ্য হয়, তাহলে তা হবে সিহর [জাদু]। তবে বিশুদ্ধ অভিমত

---

১. نِضَال بن إبراهيم آل رشي

২. إِرْهَاص، مُعْجِزَة، إِهَانَة، كَرَامَة، مَعُوْنَة، اِسْتِدْرَاج، سِحْر

হলো, সিহর বা জাদু কোনো অলৌকিক বিষয় নয়, কারণ তা উপকরণ, উপার্জন ও শেখার মাধ্যমে অর্জিত হয়।[১]

কাঙ্ক্ষিত বিষয় ইসতিকামাত, কারামত নয়

মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, আবু আলি জুরজানি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ২৬৩ হি.] বলেন, তুমি ইসতিকামাত [দীনের ওপর অবিচলতা] অন্বেষী হও, কারামত অন্বেষণকারী হয়ো না। তোমার নফস কারামত তালাশে তৎপর; অথচ তোমার রব কামনা করেন তোমার ইসতিকামাত।

শাইখ সোহরাওয়ারদি রাহিমাহুল্লাহ [৫৩৯-৬৩২ হি.] 'আওয়ারিফুল মাআরিফ' কিতাবে লিখেছেন, এটি এই অধ্যায়ের একটি বড় মূলনীতি- অনেক সাধনাকারী ইবাদতগুজার ব্যক্তি পূর্ববর্তী সালাফে সালিহিনের কারামত ও অলৌকিক বিষয় সম্পর্কে শোনে। কিন্তু তাদের থেকে এমন কিছু প্রকাশ পায়নি। ফলে তাদের অন্তর সর্বদা এমন কিছু কামনা করে। তারা চায়, তাদের থেকেও যেন কারামত প্রকাশ পায়। হয়তো কারো অন্তর এই ভেবে ভেঙে পড়ে যে, তার আমল বিশুদ্ধ হয়নি বলেই সে কারামত পাচ্ছে না! যদি তারা এর রহস্য বুঝতে পারতো, তাহলে তাদের কাছে বিষয়টি সাধারণ মনে হতো।...

মোটকথা, মহাজাগতিক জিনিসের মাধ্যমে জ্ঞান উন্মোচন করার চেয়ে শরিয়তের দলিলের মাধ্যমে জ্ঞান উন্মোচন করা অধিক উত্তম। তাছাড়া দ্বিতীয়টি না থাকলে বা তাতে ঘাটতি হলে, তা দীনের ক্ষতি। বিপরীতে প্রথমটি না থাকলে কোনো সমস্যাই নেই; বরং কখনো কখনো না থাকাটাই বেশি উপকারী।[২]

---

১. المِنَحُ الإلهِيَّةُ شَرْحُ العقيدةِ الطَّحَاوِيَّةِ পৃ. ১২৪

২. شَرْحُ الفِقْهِ الأَكْبَرِ পৃ. ১৭০

ব্যক্তি যতো বড় ওলি, পীর কিংবা মুজাহিদই হোক-না কেন, তার শরয়ি দায়িত্ব রহিত হয় না। ফরজ কাজসমূহ আদায়ের দায়িত্ব তার ওপর সর্বদা বহাল থাকে। যতক্ষণ তার অনুভূতি সুস্থ ও সচেতন থাকে, কোনো হারাম বস্তু তার জন্য হালাল হয় না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ.

সুতরাং [হে নবি] তোমাকে যেভাবে আদেশ করা হয়েছে, সেভাবে নিজেও স্থির থাক এবং যারা তোমার সঙ্গে তাওবা করেছে, তারাও। (সুরা হুদ : ১১২)

তিনি আরো ইরশাদ করেন–

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.

নিজ পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ করো এবং নিজেও তাতে অবিচল থাকো। (সুরা তাহা : ১৩২)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন–

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.

মৃত্যু আসা-পর্যন্ত তোমার রবের ইবাদত করো। (সুরা হিজর : ৯৯)

এই আয়াতে মৃত্যুকে ইয়াকিন [সুনিশ্চিত] নামে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ, মৃত্যুর আগমন সুনিশ্চিত বিষয়। কেউ তা থেকে বাঁচতে পারবে না।

আমাদের নবিজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ সিরাত এবং সাহাবিদের পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত এ ব্যাপারে অতি স্পষ্ট প্রমাণ যে, ব্যক্তি যতো বড় ওলি, পীর কিংবা মুজাহিদই হোক-না কেন, তার শরয়ি দায়িত্ব মাফ হয় না। মৃত্যু পর্যন্ত সে শরিয়তের দায়িত্বপ্রাপ্তই থাকে। যতক্ষণ তার অনুভূতি সুস্থ ও সচেতন থাকে,

ততক্ষণ কোনো হারাম বস্তু হালাল হয় না এবং আল্লাহর অবাধ্যতা বৈধ হয় না। তবে বাধ্য ও অপারগ হলে ভিন্ন কথা।[১]

---

১. শরিয়তে 'ইকরাহ' [বাধ্য করা] কখন প্রমাণিত হয়, তা জেনে নেওয়া জরুরি। নিম্নে দুটি উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যাক–

এক. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ فَتْحُ الْبَارِيْ কিতাবের কিতাবুল ইকরাহ-তে লিখেছেন–

ইকরাহের অধ্যায়– ইকরাহ [বাধ্য করা] বলা হয় অন্যের ওপর এমন কিছু চাপিয়ে দেওয়া, যা সে চাচ্ছে না। ইকরাহ সাব্যস্ত হওয়ার শর্ত চারটি–

১. মুকরিহ [বাধ্যকারী] যার হুমকি দিচ্ছে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হওয়া এবং মুকরাহ [বাধ্য ব্যক্তি] তা প্রতিহত করতে অক্ষম হওয়া, চাই তা পলায়ন করার মাধ্যমেই হোক না কেন।

২. মুকরাহের [বাধ্য ব্যক্তির] প্রবল ধারণা হওয়া যে, যদি সে কাজটি করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে মুকরিহ তার প্রদান করা হুমকি বাস্তবায়ন করবে।

৩. যার হুমকি দিচ্ছে তা তাৎক্ষণিক হতে হবে। যদি এমন বলে, তুমি যদি এ কাজটি না কর, তাহলে তোমাকে আগামীকাল প্রহার করব, তা ইকরাহ [বাধ্য করা] হিসেবে ধর্তব্য হবে না। তবে ইকরাহ হিসেবে ধর্তব্য হবে যদি খুবই নিকটবর্তী সময়ের কথা উল্লেখ করে. বা সকলেই জানে, সে যা বলে তা করেই ছাড়ে।

৪. আদিষ্ট ব্যক্তির অন্যায় কাজটি স্বেচ্ছায় করার কোনো প্রমাণ না থাকতে হবে। যেমন, কোনো ব্যক্তিকে ব্যভিচার করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হলো। ফলে সে একান্ত নিরূপায় হয়ে প্রবেশ করাল। তারপর বের করে ফেলার তার সুযোগ ছিল। কিন্তু সে

নবুওয়াত সর্বাবস্থায় বিলায়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। সর্বশ্রেষ্ঠ ওলিও একজন সাধারণ সাহাবির মর্যাদায় পৌঁছুতে পারেন না। ওলিদের ওপর

মনে মনে ভাবল, বীর্যস্খলন হয়ে গেল কি-না। এটি ভাবতে ভাবতে বীর্যস্খলন পর্যন্ত বিলম্ব করে ফেলল। তাহলে সে মুকরাহ [বাধ্য] সাব্যস্ত হবে না। [فَتْحُ الْبَارِيْ খ. ১৬ পৃ. ২১১-২১২ দারু তায়বা সংস্করণ]

দুই. হানাফি মাজহাবের প্রখ্যাত ফকিহ আল্লামা ফখরুদ্দিন জাইলায়ি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৭৪৩ হি.] تَبْيِيْنِ الْحَقَائِقِ কিতাবে লিখেছেন–

ইকরাহ [চাপ প্রয়োগ] দু-প্রকার– ১. বাধ্যকারী। ২. বাধ্যকারী নয়। বাধ্যকারী হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ইকরাহ [চাপ প্রয়োগ]। আর তা হচ্ছে এমন শাস্তি দিয়ে অন্যায় কাজ করতে বাধ্য করা, যাতে সে জীবননাশ বা অঙ্গহানির আশঙ্কাবোধ করে। এমতাবস্থায় অন্যায় কাজটি করার প্রতি তার সন্তুষ্টি থাকে না। কাজটি করতে তার বাধ্য হওয়া প্রমাণিত হয় এবং ইচ্ছাশক্তি বাতিল হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে 'বাধ্যকারী নয়' হলো স্বল্পমাত্রার ইকরাহ। তা হলো, এমন শাস্তি দিয়ে অন্যায় কাজ করতে বাধ্য করা, যাতে সে জীবননাশ বা অঙ্গহানির আশঙ্কাবোধ করে না। যেমন, কঠিন প্রহার, বন্দিকরণ ও গ্রেফতারের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করা। কেননা এতে কাজটি করার প্রতি যদিও তার সন্তুষ্টি থাকে না, কিন্তু কাজটি করতে তার বাধ্য হওয়া প্রমাণিত হয় না এবং তার ইচ্ছাশক্তিও বাতিল হয় না। [تَبْيِيْنُ الْحَقَائِقِ খ. ৫ পৃ. ১৮১]

অর্থাৎ শরিয়তে ইকরাহ সাব্যস্ত হয় বাধ্যকারী 'চাপ প্রয়োগ' দ্বারা, যাতে বাস্তবিক অর্থেই ব্যক্তির আর কিছু করার থাকে না; সে একান্তই বাধ্য হয়ে যায়। 'চাপ প্রয়োগ' যদি এ পর্যায়ের না হয়, তাহলে তা দ্বারা ইকরাহ সাব্যস্ত হয় না।

সাহাবিদের শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচ্য হয় অধিক সওয়াব ও কবুলিয়াতের ভিত্তিতে, অধিক আমলের ভিত্তিতে নয়।

আল্লামা আকমালুদ্দিন বাবিরতি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কোনো ওলি কখনোই নবির মর্যাদায় পৌঁছুতে পারবে না। কারণ, ওলি হলেন নবির অনুসারী। আর অনুসারীর মর্যাদা অনুসৃত ব্যক্তির নিচেই থাকে। তাছাড়া প্রত্যেক নবিই ওলি ছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক ওলি নবি নন। নবিদের ভেতর নবুওয়াত এবং বিলায়াত, দুটি গুণই বিদ্যমান। ফলে তাঁরা ওলিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। লেখকের উপরোক্ত আলোচনায় কতক ভ্রান্ত সুফিবাদী লোকের খণ্ডন রয়েছে, যারা ওলি হওয়াকে নবুওয়াতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর শপথ, নবিদের পর আবু বকরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কারো ওপর সূর্য উদয় হয়নি এবং অস্ত যায়নি।' এই হাদিসের দাবী হলো, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল ওলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা নবি নন। অতএব, যেহেতু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল ওলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহলে নবিগণ তো অবশ্যই তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।[১]

---

১. شَرْحُ ال[illegible]ةِ الطَّحَاوِيَّةِ لِلْبَابِرْتِيِّ পৃ. ১৪৮

সাহাবিদের আলোচনা

আমরা আশারায়ে মুবাশশারা (সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন) [-এর জন্য জান্নাত ও কল্যাণের সাক্ষ্য প্রদান করি।]

ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ হজরত সাইদ বিন যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দশজন জান্নাতি- আবু বকর জান্নাতি। উমর জান্নাতি। উসমান, আলি, যুবাইর, তালহা, আবদুর রহমান, আবু উবাইদাহ ও সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস [জান্নাতি]'। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এই নয়জনের নাম বললেন এবং দশম ব্যক্তির ব্যাপারে চুপ রইলেন। লোকেরা বললো, হে আবুল আওয়ার! আমরা আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, দশম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তোমরা আমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে? আবুল আওয়ার জান্নাতি। আবু ইসা বলেন, আবুল আওয়ার হলেন সাইদ বিন যাইদ বিন আমর বিন নাওফাল।[১]

তাদের ছাড়া অন্য অনেকের জন্যও জান্নাতের সুসংবাদ প্রমাণিত রয়েছে। হয়তো একই হাদিসে দশজনের সুসংবাদ এসেছে বলে তাঁরা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

[আমরা] ফাতিমা, খাদিজা, আইশা, হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমের জন্য [জান্নাত ও কল্যাণের সাক্ষ্য প্রদান করি]। তাঁদের শ্রদ্ধা করি এবং ইসলামে তাঁদের মহান মর্যাদা স্বীকার করি।

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছেন, তুমি কি

---

১. সুনানুত তিরমিজি : ৩৭৪৮

এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি জান্নাতবাসী নারীদের সর্দারনি হবে? [কিংবা তিনি বলেছেন,] মুমিন নারীদের সর্দারনি হবে?[১]

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম নবিজির কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, এই হলো খাদিজা। একটি পাত্র হাতে সে আপনার নিকট আসবে। তাতে তরকারি, খাবার কিংবা পানীয় রয়েছে। যখন সে আপনার কাছে আসবে, তখন তাকে তাঁর প্রতিপালক ও আমার পক্ষ থেকে সালাম দিন। এবং তাঁকে জান্নাতে একটি বাঁশের [/বেতের] ঘরের সুসংবাদ দিন, যাতে থাকবে না কোনো ক্লান্তি ও হৈ-হুল্লোড়।[২]

ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ [২৭০-৩৫৪ হি.] আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, জান্নাতে আপনার স্ত্রী কারা হবে? তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাঁদের মধ্যে একজন।[৩]

ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হাসান ও হুসাইন জান্নাতি যুবকদের সর্দার।[৪]

---

১. সহিহ বুখারি : ৩৬২৪

২. সহিহ বুখারি : ৩৮২০

৩. সহিহ ইবনে হিব্বান : ৭০৯৬

৪. সুনানুত তিরমিজি : ৩৭৬৮

বদর ও বাইআতে রিযওয়ানের সদস্যদের জন্যও অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করি

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন, তুমি জানো কি? আল্লাহ তাআলা আহলে বদর [বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের] সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন। তিনি বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছে করো। তোমাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।[১]

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ হজরত উম্মে মুবাশশির রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট বলতে শুনেছেন, গাছের নিচে বাইয়াত গ্রহণকারীদের একজনও জাহান্নামে যাবে না।[২]

এ বাইয়াতকে বাইয়াতে রিদওয়ান বলা হয়। এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিলো চৌদ্দশত [১৪০০]। একে বাইআতে রিদওয়ান [সন্তুষ্টির আনুগত্য] বলার কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন–

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার নিকট বাাইআত গ্রহণ করছিল। (সুরা ফাতহ : ১৮)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন সত্য ইমাম। তারপর উমর, তারপর উসমান, তারপর আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুম। এরপর খিলাফাত পূর্ণ হয়ে গেছে।

বুখারি রাহিমাহুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

১. সহিহ বুখারি : ৬২৫৯

২. সহিহ মুসলিম : ২৪৯৬

ওয়াসাল্লামের যুগে আবু বকরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে মনে করতাম না। তারপর উমর, তারপর উসমান। এর পরে আমরা তাঁদের [সাহাবিদের] আপন অবস্থায় ছেড়ে দিতাম। তাঁদের মধ্যে কাউকে কারো ওপর প্রাধান্য দিতাম না।[১]

আর এ ব্যাপারে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের ইজমা রয়েছে যে, তাঁদের চতুর্থজন হলেন সায়্যিদুনা আলি কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু।

আল্লামা আকমালুদ্দিন বাবিরতি রাহিমাহুল্লাহ[২] লিখেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সত্য ইমাম হলেন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। শিয়ারা জুমহুর [অধিকাংশ] মুসলমানের বিরোধিতা করেছে। তাদের ধারণা, রাসুলের পর সত্য ইমাম আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু।

জুমহুর মুসলিমদের দলিল হলো, মুহাজির ও আনসার সাহাবিরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমামতের ওপর ইজমা করেছেন। ইমামত সাব্যস্ত করার পক্ষে এটি সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল। এই ইজমার ভিত্তি হলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী : ‘তোমরা আবু বকরকে আদেশ করো, সে যেন মানুষের সালাতের ইমামতি করে।’[৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ জীবদ্দশায় তাঁকে সালাতের ক্ষেত্রে খলিফা বানিয়েছেন। আর সালাত হলো দীনের সবচেয়ে বড় রোকন। অতএব তাঁর ইনতেকালের পরও সালাতে ও সালাতের বাইরে তাঁর খলিফা হওয়ার বিষয়টি অতি উত্তমভাবেই

---

১. সহিহ বুখারি : ৩৬৯৭

২. شَرْحُ العَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ পৃ. ১৪৩-১৪৪

৩. বুখারি, কিতাবুল আজান : ৩৯, ৪৬, ৪৭, মুসলিম, কিতাবুস সালাত : ৯০, ৯৪, ৯৮

বাকি থাকবে। এ কারণেই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমাদের দীনের ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল আপনার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন; আমরা কি আমাদের দুনিয়ার ব্যাপারে আপনার ওপর সন্তুষ্ট হব না?' তা ছাড়া নবিদের পর তিনিই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। এ ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর শপথ, নবিদের পর আবু বকরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কারো ওপর সূর্য উদিত হয়নি এবং অস্ত যায়নি।'[১]

যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফাত ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হলো, আর তিনি স্বয়ং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য খিলাফাতের অসিয়ত করেছেন, এবং সাহাবিরাও তাঁর হাতে বাইআত হতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন, ফলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফাত সাব্যস্ত হলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিকে ইশারা করেই বলেছেন, আমার পর আগত দুই ব্যক্তির অনুসরণ করো– আবু বকর ও উমর।[২]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মৃত্যুর সময় কাউকে খলিফা বানানিনি। বিষয়টি জান্নাতের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত ছয়জন সাহাবির শুরার ওপর অর্পণ করে দিয়েছেন। তাঁরা হলেন, উসমান, আলি, আবদুর রহমান

---

১. মুসনাদু আহমাদ ফি ফাদাইলিস সাহাবা : ১৩৫, মুসনাদু আবদ বিন হুমাইদ : ২১২। ইবনু আবি আসেম কিতাবুস সুন্নাহ [১৩৫]তে আনআন ইবনে জুরাইজের সূত্রসমূহে বর্ণনা করেছেন। তিনি আতা থেকে, তিনি আবুদ দারদা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আবু বকরের সামনে হাঁটতে দেখে বললেন, 'হে আবুদ দারদা, তুমি কি এমন লোকের সামনে হাঁটছো, যে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার চেয়ে উত্তম? নবি ও রাসুলগণের পর আবু বকরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কারো ওপর সূর্য উদিত হয়নি এবং অস্ত যায়নি।'

২. সুনানুত তিরমিজি, কিতাবুল মানাকিব : ১৬, ৩৭

বিন আউফ, তালহা, যুবাইর এবং সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম। আবদুর রহমান বিন আউফ হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত দিয়েছেন, এবং শুরার বাকি সদস্যরা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। ফলে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফাত সাহাবিদের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

এরপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শহিদ হলেন। তিনিও কাউকে খলিফা নিযুক্ত করে যাননি। তখন আহলে শুরার বাকি সদস্যসহ অন্যান্যরা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফাতের ওপর ইজমা করেছেন। তাঁদের বাইআতের ভিত্তিতে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফাত সংঘটিত হয়েছে।

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর খিলাফাত সমাপ্ত হয়েছে। কারণ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পর খিলাফাত ৩০ বছর।[১]

তারপর এসেছে ক্ষমতার লড়াইয়ের রাজত্ব

ইমাম আবু বকর বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ [৩৮৪-৪৫৮ হি.] 'শুআবুল ইমান' কিতাবে মুআজ ও আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'এই বিষয়টির [অর্থাৎ দীনের] সূচনা হয়েছে রহমত ও নবুওয়াতরূপে। এরপর হবে রহমত ও খেলাফত। তারপর হবে ক্ষমতার লড়াইয়ের রাজত্ব। তারপর হবে কঠোরতা, যুদ্ধাস্ত্র ও উচ্ছৃঙ্খলতা। তারা রেশমী কাপড় পরিধান করা, মদ পান করা ও [অবৈধভাবে নারীদের] লজ্জাস্থান [উপভোগ করা]কে হালাল

---

১. তিরমিজি, কিতাবুল ফিতান। আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ। মুসনাদু আহমাদ। আল্লামা আকমালুদ্দিন বাবিরতি রাহিমাহুল্লাহর আলোচনা এখানে সমাপ্ত হয়েছে।

মনে করবে। আল্লাহ তাআলার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে এ সুযোগ দেওয়া হবে এবং তারা [সর্বপ্রকার] সাহায্যও পেতে থাকবে।[১]

'আল আকিদাতুল হাসানাহ' পুস্তিকার লেখক তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কিতাবে লিখেছেন, নবুওয়াত সমাপ্ত হয়েছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের মাধ্যমে, তরবারি-বিহীন খিলাফাত সমাপ্ত হয়েছে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার মাধ্যমে, [নববি তরিকার] খিলাফাত সমাপ্ত হয়েছে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত এবং হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক খিলাফাত ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে। 'ক্ষমতার লড়াইয়ের রাজত্ব' হলো, মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকালের পর বনু উমাইয়ার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অত্যাচার-অনাচার। দাপট ও কঠোরতা হলো, বনু আব্বাসের খিলাফাত। কারণ, তারা খিলাফাত বিন্যস্ত করেছে কাইসার ও কিসরার রীতিতে।[২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তারপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ইমাম বুখারি ও মুসলিম রাহিমাহুমাল্লাহ তাঁদের সহিহ গ্রন্থে হজরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যাতুস সালাসিল যুদ্ধে [শেকলের যুদ্ধে] সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নিকট সর্বচেয়ে প্রিয় মানুষ কে? তিনি বললেন, 'আইশা'। আমি বললাম, পুরুষদের

---

১. শুআবুল ইমান, হাদিস নং : ৫২২৮, প্রথম প্রকাশ : ১৪২৩ হি./২০০৩ ই., প্রকাশক : مُؤَسَّسَةُ الرُّشْدِ لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيْعِ রিয়াদ।

২. حُجَّةُ اللهِ الْبَالِغَةُ ২/৬৩৩, প্রকাশক : মাকতাবাতু হিজায দেওবন্দ, ভারত।

মধ্যে কে? তিনি বললেন, 'তার পিতা' [আবু বকর]। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাব'।[১]

শ্রেষ্ঠত্ব বলতে আমরা বংশ, বীরত্ব, শক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি সবদিকের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাই না। বরং উদ্দেশ্য হলো, ইসলাম তাঁদের মাধ্যমে বেশি উপকৃত হয়েছে।

উম্মাহর আমির হলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর উজির হলেন, সত্য প্রচারে উচ্চাভিলাষী আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটি কাজ ছিল– এক. তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে [দীন] গ্রহণ করতেন। দুই. মাখলুকের নিকট তা পৌঁছাতেন। মাখলুকের নিকট [দীন] পৌঁছানো, তাদের মধ্যে মিল-মহব্বত পয়দা করা এবং [হক প্রতিষ্ঠার জন্য] যুদ্ধ পরিচালনা [প্রভৃতি] ক্ষেত্রে তাঁদের [আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার] বড় ভূমিকা রয়েছে।

আমরা আমাদের জিহ্বাকে সাহাবিদের ভালো ব্যতীত অন্য কিছু বলা থেকে বিরত রাখি। দীনি বিষয়ে তাঁরা আমাদের ইমাম ও নেতা। তাঁদের শ্রদ্ধা করা ওয়াজিব, নিন্দা করা হারাম।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা [ইমান গ্রহণে] প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। তিনি তাঁদের

---

১. সহিহ বুখারি : ৩৬৬২, সহিহ মুসলিম : ৬৩২৮

জন্য এমন উদ্যানরাজি তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহর বহমান। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য। (সুরা তাওবা : ১০০)

তিনি আরো ইরশাদ করেন–

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি খুশি হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার নিকট বাইআত গ্রহণ করছিল। (সুরা ফাতহ : ১৮)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন–

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ۚ اُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِيْ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

وَالَّذِيْنَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْاِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ اٰمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

['ফাই'-এর সম্পদ] সেই মুহাজির গরিবদের প্রাপ্য, যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি ও অর্থ-সম্পদ থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সন্ধান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাহায্য করে। ওরাই সত্যবাদী।

['ফাই'-এর সম্পদ তাদেরও প্রাপ্য] যারা পূর্ব থেকেই এ নগরে [অর্থাৎ মদিনায়] ইমানের সাথে অবস্থানরত আছে। যারা হিজরত করে তাদের কাছে আসে, তাঁদেরকে তাঁরা ভালোবাসে এবং যা তাঁদেরকে [অর্থাৎ মুহাজিরদেরকে] দেওয়া হয়, তার জন্য নিজেদের অন্তরে কোনো প্রয়োজন বোধ করে না। তাঁরা নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়,

যদিও তাঁদের অভাব-অনটন থাকে। যারা স্বভাবের কার্পণ্য হতে মুক্তি লাভ করে, ওরাই সফলকাম।

এবং ['ফাই'-এর সম্পদ তাঁদেরও প্রাপ্য] যারা তাঁদের [অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারদের] পরে এসেছে। তাঁরা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা করো আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও, যারা আমাদের আগে ইমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ইমানদারদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু। (সুরা হাশর : ৮-১০)

উল্লিখিত আয়াতসমূহ মুহাজির, আনসার, আহলে বদর, আহলে বাইআতে রিদওয়ান -যারা গাছের নিচে বাইআত গ্রহণ করেছেন- এবং যারা সোহবতের মর্যাদা লাভ করেছেন, এমন সকল সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশংসার প্রমাণ বহন করে। তাঁদের পরে যারা এসেছে তাঁদের ব্যাপারে আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, তাঁরা পূর্বের সাহাবিদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে এবং আল্লাহর কাছে দুআ করে, যেন তিনি তাঁদের অন্তরে ইমানদারদের প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ না রাখেন।

এ আয়াতগুলোসহ অন্যান্য আয়াত-হাদিসে সাহাবিদের মর্যাদার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যেমন, তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তি, মহা সাফল্য অর্জন ইত্যাদি; এবং তাঁদের প্রশংসা ও উত্তম গুণাবলির যে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে, যেমন, ভালোবাসা, আত্মত্যাগ, শ্রদ্ধা, দানশীলতা, মুসলিম ভাইদের ভালোবাসা এবং দীনের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানো ইত্যাদি, এগুলো বলে শেষ করা সম্ভব নয়।[১]

---

১. أُصُوْلُ الإيمانِ فِي ضَوْءِ الكتابِ والسُّنَّةِ পৃ. ২৮৫-২৭৬

ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবু হারুন আবদি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১৩৪ হি.] থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা আবু সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এলাম। তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত মোতাবেক তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ তোমাদের অনুসরণ করবে। দিগ্‌দিগন্ত হতে তোমাদের কাছে লোকেরা দীন শিখতে আসবে। যখন তারা আসবে, তখন তাদের প্রতি কল্যাণ কামনা করবে।[১]

ইমাম বুখারি ও মুসলিম রাহিমাহুমাল্লাহ তাঁদের সহিহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার সাহাবিদের গালি দিয়ো না। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণও খরচ করে, তবু তাদের কারো এক মুদ[২] পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না, তার অর্ধেক পর্যন্তও পৌঁছাতে পারবে না।[৩]

হাদিসটি যেমনিভাবে সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমকে গালি দেওয়া হারাম হওয়ার প্রমাণ পেশ করছে, তেমনি এ ব্যাপারেও জোর তাকিদ দিচ্ছে যে, সাহাবায়ে কেরামের পর কোনো ব্যক্তি -যতই আমল করুক না কেনো- তাঁদের মর্তবায় পৌঁছুতে পারবে না।

পূর্বে বলা হয়েছে, উহুদ পাহাড় দৈর্ঘে ৭ কিলোমিটার এবং প্রস্থে ৩০০ মিটার। এটি মদিনা শহরকে উত্তর দিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছে।

১. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৫০

২. এক মুদ = ৬০০ গ্রাম।

৩. সহিহ বুখারি : ৩৬৭৩, সহিহ মুসলিম : ৬৬৫১

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সকল সাহাবিকে ন্যায়পরায়ণ মনে করেন। তবে নিষ্পাপ মনে করেন না। যে বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে, সে বিষয়ে তারা চুপ থাকেন।

১৬৪-১৬৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত, সুরা তাওবার ১০০ নম্বর আয়াত, সুরা ফাতহের ১৮ নম্বর আয়াত, সুরা হাশরের ৮, ৯ ও ১০ নম্বর আয়াত এবং এ জাতীয় বহু আয়াত ও হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণিত যে, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সকলেই ন্যায়পরায়ণ এবং সত্যবাদী।

অবশ্য আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত তাঁদের নিষ্পাপ হওয়ার আকিদা পোষণ করেন না। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِيْنًا. وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا.

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের ওপর লানত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন লাঞ্ছনাকর শাস্তি। আর যারা মুমিন নর ও নারীদেরকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করবে। (সুরা আহযাব : ৫৭-৫৮)

আল্লাহ তাআলা দ্বিতীয় আয়াতে শাস্তির বিষয়টিকে 'বিনা অপরাধে' বলে বিশেষায়িত করেছেন। প্রথম আয়াতে আল্লাহ ও রাসুলকে কষ্ট দেওয়ার বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেননি। কারণ, আল্লাহ ও রাসুলকে কষ্ট দেওয়া সর্বদাই অন্যায়, কিন্তু মুমিনদের কষ্ট দেওয়া সর্বদা অন্যায় নয়। সাহাবিরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব মুমিনদের কষ্ট দেওয়া কখনো অন্যায়রূপে হয়ে থাকে। যেমন, অপবাদ দেওয়া, মিথ্যাচার করা ইত্যাদি। আর কখনো কষ্ট দেওয়া হয় হকের কারণে। যেমন, হদ ও তাযির বাস্তবায়ন করা। এর মাধ্যমেই বোঝা যায়, সাহাবিগণ নিষ্পাপ তথা মাসুম নন।

কতক সাহাবি থেকে যেসকল স্খলন প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এগুলো হয়তো তাঁদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে হয়েছে। দম্ভ ও জেদবশত ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে হয়নি। তাঁদের প্রতি সুধারণার ভিত্তিতে আমরা ধরে নেব, তাঁরা উত্তম পরিণতির দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'সর্বোত্তম প্রজন্ম হলো আমার প্রজন্ম।'[১] তিনি আরো ইরশাদ করেন, 'যখন আমার সাহাবিদের আলোচনা হবে, তখন তোমরা নিবৃত্ত থাকো।'[২]

এ কারণে জুমহুর উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত হলো, উসমান ও আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ফিতনার পূর্বে যেমন সাহাবিরা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, অনুরূপ তার পরেও। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'আমার সাহাবিরা তারকার মতো, তাঁদের মধ্য থেকে যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে, তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।' দারেমি, ইবনে আদি এবং অন্যান্যরা এটি বর্ণনা করেছেন।[৩]

---

১. কানযুল উম্মাল ১১/৩২৪৫১। সহিহ বুখারি (২৬৫২) ও সহিহ মুসলিমের (৬৬৩৫) শব্দ হলো, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার প্রজন্ম।

২. কানযুল উম্মাল : ১/৯০১।

৩. এই হাদিসের শব্দ অনেক দুর্বল। ইমাম আবদুল হাই লাখনবি রাহিমাহুল্লাহ [১২৬৪-১৩০৪ হি.] তাঁর تُحْفَةُ الأَخْيَارِ فِيْ إِحْيَاءِ سُنَّةِ سَيِّدِ الأَبْرَارِ গ্রন্থের শুরুতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে এই হাদিসের মর্ম সহিহ মুসলিমের নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত রয়েছে। সহিহ মুসলিমের ৬৬২৯ নং হাদিসে রয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

'তারকারাজি আসমানের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। তারকারাজি যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আসমানের জন্য ওয়াদাকৃত বিষয় আসন্ন হয়ে যাবে। আর আমি আমার সাহাবিদের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। আমি যখন বিদায়

ইবনু দাকিকিল ইদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'আকিদা'য় লিখেছেন, সাহাবিদের পরস্পর মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব সম্পর্কে যেসকল কথা বর্ণিত হয়েছে, তার কতক তো মিথ্যা ও ভুল, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। আর যেগুলো বাস্তব, আমরা তার ভালো ব্যাখ্যা করব। কারণ, পূর্ব হতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের প্রশংসা রয়েছে। পরবর্তীতে যেসকল কথা বর্ণিত হয়েছে, সবই ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। আর সন্দেহযুক্ত ও ধারণাকৃত বস্তু নিশ্চিত ও জানা বিষয়কে বাতিল করতে পারে না।[১]

আবু নুয়াইম আসফাহানি রাহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফিই রাহিমাহুল্লাহ [১৫০-২০৪ হি.] থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ [৬১-১০১ হি.] রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, সিফফিন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি বলেছেন, তা এমন রক্ত, আল্লাহ তাআলা আমার হাতকে যা থেকে নিরাপদ রেখেছেন। এখন আমি আমার জিহ্বা সে রক্তে রঞ্জিত করতে চাই না।[২]

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাঁরা পূর্বে গত হওয়া এক জাতি। তাঁরা যা অর্জন করেছেন, তা তাঁদের জন্য। তোমরা যা অর্জন করেছো, তা তোমাদের জন্য। তাঁরা যা করেছে, সে ব্যাপারে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে না।[৩]

নেব, তখন আমার সাহাবিদের ওপর ওয়াদাকৃত বিষয় আসন্ন হবে। আমার সাহাবিরা আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। যখন তাঁরা বিদায় নেবেন, তখন আমার উম্মতের ওপর ওয়াদাকৃত জিনিস এসে পড়বে।'

১. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৫৪

২. حِلْيَةُ الأَوْلِياءِ وطَبَقَاتُ الأَصْفِيَاءِ খ. ৯, পৃ. ১১৪, প্রকাশকাল : ১৪০৯ হি., প্রকাশক : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ রচিত مِنْهَاجُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ খ. ৬, পৃ. ২৫৪

৩. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৫৪

ইমান, কুফর ও তাকফির প্রসঙ্গ

ইমান হলো মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্তরে বিশ্বাস করার নাম

আগে আমাদের ইমানের অক্ষ সম্পর্কে জানতে হবে; যাকে কেন্দ্র করে ইমান আবর্তিত হয়। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, '... ইমান ও কুফরের পার্থক্যরেখা হলো, ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র ইসলামের আনুগত্যকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেওয়া।'[১] যখন কেউ নিজের ওপর

---

১. اِلْتِزَامُ الطَّاعَةِ مَعَ الرَّدْعِ وَالتَّبَرِّيْ عَنْ دِيْنٍ سِوَاهُ, আল্লামা কাশমিরির এ বক্তব্যে সেসকল ব্যক্তিবর্গের জন্য সতর্কবার্তা রয়েছে, যারা তাগুত বর্জন করে না, বা ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের নিকটবর্তী করার চেষ্টা করে। পাঠকবৃন্দ সুযোগ হলে উদাহরণস্বরূপ নিম্নের লিংকগুলো দেখতে পারেন–

https://www.youtube.com/watch?v=ia5rbafPV_w
https://www.youtube.com/watch?v=tLCNMUxJCwM
https://youtu.be/-6ekQWkFinc
https://www.youtube.com/watch?v=5bNoMLIwi3c

প্রথম লিংকের ৯ মিনিট পরবর্তী অংশ দ্রষ্টব্য।

'ঈমান সবার আগে' বইয়ে এসেছে, তাগুতের অর্থ আল্লাহর ঐ বিদ্রোহী বান্দা, যে আল্লাহর মোকাবিলায় নিজেকে বিধানদাতা মনে করে এবং মানুষের ওপর তা কার্যকর করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে কোনো তাগুত ব্যক্তি বা দলের বানানো আইনকানুন হচ্ছে সত্য দীন ইসলামের বিপরীতে বিভিন্ন ধর্ম, যা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা ছাড়া ঈমান সাব্যস্ত হয় না। আল্লাহর বিরুদ্ধে কিংবা আল্লাহর সাথে তাগুতের উপাসনা বা আনুগত্য করা কিংবা তা বৈধ মনে করা, তদ্রূপ আল্লাহর দীনের মোকাবিলায় বা তার সাথে তাগুতের আইন-কানুন গ্রহণ করা বা গ্রহণ

ইসলামের আনুগত্যকে আবশ্যক করে নেয়, তখন সে কুফরের ভ্রান্তি থেকে বের হয়ে ইসলামের হেদায়েতে প্রবেশ করে।

আবু তালিব, হিরাক্লিয়াস ও কিতাবিরা কাফের কেন?

অতএব এখন আপনার সামনে সেসব কাফেরের কুফরির কারণ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা, যারা দীনকে চেনার ও সত্যায়নের পরও কাফের! কারণ, আবু তালিব প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনের সত্যতার ঘোষণা দেওয়ার পরও ইসলামের আনুগত্যকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয়নি, তাই সে দীনের বাইরে রয়ে গেছে। সে নিজেই বলেছে, 'যদি নিন্দা ও গালির ভয় না থাকতো...'। সে লজ্জার ওপর জাহান্নামকে প্রাধান্য দিয়েছে।

অনুরূপ হিরাক্লিয়াসের ঘটনা। যদিও সে রাসুলের সাক্ষাতের কামনা করেছিল, দূর থেকে তাঁকে সম্মান করেছিল, কিন্তু সে রোমবাসীদেরকে চূড়ান্ত পর্যায়ের ভয় করেছিল! এ কারণে সে ইসলামের আনুগত্যকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয়নি।

এমনিভাবে সেসকল কাফেরদের ব্যাপারটিও অনুরূপ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, তারা সত্যটা জানতো; তা সত্ত্বেও তারা তা বর্জন করেছে। ইসলামকে নিজেদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে মেনে নেয়নি।

এ কারণেই আমি বলি, ইমান হলো একটি ইচ্ছা। উর্দু ভাষায় এর অর্থ হলো, মেনে নেওয়া (৮৮)। এটিই ইমানের সঠিক ব্যাখ্যা।

করাকে বৈধ মনে করা, সরাসরি কুফর ও শিরক। তাগুত ও তার বিধি-বিধান থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ছাড়া ঈমানের দাবি নিফাক ও মুনাফেকি। [ঈমান সবার আগে, পৃ. ৬৭, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৮ খ্রি. লেখক : মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক।]

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ ইমানের অধ্যায়ে এই অংশটি[১] ইমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা নকল করেছেন। এজন্য ফুকাহায়ে কেরামের উক্তিসমূহে ইকরার বা স্বীকৃতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 'ইসলামের আনুগত্যকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেওয়া'র স্বীকৃতি। যদি স্বীকারোক্তি দ্বারা কেবল শাহাদাতাইন-এর স্বীকারোক্তি উদ্দেশ্য হয়, যেমনটি প্রসিদ্ধ, তা হলে সংশয় বাকি থেকে যায়।[২]

মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা

এবার আসি মূলপাঠের ব্যাখ্যায় 'ইমান হলো জবানে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্তরে বিশ্বাস করার নাম'। মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইকরার' [তথা জবানে স্বীকৃতি দেওয়া]কে আগে আনার কারণ হলো, ইমান প্রকাশের ক্ষেত্রে এর ভূমিকাই প্রথম; যদিও ইমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য দ্বিতীয়টি [অন্তরে বিশ্বাস করা] আগে থাকতে হয়। তাছাড়া শরিয়তপ্রণেতা মুমিন-মুনাফিক ও সৎ-অসতের মাঝে পার্থক্য না করে [দুনিয়ার] বিধানের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দানকেই যথেষ্ট মনে করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর বাণী

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ 'আল ওয়াসিয়্যাহ' কিতাবে বলেন, ইমান হলো, জবানে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্তরে বিশ্বাস করা। শুধু স্বীকৃতির নাম ইমান নয়। কারণ, এমনটি হলে সকল মুনাফিক মুমিন হয়ে যেতো। অনুরূপ শুধু আল্লাহকে চেনা, তথা অন্তরে বিশ্বাস

---

১. অর্থাৎ ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম হতে নিবৃত্ত ও মুক্ত হয়ে একমাত্র ইসলামের আনুগত্যকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেওয়া।

২. فَيْضُ البَارِيْ عَلَى صحيح البخارِيِّ খ. ১, পৃ. ১২৬, دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّة বৈরুত।

করার নামও ইমান নয়। কারণ, এমনটি হলে সকল আহলে কিতাব মুমিন হয়ে যেতো।

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন–

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ.

আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। (সুরা মুনাফিকুন : ১)

অর্থাৎ তারা ইমানের দাবীর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী; তারা মুমিন নয়।

আহলে কিতাবদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ.

যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে [রাসুলকে] চেনে, যেরূপ চেনে তাদের ছেলে-সন্তানদেরকে। (সুরা আনআম : ২০)

অর্থাৎ আহলে কিতাবরা যেহেতু আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, তাদের ও সকল সৃষ্টিজগতের প্রতি রাসুল হিসেবে আগমনের বিষয়টি মেনে নেয়নি; তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কেবল চেনা তাদের কোনো উপকারে আসেনি। তাদের ধারণা ছিল, তিনি কেবল আরবের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। অতএব এভাবে তাদের স্বীকৃতি দেওয়াটা সঠিক নয়।

মুখে ইমানের স্বীকারোক্তি না দেওয়া কখন বিশ্বাস বদলে ফেলার নামান্তর?

'অন্তরে বিশ্বাস করা' একটি স্বয়ংসম্পন্ন রোকন। কোনো অবস্থাতেই তা বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে 'মুখে স্বীকার করা' একটি শর্ত কিংবা অংশ। বহিরাগত কারণে তাকে রোকন সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই 'ইকরাহ' ও 'ওযর'-এর সময় তা রহিত হয়ে যায়। কেননা, জবান হলো অন্তরের মুখপাত্র।

ফলে এটিই স্বীকৃতি থাকা না-থাকার দলিল। তাই কেউ যদি ইমান প্রকাশের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্বীকৃতি বদলে ফেলে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

ইকরাহের কারণে ইমান প্রকাশের সামর্থ্য না থাকলে কাফের হবে না। কারণ, এক্ষেত্রে ভয়ের বিষয়টিই এ কথার দলিল যে, তার অন্তরে ইমানের স্বীকৃতি বাকি আছে। তখন মূলত নিজের থেকে অনিষ্ট দূর করার প্রয়োজনে স্বীকৃতি বদলে ফেলা হচ্ছে, বাস্তব ইমানকে বদলে ফেলা হচ্ছে না। নিম্নোক্ত আয়াতে এদিকেই ইশারা করা হচ্ছে–

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ইমান আনার পর কুফরি করল, –তবে সে ব্যক্তি নয়, যাকে কুফরির জন্য বাধ্য করা হয়েছে এবং তার অন্তর ইমানের ব্যাপারে প্রশান্ত, বরং সেই ব্যক্তি, যে কুফরির জন্য নিজ হৃদয় খুলে দিয়েছে,– তাদের ওপর রয়েছে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (সুরা নাহল : ১০৬)

যেহেতু ইমান প্রকাশের সামর্থ্য থাকাকালীন স্বীকৃতি বদলে ফেলার অর্থ হলো, বিশ্বাস বদলে ফেলা; সুতরাং বোঝা গেল, স্বীকৃতি হলো থাকা না-থাকার বিবেচনায় ইমানের রোকন। যেমনটি বলেছেন শামসুল আইম্মাহ সারাখসি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৪৯০ হি.]। তবে উমদাহ গ্রন্থের লেখক আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন মাহমুদ নাসাফি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৭১০ হি.] বলেছেন, স্বীকারোক্তি হলো বিধান প্রয়োগের শর্ত। এই মতটি আশআরিরা গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রাহিমাহুল্লাহও [মৃ. ৩৩৩ হি.] এই মত গ্রহণ করেছেন।[১]

---

১. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৮০-১৮২

মৌখিক স্বীকৃতি ইমানের শর্ত ও অঙ্গ হওয়ার বিশ্লেষণ

হজরত হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রাহিমাহুল্লাহ 'ফুরুউল ঈমান' কিতাবে লিখেছেন–

ইমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ইমানের বাস্তবায়ন সকল হকপন্থীর নিকটই জরুরি। তবে ইমানের মৌখিক স্বীকৃতি এবং তাকে কার্যে পরিণত করা ইমানের অঙ্গ, নাকি শর্ত? অর্থাৎ ইমানের ভেতরের বিষয়, নাকি বাইরের বিষয়, এটি একটি আলোচনাসাপেক্ষ ব্যাপার। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এ মতবিরোধ নিছক উপস্থাপনের ভিন্নতা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, মৌখিক স্বীকৃতি ছাড়া ইমান অস্তিত্ব লাভ করে না। তাই বোঝা গেল, মৌখিক স্বীকৃতি ইমানের শর্ত হওয়া বা অঙ্গ হওয়ার দ্বারা তার পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কারণ, কোনো জিনিসই তার শর্ত বা অঙ্গ অস্তিত্ব লাভ করা ছাড়া অস্তিত্ববান হয় না।

তাই যিনি মৌখিক স্বীকৃতিকে ইমানের শর্ত বলেছেন, তিনি বাহ্যিক বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য তা বলেছেন। আর যিনি একে ইমানের অঙ্গ বলেছেন, তিনি একথাও স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, এটি অতিরিক্ত একটি অঙ্গ যা বিলুপ্ত হতে পারে। তাই এ মতবিরোধ কেবলই উপস্থাপনের ভিন্নতা মাত্র। অন্যথায় অর্থের দিক থেকে উভয় পক্ষ একই বিষয়ের প্রবক্তা। অর্থাৎ মৌখিক স্বীকৃতি ইমানের হাকিকতের ভিত্তি নয়। পক্ষান্তরে মৌখিক স্বীকৃতি ছাড়া ইসলামের বিধিবিধানও প্রয়োগ করা হয় না। এ বিষয়টিকেই কেউ শর্ত বলেছে, কেউ অঙ্গ বলেছে। আর পরিভাষার ক্ষেত্রে এ ধরনের মতবিরোধের সুযোগ রয়েছে।[১]

---

১. 'ফুরুউল ঈমান' পৃ. ৬২

আমল ও ইমানের ভিন্নতার বিবরণ

মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল ওয়াসিয়্যাহ' কিতাবে রয়েছে, আমল ও ইমান ভিন্ন ভিন্ন দুটি বিষয়। এর দলিল হলো, অনেক সময় মুমিন বান্দা থেকে আমল রহিত হয়ে যায়, তখন এ কথা বলা যায় না যে, তার ইমান চলে গেছে! যেমন হায়েযগ্রস্ত নারীর থেকে সালাতের বিধান উঠিয়ে নেওয়া হয়। তখন এ কথা বলা যায় না যে, 'তার ইমান চলে গেছে', অথবা 'তাকে ইমান ছাড়ার আদেশ করা হয়েছে'! এ সময় শরিয়ত তাকে বলে, 'রোজা ছেড়ে দাও, পরবর্তীতে তা কাযা করে নাও'। তাকে এ কথা বলা যাবে না যে, 'ইমান ছেড়ে দাও, পরবর্তীতে ইমান কাযা করে নাও'! অনুরূপ এ কথা বলা যাবে, 'দরিদ্র ব্যক্তির ওপর যাকাতের বিধান নেই'। তবে এ কথা বলা যাবে না যে, 'দরিদ্র ব্যক্তির ওপর ইমানের বিধান নেই'!

মোটকথা, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট আমল ও ইমান ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। আমল ইমানের কোনো অংশ বা রোকন নয়, যেমনটি মুতাযিলারা বলে থাকে। এর দলিল হলো, কুরআন পাকে ইমান ও আমলের মধ্যে যে সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে তা তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার দাবি করে। পবিত্র কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে- 'اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا' [তারা ইমান এনেছে এবং আমল করেছে।][১]

১. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৮৭। ইমান ও আমলের মাঝে এ ধরণের সংযোজক অব্যয় সুরা বাকারার ২৫, ৮২, ২৭৭ নং আয়াত ছাড়াও ৩১টি সুরায় ৪৪ স্থানে রয়েছে।

আল্লামা বাবিরতির ব্যাখ্যা

বাবিরতি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমল বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ইমান শর্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

আর যে ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে। (সুরা তহা : ১১২)

শর্ত ও শর্তযুক্ত বস্তু[১] দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। এ ছাড়াও যখন জিবরিল আলাইহিস সালাম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইমানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন তিনি কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের প্রতি স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলেছেন। সে হাদিসে তিনি বলেছেন, '[ইমান হলো,] তুমি আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রাসুল ও আখেরাতের ওপর ইমান আনবে। এবং ইমান আনবে ভালো-মন্দ তাকদিরের ওপর।' অতএব যদি স্বীকৃতির পাশাপাশি আমলও ইমানের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অবশ্যই স্পষ্ট করে বলে দিতেন।[২]

আমল ইমানের শর্ত ও অঙ্গ হওয়ার বিশ্লেষণ

হজরত হাকিমুল উম্মত থানবি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন–

আমল ইমানের ভেতরের অঙ্গ, নাকি বাইরের অঙ্গ, এ মতবিরোধটিও বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখলে একটি শাব্দিক মতবিরোধ মাত্র। কারণ, যারা আমলকে ইমানের ভেতরের অঙ্গ বলেন, তাঁরা এ কথাও স্বীকার করেন যে, নেক আমল ছেড়ে দেওয়া দ্বারা ইমান বিলুপ্ত হয় না। তাই বোঝা গেল, তাঁদের মতে ইমান দ্বারা পরিপূর্ণ ইমান উদ্দেশ্য, যা ইমানের সাথে আমলের সমন্বয় হলেই অর্জন হয়। আর

---

১. الشرط والمشروط

২. شَرْحُ العَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ لِلْبَابِرْتِيِّ পৃ. ১০৮-১০৯

যারা আমলকে বাইরের অঙ্গ বলেন, তাঁরা ইমান দ্বারা কেবলমাত্র অন্তরের বিশ্বাসকে বুঝিয়েছেন।

অতএব ইমানের দুটি অর্থ হলো,

১. পরিপূর্ণ ইমান, যা অন্তরের বিশ্বাস ও আমলের সমন্বয়ে লাভ হয়। যে ইমান জাহান্নামে প্রবেশ করা থেকে পরিত্রাণ দেবে।

২. শুধু অন্তরের বিশ্বাস, যা চিরতরে জাহান্নামি হওয়া থেকে পরিত্রাণ দেবে।[১]

ইমানের অপরিহার্য দাবি ও শর্তসমূহ মোটামুটি নিম্নরূপ–

ইমানের অপরিহার্য দাবি ও শর্তসমূহ

১. কালিমায়ে তাইয়িবার অর্থ জানা। (সুরা মুহাম্মদ : ১৯)

২. কালিমায়ে তাইয়িবার ভাব ও মর্মের প্রতি সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখা। (সুরা হুজুরাত : ১৫)

৩. আন্তরিকভাবে কালিমার মর্ম গ্রহণ করা। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা এবং সকল গায়রুল্লাহর উপাসনা বর্জন করা। (সুরা আস-সাফফাত : ৩৫-৩৬)

৪. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কালিমার মর্মের সামনে আত্মসমর্পণ করা। (সুরা লুকমান : ২২)

৫. সত্য মন নিয়ে কালিমার স্বীকৃতি প্রদান করা। (সুরা মুনাফিকুন : ১)

৬. শিরকের যাবতীয় কলঙ্ক থেকে আমল পবিত্র করা। (সুরা মুমিন/গাফির : ১৪)

৭. কালিমা, কালিমার মর্ম ও তা অনুযায়ী আমলকারীদের ভালোবাসা। (সুরা বাকারা : ১৬৫)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ইমান ও নেক আমলের জন্য কবুল করুন। আমিন!

---

১. 'ফুরুউল ঈমান' পৃ. ৬২-৬৩

ইমান ভঙ্গের কারণ

ইমান ভেঙ্গে গেলে মুমিন ব্যক্তি কাফেরে পরিণত হয়। আর কাফের হওয়ার পরিণতি -আল্লাহর পানাহ- চিরস্থায়ী জাহান্নাম। তাই ইমান ভঙ্গের কারণসমূহ জানা খুবই প্রয়োজন। ইমান ভঙ্গের কারণগুলো ৪ ভাগে বিভক্ত[১]-

১. বিশ্বাসসংশ্লিষ্ট কারণ।

২. উক্তিসংশ্লিষ্ট কারণ।

৩. কর্মসংশ্লিষ্ট কারণ।

৪. দীনের অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয়ে সন্দেহ।

১. বিশ্বাসসংশ্লিষ্ট কারণগুলো মোটামুটি নিম্নরূপ-

ক. ইসলামের প্রমাণিত কোনো বিষয়কে আন্তরিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা।

খ. অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত কোনো হারামকে হালাল কিংবা হালালকে হারাম মনে করা।

গ. সত্তা ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করা।

ঘ. আল্লাহর দীন থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকা। অর্থাৎ সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করা।[২]

---

১. শাইখ হারিস বিন গাজি নায্যারি [মুহাম্মদ বিন আবদুল কাদের মুরশিদি] রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ২০১৫ ই.] রচিত كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ : فَضَائِلُهَا، شُرُوْطُهَا، حَقِيْقَتُهَا، أَرْكَانُهَا، نَوَاقِضُهَا কিতাব দ্রষ্টব্য।

২. সেকুলারিজম সংজ্ঞাগত দিক থেকে 'ধর্মরিপেক্ষতা' হলেও ফলগত দিক থেকে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। এ ধর্মের সাংবিধানিক মাপকাঠি হলো হিউম্যানিজম [মানববাদ]। এই ধর্মের প্রভু হলো মানুষ এবং জ্ঞানের উৎস হলো বিবেক।

ঙ. একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে সকল ক্ষমতার উৎস মনে না করা। [সূরা ইউসুফ : ৪০, সূরা আহযাব : ৩৬]

চ. দীনের প্রমাণিত কোনো হুকুমকে অপছন্দ করা কিংবা তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

২. ইমান ভঙ্গের উক্তিসংশ্লিষ্ট কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ-

ক. আল্লাহ, রাসুল অথবা দীনকে গালি দেওয়া, উপহাস করা।

খ. আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে এমন কাজে ডাকা, যা দান করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নেই।

গ. নবুওয়াত দাবি করা।

ঘ. দীনের কোনো অকাট্য বিধানকে অস্বীকার করা।

সেকুলারিজম নিজেই একটি ধর্মের বিধান কার্যকর করার অধিকার রাখে। সে অন্যান্য ধর্মের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সকল ধর্মের অনুশাসনকে সে নিজস্ব মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করে। সে যদিও মুখে বলে যে, সব ধর্ম তার স্বাধীনতা পাবে, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সেকুলারিজম একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে তার ধর্মে ঘোষিত সকল হালাল গ্রহণ করতে এবং সকল হারাম বর্জন করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তার নিজস্ব হালাল-হারাম তথা বৈধতা-অবৈধতার ধারণা আছে। সেই ধারণার ভিত্তিতেই সে প্রতিটি বিষয়ের অনুমোদন দিয়ে থাকে। তার নিজস্ব বৈধতার ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক যেকোনো বিষয় সে বেআইনি এবং বাতিল করে দিতে পারে।

মোটকথা, একটি ধর্মের পূর্ণ অর্থ সেকুলারিজমে বিদ্যমান আছে। তাই সেকুলারিজম কখনোই ধর্মনিরপেক্ষতা নয়; বরং সে নিজেই একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। 'হিউম্যান বিয়িং' পৃ. ১২৫ দ্রষ্টব্য। উল্লেখ্য, সংজ্ঞাগত দিক থেকেও সেকুলারিজম/ধর্মনিরপেক্ষতা [তথা রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করা] সুস্পষ্ট কুফর হওয়ার ব্যাপারে উম্মাহর সালাফ-খালাফ একমত। প্রাগুক্ত ১১৪-১১৬।

৩. **ইমান ভঙ্গের কর্মসংশ্লিষ্ট কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ-**

ক. গায়রুল্লাহর জন্য কোনো ইবাদত করা। যেমন- কুরবানি ও মানত।

খ. আল্লাহর বিপরীতে আইন প্রণয়ন করা। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, কেউ যখন শরিয়তের সর্বসম্মত কোনো বৈধ জিনিসকে অবৈধ আখ্যা দেয়; কিংবা সর্বসম্মত কোনো অবৈধ জিনিসকে বৈধ আখ্যা দেয়; অথবা সর্বসম্মত কোনো বিধানকে পরিবর্তন করে, সে উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে কাফের।[১]

গ. তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থনা করা।

যে ব্যক্তির প্রতিপক্ষ তাগুতি আদালতেই আইনগত ব্যবস্থা নিতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু সে জানে, অন্য পদ্ধতিতেও প্রতিপক্ষ থেকে নিজের হক সে উদ্ধার করতে পারবে, তার পরও যদি সে তাগুতি আইনের শরণাপন্ন হয়, তাহলে তার এ কাজটি তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থনা করা হিসেবে বিবেচিত হবে।

তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থনা করা সাব্যস্ত হওয়ার আরেকটি পদ্ধতি হলো, যেখানে আল্লাহর বিধান ও তাগুতি বিধান উভয়টি বিদ্যমান আছে, সেখানে তাগুতি আদালতের শরণাপন্ন হওয়া।[২]

---

১. مَجْمُوْعُ الفَتَاوَى খ. ৩ পৃ. ২৬৭

২. آسان ترجمۂ قرآن কিতাবে সুরা নিসা-র ৬০ নং আয়াতের অধীনে রয়েছে, 'আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মুখে নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসুলের বিধানাবলির ওপর অন্য কোনো বিধানকে প্রাধান্য দেয়, তার মুসলমান থাকার সুযোগ নেই।'

ঘ. মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করা। [সুরা মায়িদা : ৫১]

স্মর্তব্য, ফকিহগণ তাঁদের রচনাবলিতে ইমান ভঙ্গের অনেক উক্তি ও কর্ম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের উল্লিখিত কিছু উক্তি ও কর্ম এমন, যা ইমানের উল্লিখিত অপরিহার্য দাবি ও শর্তসমূহের সঙ্গে সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিক। এ হিসেবে সেগুলো ইমান ভঙ্গের কারণ হিসেবে বিবেচিত।

আর কিছু উক্তি ও কর্ম এমন, যা সরাসরি ইমানের অপরিহার্য দাবি ও শর্তসমূহের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, তবে তাতে কুফর অপরিহার্যকারী প্রধান তিন কারণের যেকোনো এক বা একাধিক কারণ পাওয়া যায়। এ হিসেবে সেগুলো ইমান ভঙ্গের কারণ হিসেবে বিবেচিত। কুফর অপরিহার্যকারী প্রধান তিন কারণ হলো–

কুফর অপরিহার্যকারী তিন কারণ

১. দীনের প্রমাণিত কোনো হারামকে হালাল মনে করা।

২. দীনের সম্মানিত কোনো জিনিসকে অবজ্ঞা করা।

৩. দীনের প্রমাণিত কোনো জিনিসকে উপহাস করা।

মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'শারহু আলফাজিল কুফরি' কিতাবটিতে, কুফর অপরিহার্যকারী এই তিন কারণের এক বা একাধিক কারণ পাওয়া যায়– এমন অসংখ্য উক্তি ও কর্মের বিবরণ ও ব্যাখ্যা রয়েছে।[১]

আল্লামা কাশমিরির ভাষায় একটি সংশয় নিরসন

আমাদের সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে, 'কোনো ব্যক্তি শতকরা ৯৯ ভাগ কুফরিতে লিপ্ত থেকে মাত্র এক ভাগ ইমানের মধ্যে

---

১. شَرْحُ أَلْفَاظِ الْكُفْرِ কিতাবটি মাহাদের 'আকিদা ও তাওহিদ বিভাগে'র পাঠ্যভুক্ত।

থাকলে, তাকে কাফের বলা যাবে না'। এ ব্যাপারে ইমামুল আসর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহিমাহুল্লাহর 'ফাইযুল বারি' কিতাব থেকে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা উপযোগী মনে হচ্ছে। তিনি বলেছেন–

জেনে রাখো, আমাদের ফিকহের কিতাবসমূহে রয়েছে, 'যার মধ্যে কুফরির ৯৯টি দিক রয়েছে এবং ইসলামের একটি দিক রয়েছে, তার ওপর কুফরের হুকুম দেওয়া হবে না।' ফিকহে যাদের জ্ঞান-গভীরতা নেই, তাদের কতক লোক এই উক্তিকে গুলিয়ে ফেলে এবং এর উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করে। তাদের ধারণা, 'কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত সংখ্যক [৯৯টি] কুফরি কাজ করলে এবং একটি ইসলামের কাজ করলে, সে কাফের হবে না!' এই ধারণা বাতিল, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। আর এটা কিভাবে সম্ভব? যেখানে একজন মুসলমান একটা কুফরি কাজ করলেই কাফের হয়ে যায়! সেখানে যার অধিকাংশ কাজই কুফরি, তার অবস্থা কী হতে পারে?

ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনা ছিলো উক্তি সম্পর্কে। লোকেরা সেটাকে কর্মের মধ্যে প্রয়োগ করেছে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো, যদি কেউ এমন কোনো কথা বলে, যাতে শরিয়তসম্মত একটি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে আমরা এটাকেই গ্রহণ করবো। কুফরির সম্ভাবনাগুলোকে বর্জন করবো, যদিও তা পরিমাণে অনেক হয়। কারণ, যতক্ষণ আমাদের নিকট প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট নয় এবং আমরা জানি না, সে এই সম্ভাবনা উদ্দেশ্য নিয়েছে কি না, ততক্ষণ ওই সম্ভাবনাপূর্ণ শব্দের কারণে আমরা তার ওপর কুফরির হুকুম দেবো না এবং তাকফির করতে উদ্যোগী হবো না...

যদি ফকিহদের উদ্দেশ্য তাই হয়ে থাকে, যা এই ব্যাধিগ্রস্থ বা মূর্খরা বুঝেছে, তাহলে কোনোদিনই কারো ওপর কুফরির হুকুম আরোপ হতো না! সামান্য একটা সম্ভাবনা বের করতে কে না পারবে? মুসাইলিমাতুল কাজ্জাবও তো আমাদের নবিজির নবুওয়াতকে স্বীকার

করেছে! সে তো কেবল চেয়েছে নবুওয়াতে আমাদের নবিজির অংশিদার হতে! এ বিষয়টা কী তাকে কুফর ও ভ্রান্তি থেকে রেহাই দিয়েছে?[১]

ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের নিকটবর্তী করার চেষ্টাকারীদের ব্যাপারে ফতোয়া

ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের নিকটবর্তী করার চেষ্টা করা বর্তমান সময়ের একটি কুফরি কর্ম। ইসলামের ইউনিফর্ম ধারণকারী যেসকল লোক ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের নিকটবর্তী করার[২] চেষ্টা করে, আন্তঃধর্মীয় ঐক্যের[৩] আহ্বান জানায়, তাদের সম্পর্কে সৌদিআরবের 'ইলমি গবেষণা ও ফতোয়া প্রদান বিষয়ক স্থায়ী কমিটি' নিম্নবর্ণিত ফতোয়া প্রদান করেছে–

স্থায়ী কমিটির ফতোয়া

এক আল্লাহ তাআলার জন্যই সকল প্রশংসা। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষনবি ও তাঁর সাহাবি এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁদের যথাযথ অনুসরণকারী সকলের ওপর।

পরসমাচার, আন্তঃধর্মীয় ঐক্যের আহ্বান বিষয়ে আগত কিছু প্রশ্নমালা এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ গবেষণা ও পর্যালোচনার পর, 'ইলমি গবেষণা ও ফতোয়া প্রদান বিষয়ক স্থায়ী কমিটি' নিম্নোক্ত ফতোয়া প্রদান করছে–

এক. ইসলামের মৌলিক ও সর্বসম্মত একটি আকিদা হলো, ইসলাম ছাড়া পৃথিবীতে কোনো সত্য ধর্ম নেই। ইসলাম আসার পর

---

১. فَيْضُ البَارِيْ عَلَى صَحِيْحِ البُخَارِيِّ খ. ৬, পৃ. ৪০১-৪০২, প্রথম প্রকাশ : ১৪২৬ হি., প্রকাশক : دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ বৈরুত।

২. التَّقْرِيْبُ بَيْنَ الأَدْيَانِ

৩. وَحْدَةُ الأَدْيَانِ

পূর্বের সকল শরিয়ত রহিত হয়ে গিয়েছে। এ কারণে ইসলাম ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্ম নেই, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা গ্রহণযোগ্য হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اَلۡيَوۡمَ اَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِيۡنَكُمۡ وَاَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِىۡ وَرَضِيۡتُ لَكُمُ الۡاِسۡلَامَ دِيۡنًا.

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম। এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম। (সুরা মায়িদা : ৩)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

وَمَنۡ يَّبۡتَغِ غَيۡرَ الۡاِسۡلَامِ دِيۡنًا فَلَنۡ يُّقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِى الۡاٰخِرَةِ مِنَ الۡخٰسِرِيۡنَ.

যে কেউ ইসলাম ছাড়া ভিন্ন কোনো ধর্ম অনুসন্ধান করবে, তার থেকে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। (আলে ইমরান : ৮৫)

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর ইসলাম সেটাই; যা নিয়ে তিনি আগমন করেছেন। অন্য কোনো ধর্ম ইসলাম নয়।[১]

---

১. **ইসলামই ছিল প্রত্যেক যুগে আল্লাহর একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম :**

বস্তুত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম। সুরা আলে-ইমরান : ১৯ দ্রষ্টব্য। প্রত্যেক নবি ইসলামেরই দাওয়াত দিয়েছেন। সুরা আম্বিয়া : ৯২ দ্রষ্টব্য। ইহুদি-নাসারারা নিজেদেরকে ইহুদি-নাসারা নামকরণ করেছে। সুরা মায়িদা : ১৪, সুরা বাকারা : ১৩৫ দ্রষ্টব্য। আল্লাহ তাআলা হজরত মুসা ও হজরত ইসা আলাইহিমাস সালামের প্রকৃত অনুসারীদেরকে ইহুদি ও নাসারা নামকরণ করেননি। ফেরাউনও মৃত্যুর সময় নিজের মুসলমান হওয়ার দাবি করেছে। সুরা ইউনুস : ৯০ দ্রষ্টব্য।

প্রত্যেক নবি ও তাঁদের প্রকৃত অনুসারীদের পরিচয় মুসলিম ছিল। উদাহরণস্বরূপ হজরত নুহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে দেখুন সুরা ইউনুস : ৭২। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে দেখুন সুরা বাকারা : ১৩২। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে দেখুন সুরা

দুই. ইসলামের আরেকটি মৌলিক আকিদা হলো, কুরআন পাক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ কিতাব। এর দ্বারা পূর্ববর্তী তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল প্রভৃতি সমস্ত কিতাব রহিত হয়ে গিয়েছে। পাক কুরআন পূর্বেকার সকল কিতাবের নিয়ন্ত্রক। সুতরাং বর্তমানে পবিত্র কুরআন ব্যতীত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কোনো কিতাব অবশিষ্ট নেই, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَاَنۡزَلۡنَاۤ اِلَیۡکَ الۡکِتٰبَ بِالۡحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡهِ مِنَ الۡکِتٰبِ وَمُهَیۡمِنًا عَلَیۡهِ فَاحۡکُمۡ بَیۡنَهُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَکَ مِنَ الۡحَقِّ.

আমি তোমার নিকট সত্যসম্বলিত কিতাব [কুরআন] অবতীর্ণ করেছি, তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষণকারীরূপে। অতএব তাদের মধ্যে সেই বিধান অনুসারেই বিচার করো, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। তোমার নিকট যে সত্য এসেছে তা থেকে বিমুখ হয়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। (সুরা মায়িদা : ৪৮)

তিন. এই আকিদা লালন করা আবশ্যক যে, কুরআন পাকের মাধ্যমে তাওরাত ও ইঞ্জিল রহিত হয়ে গিয়েছে। এবং সেগুলোতে

ইউসুফ : ১০১। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে দেখুন সুরা ইউনুস : ৮৪। হজরত ইসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে দেখুন সুরা আলে-ইমরান : ৫২। সকল নবির ভাষায় দেখুন সুরা বাকারা : ১৩৬। সুতরাং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ তাআলার প্রতি এবং তার সময়ে প্রেরিত নবির প্রতি ইমান এনেছে, সে মুসলিম।

আমাদের নবিজি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরিয়তের মাধ্যমে যেহেতু পূর্বের সকল শরিয়ত রহিত হয়ে গেছে, তাই বর্তমানে একমাত্র তাঁর আনীত দীন ও শরিয়তই ইসলাম; অন্য কোনো ধর্ম বা শরিয়ত ইসলাম নয়।

নানারকম বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধন হয়েছে। অনেক কিছুর সংযোজন ও বিয়োজন ঘটেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ.

নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কারণে আমি তাদের লানত করেছি [রহমত থেকে বিতাড়িত করেছি] এবং তাদের অন্তরসমূহ কঠিন বানিয়ে দিয়েছি। তারা কথাসমূহকে তার আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেয়। তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তার একটি [বড়] অংশ তারা ভুলে গিয়েছে। তুমি তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেরই কোনো না কোনো বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে জানতে থাকবে। (সুরা মায়িদা : ১৩)

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন,

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ.

সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে, তারপর [মানুষকে] বলে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে, যাতে এর দ্বারা সামান্য মূল্য ক্রয় করতে পারে। সুতরাং তাদের হাত যা লিখেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস। এবং তারা যা উপার্জন করছে তার জন্য তাদের ধ্বংস। (সুরা বাকারা : ৭৯)

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন,

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

তাদেরই মধ্যে একটি দল এমন আছে, যারা কিতাব পড়ার সময় নিজেদের জিহ্বাকে পেঁচায়, যাতে তোমরা [তাদের পেঁচিয়ে তৈরি করা]

সে কথাকে কিতাবের অংশ মনে কর। অথচ তা কিতাবের অংশ নয়। তারা বলে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে [অবতীর্ণ]। অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে [অবতীর্ণ] নয়। [এভাবে] তারা জেনেবুঝে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। (আলে ইমরান : ৭৮)

এই কারণে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের যা সঠিক ছিল, তা ইসলাম দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। এর বাইরে যা আছে, তার সবই বিকৃত অথবা পরিবর্তিত। হাদিসে রয়েছে, হজরত ওমর রাজিআল্লাহু আনহুর নিকট একটি পুস্তিকা ছিল, যাতে তাওরাতের কিছু অংশ ছিল। নবিজি তা দেখে রাগান্বিত হয়ে ইরশাদ করেছেন, 'হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি সন্দেহে আছে? আমি কি শরিয়ত স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বলরূপে নিয়ে আসেনি? আমার ভাই মুসা বেঁচে থাকলে, আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর উপায় থাকত না'।[১]

চার. ইসলামের অন্যতম একটি মৌলিক আকিদা হলো, আমাদের নবি ও রাসুল হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবি ও রাসূল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ.

[হে মুমিনগণ!] মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, কিন্তু তিনি [হলেন] আল্লাহর রাসুল এবং নবিদের [ধারা] সমাপ্তকারী। (সুরা আহযাব : ৪০)

তাই হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের বাইরে গিয়ে অন্য কোনো নবির অনুসরণ করার সুযোগ নেই। যদি পূর্বের কোনো নবি জীবিত থাকতেন, তবে আমাদের নবিজির অনুসরণ করা ব্যতীত তাঁর উপায় থাকত না। তাঁর অনুসারীদেরও আমাদের নবিজিরই আনুগত্য করতে হতো, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

---

১. মুসনাদে আহমদ, সুনানে দারেমি প্রভৃতি।

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ.

[স্মরণ করুন সে সময়ের কথা,] যখন আল্লাহ নবিগণ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমাহ দান করেছি, তারপর তোমাদের নিকট একজন রাসুল আগমন করবেন, যিনি তোমাদের কাছে যা [যে কিতাব] আছে তা সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা অবশ্যই তাঁর প্রতি ইমান আনবে এবং অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি [তাঁদেরকে] বললেন, তোমরা কি স্বীকার করেছ এবং এ ব্যাপারে আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ? তারা বলেছে, আমরা স্বীকার করেছি। তিনি বললেন, তবে তোমরা [একে অন্যের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে] সাক্ষী থাকো এবং আমি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত আছি। (সুরা আলে ইমরান : ৮১)

আল্লাহর নবি ইসা আলাইহিস সালাম যখন শেষ যামানায় অবতরণ করবেন, তখন তিনি আমাদের নবিজির অনুসরণ করবেন এবং তাঁর শরিয়ত অনুসারে বিচার করবেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

যারা রাসুলের অর্থাৎ উম্মি নবির অনুসরণ করে, যার আলোচনা তারা তাদের নিকট তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করেন এবং মন্দকাজ থেকে বারণ করেন, এবং তাদের জন্য উত্তম জিনিস হালাল করেন এবং মন্দ জিনিস হারাম করেন, এবং তাদের থেকে বোঝা ও বেড়ি নামান যা তাদের উপর

চাপানো ছিল। অতএব যারা তাঁর প্রতি ইমান এনেছে, তাঁকে সম্মান করেছে, সাহায্য করেছে এবং সেই নুরের অনুসরণ করেছে, যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, ওরাই সফলকাম। (সুরা আরাফ : ১৫৭)

তাছাড়া ইসলামের অন্যতম একটি মৌলিক আকিদা হলো, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর সকল মানুষের নবি হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

[হে নবি!] আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের জন্য একজন সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা। (সুরা সাবা : ২৮)

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا.

[হে রাসুল!] বলো, হে লোকসকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। (সুরা আরাফ : ১৫৮)

পাঁচ. ইসলামের একটি মৌলিক আকিদা হলো এই বিশ্বাস রাখা যে, ইহুদি, খ্রিস্টান প্রমুখ যারাই ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারা সকলেই কাফের; যাদের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে[১] তাদেরকে 'কাফের' নামে নামকরণ করা, তারা আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসুল ও

---

১. قِيَامُ الحُجَّةِ। তথা দলিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হলো, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট দলিল পৌঁছা। পৌঁছার দুটি অর্থ, ১. প্রকৃতপক্ষেই তার অবগতিতে আসা। ২. তার এমন স্থানে থাকা, যেখানে থাকার কারণে দলিলটি অবগত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব। আলেমগণ শরিয়তের মূলনীতি বিষয়ক তাঁদের গ্রন্থাবলীতে সুস্পষ্টভাষায় বলেছেন, যেমন ইমাম শিহাবুদ্দিন কারাফি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৬৮৪ হি.] লিখেছেন, 'যে অজ্ঞতা মুকাল্লাফ ব্যক্তির দূর করা সম্ভব, তা অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ওজর গণ্য হয় না।' [الفُرُوقُ। খ. ৪, পৃ. ২৬৪ এবং খ. ২, পৃ. ১৪৯-১৫১]

মুমিনদের দুশমন, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ.

কিতাবি ও মুশরিক কাফেররা নিবৃত্ত হওয়ার ছিল না, যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসে। (সুরা বাইয়িনা : ১)

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ.

কিতাবি ও মুশরিক কাফেররা জাহান্নামের আগুনে যাবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ওরাই সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ। (সুরা বাইয়িনা : ৬)

আল্লাহ তাআলা নবিজির ভাষায় ইরশাদ করেছেন,

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ.

আমার প্রতি এ কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে আমি তা দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট তা পৌঁছাবে তাদেরকে সতর্ক করি। (সুরা আনআম : ১৯)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, هٰذَا بَلٰغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ.

এটি [এই কুরআন] মানুষের জন্য একটি বার্তা এবং [তা এই জন্য দেওয়া হচ্ছে যাতে] এর মাধ্যমে তারা সতর্ক হয়। (সুরা ইবরাহিম : ৫২)

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ইহুদি হোক আর খ্রিস্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার রিসালাতের সংবাদ শুনেছে অথচ আমার রিসালাতের ওপর ইমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, অবশ্যই সে জাহান্নামি হবে।[১]

---

১. সহিহ মুসলিম : ৪০৩

এ কারণেই যে ব্যক্তি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাফের মনে করবে না, সে কাফের। কারণ, শরিয়তের মূলনীতি হলো, 'যে ব্যক্তি দলিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কাফেরকে কাফের মনে করবে না, সে কাফের।'

ছয়. ইসলামের উল্লিখিত মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস এবং শরিয়তের সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের বিরুদ্ধে গিয়ে 'আন্তঃধর্মীয় ঐক্যে'র আহ্বান জানানো, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার কথা বলা, এক ধর্মকে অপর ধর্মের নিকটবর্তী হওয়ার আওয়াজ উত্তোলন করে সকল ধর্মকে এক কাঠামো ও ফরমায় নিয়ে আসার চেষ্টা করা, এক ধূর্ত ও প্রতারণাপূর্ণ আহ্বান। এর উদ্দেশ্য সত্যকে মিথ্যার সাথে গুলিয়ে ফেলা, ইসলামকে ধ্বংস করা, ইসলামের স্তম্ভগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা এবং মুসলমানদেরকে গণ ধর্মত্যাগের দিকে নিয়ে যাওয়া। এ যেন মহান আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর বাস্তবতা,

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا.

[কাফেররা] তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের নিজেদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। (সূরা বাকারা : ২১৭)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً.

তারা কামনা করে, তারা নিজেরা যেভাবে কুফর অবলম্বন করেছে, তোমরা তেমনি কাফের হয়ে যাও। ফলে তোমরা পরস্পর সমান হয়ে যাবে। (সূরা নিসা : ৮৯)

সাত. নিকৃষ্টতম এই আহ্বানের অন্যতম ফল হলো, ইসলাম ও কুফর, হক ও বাতিল, ভালো ও মন্দের পার্থক্য-রেখা মিটিয়ে দেওয়া, এবং মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যকার ঘৃণার বাধা ভেঙ্গে ফেলা। ফলে শত্রুতা-মিত্রতা এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বাণী উঁচু করার জন্য জিহাদ ও কিতালের কিছুই থাকবে না। অথচ আল্লাহ তাআলার আদেশ হলো,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

কিতাবীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষদিনের প্রতি ইমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম করে না এবং সত্য দীনের অনুগত হয় না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা অপমানিত হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করে। (সুরা তাওবা : ২৯)

আল্লাহ তাআলা আরও আদেশ করেছেন,

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

তোমরা সকলে মিলে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করো, যেমন তারা সকলে মিলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গে রয়েছেন।[১] (সুরা তাওবা : ৩৬)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ.

---

১. এ আয়াতে মুত্তাকিদের একটি পরিচয় জানা গেল। এভাবে 'মুত্তাকি' শব্দ দ্বারা কোন্ আয়াত বা হাদিসে বিশেষভাবে আল্লাহ তাআলার কোন্ আদেশ পালনকারী বা কোন্ নিষিদ্ধ কাজ বর্জনকারীকে বোঝানো হয়েছে, তা স্থানভেদে বিভিন্ন হতে পারে। কুরআন-হাদিসের যেসকল স্থানে 'মুত্তাকি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেসকল স্থানে আগ-পর চিন্তা করলে বিষয়টি বোঝা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ সুরা তাওবার ১২৩ নং আয়াতটিও দ্রষ্টব্য। সুরা নিসা-র ৭৭ নং আয়াতের وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى [আর আখেরাত উত্তম তার জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে] অংশটিও দেখা যেতে পারে। তাকওয়া অবলম্বন দ্বারা এ আয়াতাংশে বিশেষভাবে কোন্ আমল করা উদ্দেশ্য, তা ৭৪ নং আয়াত থেকে এই ৭৭ পর্যন্ত আয়াতগুলো পাঠ করলে যেকারো জন্যই বোঝা সহজ হওয়ার কথা।

হে ইমানদারগণ! তোমরা নিজেদের লোকজন ছাড়া কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে কোনো রকম ত্রুটি করে না। যাতে তোমরা কষ্ট পাও, তা-ই তারা কামনা করে। তাদের মুখ থেকে আক্রোশ প্রকাশ হয়ে গেছে। তাদের অন্তর যা গোপন রাখে, তা আরো গুরুতর। আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিলাম, যদি তোমরা বুদ্ধি রাখ। (আলে-ইমরান : ১১৮)

আট. 'আন্তঃধর্মীয় ঐক্যে'র আহ্বান যদি কোনো মুসলমান জানায়, তাহলে তা সুস্পষ্ট ধর্মত্যাগ। কারণ, তা ইসলামের মৌলিক আকিদার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। 'আন্তঃধর্মীয় ঐক্য' আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করে, কুরআনের সত্যতা বাতিল সাব্যস্ত করে এবং পূর্ববর্তী সকল শরিয়ত ও ধর্ম রহিত হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের নিকটবর্তী করা বিষয়ক 'আন্তঃধর্মীয় ঐক্যে'র আহ্বান শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত; কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অকাট্যভাবে হারাম।

নয়. উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়–

১. যে মুসলমান আল্লাহকে নিজের রব, ইসলামকে নিজের দীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবি ও রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করে, তার জন্য এই পাপিষ্ঠ মতবাদ গ্রহণ করা, এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, মুসলমানদের মধ্যে তা প্রচার করার কোনো বৈধতা নেই। নিজে এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া, এর বিভিন্ন সভা-সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করা এবং সেগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া তো দূরের কথা।

২. একজন মুসলমানের জন্য পৃথকভাবেও তাওরাত ও ইঞ্জিল ছাপানো জায়েজ নেই। এমতাবস্থায় পবিত্র কুরআনের সাথে একই মলাটে কিভাবে জায়েজ হতে পারে? যে ব্যক্তি এমনটি করবে, বা তা করতে কাউকে আহ্বান করবে, সে মারাত্মক বিভ্রান্তিতে নিপতিত রয়েছে। কারণ, তা সত্য কিতাব [পবিত্র কুরআন] এবং বিকৃত বা রহিত কিতাব [তাওরাত ও ইঞ্জিল]কে সমন্বয় করা হয়ে যায়।

৩. একজন মুসলিমের জন্য একই কমপ্লেক্সের ভেতরে মসজিদ, গির্জা ও মন্দির নির্মাণ করার আহ্বানে সাড়া দেওয়া জায়েজ নয়। কেননা এমনটি করা হলে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয় যে, ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের মাধ্যমেও আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা গ্রহণযোগ্য। এতে সকল ধর্মের ওপর ইসলামের বিজয়ী হওয়ার বিষয়টিকেও অস্বীকার করা হয়। এবং এটাও মেনে নেওয়া হয় যে, সত্য ধর্ম তিনটি। সবগুলো ধর্ম সমান। কেউ চাইলে এ তিনটি ধর্মের যেকোনটির অনুসরণ করতে পারে। ইসলাম পূর্ববর্তী ধর্মগুলোকে রহিত করেনি।

কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া, সেসকল ধর্মের বিশ্বাস লালন করা বা সেগুলোর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, গোমরাহি ও কুফরি। কেননা তা পবিত্র কুরআন, নবিজির সুন্নাহ এবং মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যান। তাতে এ স্বীকৃতি প্রদান করা হয় যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিকৃতিগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। অথচ আল্লাহ তাআলা এসব থেকে উর্ধ্বে এবং তিনি চির পবিত্র।

অনুরূপভাবে গীর্জাকে 'আল্লাহ তাআলার ঘর' আখ্যা দেওয়া, এবং সেগুলোর মধ্যে সম্পাদিত তাদের উপাসনাকে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য বলা কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। কেননা সেসকল উপাসনা ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের রীতিনীতিতে সম্পাদন করা হয়। আর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া[১] অন্য কোনো দীন অবলম্বন করতে চায়, তার থেকে সে দীন কখনও কবুল করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা আলে-ইমরান : ৮৫)

---

১. কিছুক্ষণ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

বরং সেসব তো এমন ঘর যেগুলোতে আল্লাহ তাআলার কুফরি করা হয়। আমরা কুফর ও কাফেরদের থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, মন্দির ও গীর্জা আল্লাহ তাআলার ঘর নয়। আল্লাহ তাআলার ঘর তো হলো মসজিদসমুহ। বরং মন্দির ও গীর্জা এমন ঘর যেখানে আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করা হয়। যদিও সেসব স্থানে কখনো আল্লাহকে স্মরণ করা হতো। কারণ, ঘর তার বাসিন্দাদের হিসেবেই বিবেচিত হয়। এসকল ঘরের [বর্তমানের] বাসিন্দারা কাফের। অতএব এগুলো কাফেরদের উপাসনালয়।[১]

দশ. জেনে রাখা আবশ্যক, সাধারণভাবে কাফেরদেরকে এবং বিশেষভাবে ইহুদি-খ্রিস্টানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া মুসলমানদের ওপর আবশ্যক। পবিত্র কুরআন এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর উক্তিমালা দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত। তবে তা হবে কেবল সুস্পষ্ট বিবরণ এবং সর্বোত্তম বিতর্কের মাধ্যমে। কোনো অবস্থাতেই ইসলামের স্বীকৃত কোনো বিষয় থেকে সরে আসা যাবে না।

তাদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে আলোচনার উদ্দেশ্য হবে, ইসলামের ব্যাপারে তাদেরকে আশ্বস্ত করা এবং তাদের ওপর দলিল প্রতিষ্ঠিত করা। যাতে যে বেঁচে থাকে, সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে বেঁচে থাকে, আর যে ধ্বংস হবার, সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই ধ্বংস হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

ওয়াসাল্লামের আগমনের পর ইসলাম সেটাই, যা নিয়ে তিনি আগমন করেছেন। অন্য কোনো ধর্ম ইসলাম নয়।

১. مَجْمُوعُ الفَتَاوَى খ. ২২, পৃ. ১৬২

বলো, 'হে কিতাবিরা! তোমরা এমন এক কথার দিকে এসে যাও, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। [তা এই যে,] আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না। তাঁর সাথে কোনো জিনিসকে শরিক করব না। এবং আল্লাহর পরিবর্তে আমাদের একজন অপরজনকে রব বানাবে না।'[১] তবুও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলো, 'তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম।' (সুরা আলে ইমরান : ৬৪)

পক্ষান্তরে যদি তাদের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনার ফল হয় তাদের কামনা-বাসনার ডাকে সাড়া দেওয়া, তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা, ইসলামের বন্ধন এবং ইমানের মজবুত হাতলগুলো ছিন্ন করা, তাহলে তা বাতিল উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসুল এবং মুমিনরা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ তাআলা নবিজিকে সতর্ক করেছেন এই ভাষায়,

وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ.

তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো, পাছে তারা তোমাকে এমন কিছু বিধান থেকে বিচ্যুত করে যা আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। (সুরা মায়িদা : ৪৯)

পরিশেষে, সাধারণভাবে সকল মুসলমানদের প্রতি এবং বিশেষভাবে আলেমদের প্রতি 'ইলমি গবেষণা ও ফতোয়া প্রদান বিষয়ক স্থায়ী কমিটি'-এর উপদেশ হলো, তাঁরা যেন আল্লাহ তাআলাকে ভয় করেন। সর্বদা তাঁকে স্মরণ রাখেন। পাশাপাশি ইসলামকে রক্ষা করার জন্য, মুসলমানদের ইমান-আকিদাকে পথভ্রষ্ট ও কাফেরদের থেকে হেফাজত করার জন্য সচেষ্ট থাকেন। এবং

---

১. তা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান বলার কারণ হলো, তোমরা যাদের [অর্থাৎ হজরত মুসা ও হজরত ইসা আলাইহিমাস সালামের] অনুসারী হওয়ার দাবিদার, তাঁরা তাওহিদের এ দাওয়াত নিয়েই আগমন করেছেন।

ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের নিকটবর্তীকরণ বিষয়ক 'আন্তঃধর্মীয় ঐক্যে'র আহ্বানের ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক করেন।[১]

যে টকশো বা সাক্ষাতকারে ইসলামকে অবিশ্বাস করা হয় তাতে অংশগ্রহণকারীর হুকুম

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا.

তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি এই নির্দেশ অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে ও তাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কোনও প্রসঙ্গে লিপ্ত হবে। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত মুনাফিক ও কাফেরকে জাহান্নামে একত্র করবেন। (সূরা নিসা : ১৪০)

এ আয়াত থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি কোনো বৈঠক, সাক্ষাতকার, টকশো প্রভৃতিতে ইসলামকে অবিশ্বাস করা ও তাকে বিদ্রূপ করতে শুনবে, সে সেখানে বসে থেকে চুপ থাকলেও তার ইমান ভেঙ্গে যাবে এবং মুনাফিকদের মধ্যে গণ্য হবে। তার ঠিকানা স্থায়ী জাহান্নাম। 'তাফসীরে উসমানী' দ্রষ্টব্য। ১২৭ নং পৃষ্ঠায় মুখে তাগুত বর্জন করার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

---

১. সূত্র, فَتَاوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ لِلْبُحُوْثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالإِفْتَاءِ ফতোয়া নং ১৯৪০২

আমরা কোনো আহলে কিবলাকে কাফের আখ্যা দিই না; তবে যদি তার মধ্যে এমন কিছু থাকে, যদ্বারা স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী, মহাশক্তিশালী স্রষ্টা আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করা হয়, অথবা গাইরুল্লাহর ইবাদত করা হয়, কিংবা পরকাল, নবি অথবা জরুরিয়াতে দীনের অন্য কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা হয়, তাহলেই কেবল কাফের আখ্যা দিই।

আহলে কিবলা : 'আহলে কিবলা'-এর বাহ্যিক অর্থ ও পারিভাষিক অর্থ ভিন্ন। বাহ্যিক অর্থে আহলে কিবলা বলা হয় ওই সকল ব্যক্তিকে, যারা কাবার দিকে ফিরে সালাত আদায় করে কিংবা কাবাকে নিজেদের কিবলা মনে করে। কিন্তু এখানে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য। মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ শব্দটির পারিভাষিক অর্থের বিবরণ দিয়েছেন এই ভাষায়-[১]

'জেনে রাখো, আহলে কিবলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা জরুরিয়াতে দীনের ওপর সম্মত হয়েছেন। যেমন : দুনিয়া নশ্বর হওয়া, দেহসমূহের হাশর হওয়া, সামগ্রিক ও আংশিক সব বিষয়ে আল্লাহর জ্ঞান থাকা এবং এ জাতীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাসমূহ। তাই যে ব্যক্তি জীবনভর আনুগত্য ও ইবাদত করেছে, আর পাশাপাশি এই বিশ্বাস রেখেছে যে, পৃথিবী অবিনশ্বর, হাশর হবে না, আল্লাহ তাআলা আংশিক কিছুর জ্ঞান রাখেন না, সে আহলে কিবলা নয়।'[২]

---

১. মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহিমাহুল্লাহ [১৩১৪-১৩৯৬ হি.] রচিত 'জাওয়াহিরুল ফিকহ' ১/৯১-৯২-এর বরাতে, 'শারহুল ফিকহিল আকবার' পৃ. ১৮৯

২. যদিও সে ফরজ-ওয়াজিব-সুন্নাত-নফলের পাবন্দ হয় এবং কেবলার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করে। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের

জরুরিয়াতে দীন : জরুরিয়াতে দীন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রমাণিত বিষয়সমূহ। ইসলামে কোনো একটি বিষয় 'অকাট্যরূপে প্রমাণিত' তখনই বিবেচিত হয়, যখন তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাওয়াতুর[১]-সূত্রে বর্ণিত হয়। আর 'স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রমাণিত' তখনই বলা হয়, যখন তা সর্বশ্রেণির মানুষের নিকট প্রসিদ্ধ; এমনকি সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষও তা জানে।

জরুরিয়াতে দীনের সংখ্যা

যুগের মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসুফ বানুরি রাহিমাহুল্লাহ লেখেন,

জরুরিয়াতে দীনের উদাহরণ প্রসঙ্গে উম্মাহর আলেমগণ নিজ নিজ গ্রন্থে দু-চারটে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে থাকেন। তা দেখে পাঠক ভুল ধারণা করে বসে যে, জরুরিয়াতে দীন এ কয়েকটিই। অথচ এ সকল আকাবিরের উদ্দেশ্য ছিল শুধু দৃষ্টান্ত দেওয়া, সবগুলো উল্লেখ করা কিংবা বিশেষায়িত করা নয়। এই ভুল ধারণা দূর করতে আমরা নিম্নে ঐ উদাহরণগুলো একত্রে উল্লেখ করব, যেগুলো হালকা দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। যেন এই সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রত্যক্ষ করে এই বাস্তবতা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, উদাহরণ দেওয়াই আকাবিরদের উদ্দেশ্য ছিল; পূর্ণাঙ্গ তালিকা উল্লেখ করা নয়।

যথেষ্ট উক্তি দেখার জন্য মুফতি মুহাম্মদ শফি রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'ইমান আওর কুফর কুরআন কি রোশনি মেঁ' শীর্ষক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। এটি তাঁর প্রবন্ধসংকলন 'জাওয়াহিরুল ফিকহ'-এর অন্তর্ভুক্ত। জরুরি সংযোজনসহ 'ইমান-কুফর ও তাকফির' নামে বাংলাভাষায় পুস্তিকাটি প্রকাশিত রয়েছে।

১. ৬৫ নং পৃষ্ঠায় 'তাওয়াতুর'-এর সংজ্ঞা অতিবাহিত হয়েছে।

ফিকহ, উসুলুল ফিকহ, আকিদা ও উসুলুল হাদিসের কিতাবসমূহে এই উদাহরণগুলোর বিবরণ পাওয়া যায়।

'আল্লাহর ইলম, তাঁর সর্বব্যাপী ক্ষমতা, পরিপূর্ণ ইচ্ছা, কালাম গুণ [কুরআন পাক], কুরআন পাকের অবিনশ্বরতা, আল্লাহর গুণসমূহের অবিনশ্বরতা, সৃষ্টিজগৎ নশ্বরতা, দৈহিক পুনরুত্থান, কবরের আজাব, পুরস্কার, শাস্তি, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার দর্শন, শাফাআতে কুবরা, হাউজে কাউসার, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব।

কিরামান কাতিবিনের অস্তিত্ব, খতমে নবুওয়াত, নবুওয়াত আল্লাহপ্রদত্ত হওয়া, মুহাজির ও আনসারদের মানহানির অবৈধতা, আহলে বাইতের ভালোবাসা, আবু বকর ও উমর রাদিয়াআল্লাহু আনহুমার খিলাফত, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, ফরজ রাকাআতের সংখ্যা, সিজদার সংখ্যা, রমজানের রোজা, জাকাত, জাকাতের পরিমাণ।

হজ, আরাফায় অবস্থান, তাওয়াফের সংখ্যা, জিহাদ, সালাতে কাবামুখী হওয়া, জুমা, দুই ইদ, মোজার ওপর মাসহের বৈধতা, রাসুলকে গালি দেওয়ার অবৈধতা, আবু বকর ও উমর রাদিয়াআল্লাহ আনহুমাকে গালি দেওয়ার অবৈধতা, আল্লাহর দেহ না থাকা, আল্লাহর হুলুল না হওয়া[১], হারামসমূহকে হালাল মনে না করা।

বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা, রেশমের পোশাক পরিধান হারাম হওয়া, ব্যবসার বৈধতা, জানাবতের গোসল, মায়েদের বিয়ে করার অবৈধতা, কন্যাদের বিয়ে করার অবৈধতা, মাহরামদের

---

১. হুলুল না হওয়া : কারো মধ্যে প্রবেশ না করা। প্রসঙ্গত, হুসাইন বিন মানসুর হাল্লাজের ব্যাপারে ইমামগণের মূল্যায়ন এ গ্রন্থের ৩২-৩৭ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিয়ে করার অবৈধতা, মদ হারাম হওয়া, জুয়া হারাম হওয়া।' এখন এই ৫১টি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো।[১]

'ইবকারুল আফকার' কিতাবের লেখক লিখেছেন, ইমাম ইবনে হাজার হাইতামি রাহিমাহুল্লাহও জরুরিয়াতে দীন বিষয়ে যথেষ্ট বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি জরুরিয়াতে দীনকে দু-ভাগে বিভক্ত করেছেন, ১. আকিদাগত, ২. আমলগত। এরপর উভয় প্রকারের অনেকগুলো দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। কিছু দৃষ্টান্তের বিবরণ হজরত বানুরি রাহিমাহুল্লাহ-এর আলোচনায় এসে গেছে। এ ছাড়াও প্রায় ৪০-এরও অধিক দৃষ্টান্ত তিনি উল্লেখ করেছেন, যার বিবরণ আল্লামা বানুরির আলোচনায় আসেনি। এ দুজন মনীষীর উল্লেখিত দৃষ্টান্তগুলো সামনে রাখলেই প্রায় শ-খানেক জরুরিয়াতে দীনের বিবরণ উঠে আসে।[২]

---

১. إِبْكَارُ الأَفْكَارِ فِي أُصُوْلِ الإِكْفَارِ পৃ. ২৭২-২৭৩। লেখক : মুফতি আবদুর রহমান [উফিয়া আনহু]। দারুল উলুম রাহমানিয়া, মারদান, পাকিস্তান।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩-২৭৪

তাকফির ফিতনা নয়

তাকফির [কাফের আখ্যা দেওয়া] একটি গুরুত্বপূর্ণ শরয়ি বিধান। ফিকহের কিতাব অধ্যয়নকারীরা তাকফিরের সাথে সম্পৃক্ত অসংখ্য মাসআলা ও আহকাম দেখতে পাবেন। তাই তাকফির কোনো ফিতনা নয়; বরং ফিতনা হলো, তাকফিরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা এবং নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে তাকফির করার জন্য শরিয়তে যেসকল শর্ত ও প্রতিবন্ধক রয়েছে, সেগুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে ঢালাওভাবে তাকফির করতে থাকা।[১]

তাকফির সংশ্লিষ্ট মাসায়েল ও আহকামের একটি তালিকা

নিম্নে তাকফিরের সাথে সম্পৃক্ত মাসায়েল ও আহকামের ছোট একটি তালিকা পেশ করা হচ্ছে–[২]

১. **শাসকবর্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাসায়েল**

মুসলিম শাসকের প্রতি মিত্রতা, আনুগত্য ও সহযোগিতা করা ওয়াজিব। কুফরে বাওয়াহ তথা সুস্পষ্ট কুফরি প্রকাশ পাওয়া ছাড়া তার সাথে বিদ্রোহ করা, তার বিরোধিতা করা নাজায়েয। যতক্ষণ সে ইসলামের গণ্ডিতে থেকে আল্লাহর শরিয়ত দ্বারা

---

১. ব্যাখ্যাকারের আলোচ্য বিষয়ে তিন ঘন্টাব্যাপী একটি দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। লিংক :
https://www.facebook.com/watch/live/?v=171466828181375&ref=watch_permalink

২. আগত উদাহরণগুলো الرِّسَالَةُ الثَّلَاثِيْنِيَّةُ فِي التحذِيرِ مِنَ الغُلُوِّ فِي التكفيرِ কিতাব [পৃ. ১১-১৩] থেকে গৃহীত। লেখক : শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম মাকদিসি হাফিজাহুল্লাহ।

ফায়সালা করে[১], -চাই সে সৎ হোক বা পাপিষ্ঠ- তার পেছনে নামাজ আদায় করা ও তার পক্ষে যুদ্ধ করা শরিয়তসিদ্ধ। আর অভিভাবকহীন মুসলিমদের অভিভাবক হলেন মুসলিম শাসক।

পক্ষান্তরে, কাফের শাসকের বাইআত [আনুগত্যের শপথ] গ্রহণ করা জায়েজ নয়। তার সাথে মিত্রতা পোষণ করা ও তাকে সাহায্য করা হারাম। তার পতাকা-তলে যুদ্ধ করা, তার পেছনে নামাজ আদায় করা, তার নিকট বিচার প্রার্থনা করা অবৈধ। সে কোনো মুসলমানের অভিভাবক হতে পারে না। মুসলমান তার আনুগত্য করতে পারবে না। বরং তার বিরোধিতা করা, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করা ও তার জায়গায় মুসলিম শাসক নিযুক্ত করা ওয়াজিব।[২]

---

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ.

যেসব লোক, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, ওরাই কাফের। (সুরা মায়েদা : ৪৪)

বর্তমান যুগে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের বিপরীত আইন দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করা এমন কুফরের অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়; বর্তমানে এটি ছোট কুফর নয়। বিষয়টি বিস্তারিত জানতে 'কালিমায়ে তাইয়েবা : বিশ্লেষণ ও ইমান ভঙ্গের কারণ' বইয়ের 'একটি জরুরি সংযুক্তি' শিরোনামের লেখাটি দ্রষ্টব্য।

২. এ বিষয়গুলো ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে জানতে দেখুন : ফাতহুল বারি, ১৩/১২৩; নববি রাহিমাহুল্লাহর শরহে মুসলিম, ১২/২২৯; আস সারিমুল মাসলুল, পৃ. ১৩ ও ২১৬; শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ রচিত الدَّوَاءُ العَاجِلُ فِي دَفْعِ العَدُوِّ الصَّائِلِ পৃ. ৩৩-৩৫; হামদ ইবনে আতিক রাহিমাহুল্লাহ রচিত سَبِيْلُ النَّجَاةِ والفِكَاكِ مِنْ مُوَالَاةِ المُرْتَدِّيْنَ وأَهْلِ الإِشْرَاكِ-এর অন্তর্গত مَجْمُوْعُ التَّوْحِيْدِ পৃ. ৪১২; আবদুল কাদের আওদাহ রচিত التَّشْرِيْعُ الجِنَائِيُّ খ. ২ পৃ. ২৩২ ইত্যাদি। (الرِّسَالَةُ الثَّلَاثِيْنِيَّةُ কিতাবের টীকা।)

এ থেকে শাখাগতভাবে কিছু মাসআলা বের হয়। যারা কাফের শাসকের সাথে মিত্রতা রাখে, তাদের কুফরকে ও কুফরি আইন-কানুনকে সাহায্য করে, কিংবা রক্ষণাবেক্ষণ করে, অথবা আইনপ্রণয়ন করে বা বাস্তবায়ন করে, অথবা সেই আইন দ্বারা ফায়সালা করে, সেসকল বিচারক প্রমুখরা কাফের হয়ে যাবে।

২. অভিভাবকত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধিমালা

মুসলমানের ওপর কাফেরের অভিভাবকত্ব জায়েজ নয়। ফলে কোনো কাফের মুসলিমদের বিচারক, অভিভাবক ও নামাজের ইমাম হতে পারবে না। বিয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম নারীর অভিভাবক হতে পারবে না। মুসলিম শিশুদের লালন-পালন করতে পারবে না ও তাদের অভিভাবক হতে পারবে না। মুসলিম ইয়াতিমদের সম্পদের দায়িত্বভারও কোনো কাফেরের হাতে দেওয়া যাবে না।

৩. বিয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধিমালা

কাফেরের সঙ্গে মুসলিম নারীর বিয়ে জায়েজ নেই। বিয়েতে সে মেয়ের অভিভাবকও হতে পারবে না।[১] মুসলিম পুরুষ মুসলিম নারীকে বিয়ে করার পর মুরতাদ হয়ে গেলে বিয়ে বাতিল হয়ে যায়। তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া আবশ্যক।

৪. মিরাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধান

জুমহুর উলামায়ে কেরামের মাযহাব অনুযায়ী ধর্মের ভিন্নতা উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রতিবন্ধক।

---

১. দেখুন : 'আল মুগনি', কিতাবুল মুরতাদ, পরিচ্ছেদ : সে বিবাহ করলে তার বিবাহ শুদ্ধ হবে না এবং বিবাহ দিলে তাও শুদ্ধ হবে না; কারণ তার অভিবাবক হওয়ার যোগ্যতা শেষ হয়ে গেছে। (الرِّسَالَةُ التَّلَاثِيْنِيَّةُ কিতাবের টীকা।)

৫. কিসাস ও রক্তপণের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধি-বিধান

কাফের হত্যার প্রতিশোধে কোনো মুসলমানকে হত্যা করা হবে না। ভুলে হোক কিংবা ইচ্ছাকৃত- হারবি কাফের ও মুরতাদকে হত্যার বিপরীতে কোনো কাফফারা ও দিয়ত [রক্তপণ] নেই। মুসলমানের ক্ষেত্রে এর বিপরীত।

৬. জানাযার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধি-বিধান

কাফেরের জানাযা পড়া হবে না। তাকে গোসল দেওয়া হবে না এবং মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না। তার জন্যে ইসতিগফার করা ও তার কবর যিয়ারত করা নাজায়েজ। মুসলিমদের ক্ষেত্রে এর বিপরীত।

৭. বিচারকার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান

কাফেরকে বিচারকের দায়িত্বে নিযুক্ত করা বৈধ নয়। মুসলমানের বিপক্ষে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণ করাও বৈধ নয়। কুফরি আইনে ফায়সালাকারী বিচারকের কাছে বিচার চাওয়া জায়েজ নয়।[১] শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিচার প্রয়োগ হওয়ার উপযুক্ত নয় এবং তার প্রভাব প্রতিফলিত হবে না।

৮. যুদ্ধ সংক্রান্ত বিধিমালা

বিদ্রোহী ও অবাধ্য মুসলিমের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আর কাফের-মুশরিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। মুসলিমদের পলায়নকারীকে পেছন থেকে ধাওয়া করা

---

১. آسان ترجمہ قرآن কিতাবে সুরা নিসা-র ৬০ নং আয়াতের অধীনে রয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি মুখে নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসুলের বিধানাবলির ওপর অন্য কোনো বিধানকে প্রাধান্য দেয়, তার মুসলমান থাকার সুযোগ নেই।

হবে না। আহতদেরকে শেষ আঘাত করে দ্রুত মেরে ফেলা হবে না। ধন-সম্পদ গনিমত হিসেবে নেওয়া হবে না। নারীদের বন্দি করা হবে না। এ ধরণের আরো অন্যান্য অনেক কাজ, যা কাফেরদের ক্ষেত্রে করা হয়, আর তা বৈধও বটে, তা মুসলিমদের ক্ষেত্রে করা হবে না। মুসলিমের জান-মাল ও ইজ্জতের ব্যাপারে মূলনীতি হলো, তারা ইমানের ভিত্তিতে নিরাপত্তা পাবে। আর কাফেরের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, তাদের সব হালাল। তবে নিরাপত্তা বা এ জাতীয় কোনো চুক্তি থাকলে নিরাপত্তা পাবে।

৯. **শত্রুতা মিত্রতা সংক্রান্ত বিধি-বিধান**

মুসলমানের সাথে মিত্রতা রাখা আবশ্যক। তার থেকে সম্পর্ক পূর্ণরূপে ছিন্ন করা জায়েজ নয়। বরং সম্পর্ক পূর্ণরূপে ছিন্ন করা হবে শুধু তার অপরাধ থেকে। কাফেরের সঙ্গে মিত্রতা রাখা, মুসলমানের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করা এবং মুসলমানের দোষ তাকে জানিয়ে দেওয়া হারাম। বরং তাকে প্রত্যাখ্যান করা ও তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা আবশ্যক। তার সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা নাজায়েজ।

এখানে উদাহরণস্বরূপ সামান্য কিছু মাসআলার কথা উল্লেখ করা হলো। এছাড়াও আরো অসংখ্য বিধান রয়েছে, যেগুলো তাকফিরের মতো বিপজ্জনক বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ফিকহ-ফতোয়া ও অন্যান্য গ্রন্থাবলিতে এ বিষয়ের দলিলসমূহ স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং যে ব্যক্তি কাফের ও মুসলিমের মাঝে পার্থক্য করবে না, সে এসব ক্ষেত্রে দীনি বিধি-নিষেধই গুলিয়ে ফেলবে।[১]

---

১. الرِّسَالَةُ الثَّلَاثِيْنِيَّةُ কিতাবের উদ্ধৃতি সমাপ্ত হয়েছে।

তাকফির বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা

মুফতি মুহাম্মদ শফি রাহিমাহুল্লাহ 'জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ' কিতাবে[১] লিখেছেন, ইসলামের দাবিদার কোনো ব্যক্তিকে কাফের অথবা কোনো কাফেরকে মুসলমান বলা, উভয়টিই অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে উভয় আচরণের কঠিনভাবে নিন্দা করেছেন। ইসলামের দাবিদারকে কাফের আখ্যা দেওয়া সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا۟ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

হে ইমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে সফর কর, তখন যাচাই-বাছাই করে নিয়ো, এবং যে ব্যক্তি তোমাদের সালাম প্রদান করে, তাকে বলো না, 'তুমি মুসলমান নও'। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহর নিকট প্রচুর গনিমত রয়েছে। তোমরাও ইতিপূর্বে এমনই ছিলে, তারপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব তোমরা যাচাই-বাছাই করে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সম্যক অবগত। (সুরা নিসা : ৯৪)

এ আয়াত থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমানরূপে প্রকাশ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ নিশ্চিতরূপে তার কুফরি সাব্যস্ত না হবে, তাকে কাফের আখ্যা দেওয়া নাজায়েজ এবং কঠিন শাস্তির কারণ।[২]

---

১. খ. ১, পৃ. ১২৬-১২৯। প্রকাশক : মাকতাবায়ে দারুল উলুম করাচি, প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০১০ ইসায়ি।

২. 'কালিমায়ে তাইয়েবা : বিশ্লেষণ ও ঈমান ভঙ্গের কারণ' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের ৭৪-৭৫ নং পৃষ্ঠায় আছে, যে ব্যক্তি ইসলাম প্রকাশ করে, তার

এর বিপরীতে কোনো কাফেরকে মুসলমান সাব্যস্ত করার নিষেধাজ্ঞা এসেছে নিম্নের আয়াতে–

اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا .

তোমরা কি তাকে পথে আনতে চাও, যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনো তার জন্য কোনো পথ পাবে না। (সুরা নিসা : ৮৮)

তাফসিরে জালালাইনে اَنْ تَهْدُوْا [পথে আনা]-র তাফসির করা হয়েছে এই ভাষায়– أَيْ : أَنْ تَعُدُّوْهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمُهْتَدِيْنَ অর্থাৎ কাফেরদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্ত গণ্য করা।

সালফে সালেহিন তথা সাহাবা, তাবেইন ও পরবর্তী মুজতাহিদ ইমামগণ এ বিষয়ে বড় সতর্কতার সাথে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন। ফিকহ ও আকাইদ বিষয়ের আলেমগণের নিকট তাকফিরের অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্গম ক্ষেত্র। এ অঙ্গনে প্রবেশকারীদেরকে তাঁরা অনেক সতর্ক ও সচেতন থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

উদাহরণস্বরূপ দেখুন, মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ 'শিফা' কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থের 'তাহকিকুল কাওলি ফি ইকফারিল

উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক, শুধু এটা দেখার জন্য যে, তার থেকে উক্ত দাবির বিপরীত কিছু প্রকাশ পায় কি-না। যেমন [এখানে অর্থসহ সুরা নিসার উল্লিখিত আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর লেখা হয়েছে,]

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, বিরত থাকা আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি শুধু যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজনে। তারপর যদি ইমানের বিপরীত কিছু প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। ইমান প্রকাশ করলেই যদি আর কখনো হত্যার বিধান না থাকত, তাহলে এরপর যাচাই-বাছাই করার আদেশের কোনো তাৎপর্য থাকে না।

মুতাআব্বিলিন[১] পরিচ্ছেদে ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলি আল-জুওয়াইনি রাহিমাহুল্লাহর [৪১৯-৪৭৮ হি.] এই উক্তি উল্লেখ করেছেন–

إِدْخَالُ كَافِرٍ فِي الْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ أَوْ إِخْرَاجُ مُسْلِمٍ عَنْهَا عَظِيْمٌ فِي الدِّيْنِ.

কোনো কাফেরকে ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত মনে করা এবং কোনো মুসলমানকে ইসলামের বাইরে মনে করা– উভয়টি ভয়াবহ বিষয়।[২]

কিন্তু বর্তমানে এর বিপরীতে উভয় বিষয়কে এতোই সাধারণ মনে করা হচ্ছে যে, কুফর ও ইসলাম এবং ঈমান ও ইরতিদাদ[৩]-এর কোনো মানদণ্ড ও মূলনীতিই বাকি থাকেনি।

একটি দল তো তাকফিরবাজিকে তাদের ব্যস্ততাই বানিয়ে রেখেছে। শরিয়তের বিপরীত বরং তাদের স্বভাবের বিপরীত সামান্যতম কিছু প্রকাশ পেলেই, তাদের পক্ষ থেকে কুফরির ফতোয়া লেগে যায়। সামান্য থেকে সামান্য শাখাগত কথার কারণে মুসলমানদেরকে ইসলাম-বহির্ভূত আখ্যা দিতে শুরু করে।[৪]

---

১. تَحْقِيْقُ الْقَوْلِ فِي إِكْفَارِ الْمُتَأَوِّلِيْنَ

২. শারহুশ শিফা, ২ : ৫০০

৩. ইরতিদাদ : ইসলাম ধর্মত্যাগ।

৪. 'ইমান ও কুফর' বইয়ের একটি উদ্ধৃতি [পৃ. ১৮০-১৮১] এখানে উল্লেখযোগ্য– আমাদের সমাজে এক দল আরেক দলকে সামান্য শাখাগত মতবিরোধকে কেন্দ্র করে কাফের ফতোয়া দিতে দেখা গেলেও শাসকদের ব্যাপারে প্রায় সবাই নিষ্ক্রিয়তার মানহাজ [কর্মপন্থা] গ্রহণ করে নিয়েছে। শাসকরা যতই কুফরি আইনকানুন প্রণয়ন করুক না কেন, আল্লাহ তাআলার শরিয়তের স্থলে নিজেদের প্রণীত কুফরি সংবিধান মানতে বাধ্য করুক না কেন, হারামকে হালাল এবং হালালকে হারামে পরিণত করুক না কেন, জিহাদ-কিতাল, হদ-কিসাস থেকে শুরু করে অসংখ্য ফরজ বিধানের ওপর অকাট্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুক না কেন, মদ-ব্যভিচার থেকে শুরু করে অগণিত হারাম

অপরদিকে আরেকটি দলের অবস্থা হলো, তাদের নিকট ইসলাম ও ইমানের কোনো বাস্তবতাই নেই। তারা ইসলামের দাবিদার প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুসলমান গণ্য করে; সে পুরো কুরআন, হাদিস ও ইসলামের বিধিবিধানের অস্বীকার ও অবজ্ঞা করলেও। তাদের নিকট ইসলামের সঙ্গে প্রত্যেক প্রকার কুফরির সহাবস্থান সম্ভব। তারা হিন্দু ও অন্যান্য বাতিল ধর্মের মতো ইসলামকেও নিছক একটি জাতীয় উপাধি বানিয়ে রেখেছে। যে আকিদাই পোষণ করুক এবং যে রকম উক্তি ও কর্মই করুক, সর্বাবস্থায় ব্যক্তি মুসলমান থাকে। একে তারা চিন্তার ব্যাপকতা ও সাহসের ব্যাপ্তি বলে প্রকাশ করে।

বিধানের বৈধতা প্রদান করুক না কেন, আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত বিধান বাদ দিয়ে কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক আইনকানুন দ্বারা শাসনকার্য ও বিচারকার্য পরিচালনা করুক না কেন, ইসলামের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত কুফরি মতবাদ মানতে বাধ্য করুক না কেন, এসব কিছুর পরও তারা নিখাদ মুসলিম! আর এ কাজগুলো অন্যদের ক্ষেত্রে স্পষ্ট কুফর বলা হলেও ক্ষমতাধর শ্রেণির ক্ষেত্রে তা এসে পরিণত হয় সাধারণ গুনাহে। আর শরিয়তের মূলনীতির অপব্যাখ্যা করে তাদের ব্যাপারে বলে দেওয়া হয়, গুনাহের কারণে কোনো আহলে কিবলাকে কাফের বলা যায় না!

সুতরাং তাদেরও কাফের বলা যাবে না! তারা আমাদের বৈধ শাসক। শাসকদের ব্যাপারে এটাই এখন অধিকাংশের মানহাজ। কারণ, এই নিষ্ক্রিয়তার মানহাজ নিরাপদ উপায়। অন্যথায় তাদের 'তাগুত' বলে আখ্যায়িত করলে তো এর পরবর্তী দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে। [১২৬ নং পৃষ্ঠায় آسان ترجمہ قرآن ও 'ঈমান সবার আগে' কিতাবদ্বয়ে উল্লেখিত 'তাগুতে'র সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য।] তাদের অপসারণের বিধান, তাদের বিরুদ্ধে কিতাল পরিচালনার বিধান নিজেদের ওপর বর্তাবে। বস্তুত কিতালের মাধ্যমে সহজেই মুমিন-মুনাফিক নির্ণীত হয়।

কিন্তু ইসলাম ও ইসলামের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বক্র দৃষ্টিকোণ এবং বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা– উভয় প্রান্তিকতার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। ইসলাম নিজ অনুসারীদের জন্য একটি আসমানি নীতি পেশ করেছে। যে ব্যক্তি তা প্রশান্ত মনে গ্রহণ করবে এবং মান্য করার ব্যাপারে মনে কোনো সঙ্কীর্ণতা অনুভব করবে না, সে মুসলমান।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার এ ধর্মের কোনো অকাট্য বিধান অস্বীকার করবে, সে নিঃসন্দেহে ও নিশ্চিতভাবে ইসলামের সীমা বহির্ভূত। তাকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করার ব্যাপারে ইসলাম অসন্তুষ্ট। তার দ্বারা মুসলিম সমাজের আদমশুমারি বৃদ্ধি করা ইসলাম ও মুসলমানদের আত্মমর্যাদায় আঘাত। এই কতিপয় লোককে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা দ্বারা হাজার হাজার মুসলমানের ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। এটি আমাদের বহুবারের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ।

ইমান ও কুফর কখন সাব্যস্ত হবে?

মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ আরো লিখেছেন,[১] কুফরি শুধু এর নাম নয় যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা বা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোটেই মান্য করবে না। বরং এটিও সেই স্তরের কুফরি এবং অমান্য করার একটি শাখা যে, যেসকল বিধান নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত রয়েছে, সেগুলোর কোনো একটি [তা তাঁর বিধান হওয়া জানা সত্ত্বেও] অস্বীকার করবে; যদিও অন্য সকল বিধান স্বীকার করে নেয় এবং পূর্ণ গুরুত্বের সাথে সবগুলোর উপর আমল করে।

---

১. جَوَاهِرُ الفِقْهِ খ. ১, পৃ. ১৩৩

অকাট্য বিধানকে জরুরি মনে না করা ব্যক্তিকে কাফের আখ্যা দেওয়ার হুকুম

তিনি আরো লিখেছেন,[১] কুফরি ও ধর্মত্যাগ ঐ অবস্থায় সাব্যস্ত হয়, যখন কেউ কোনো অকাট্য বিধান গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং বিধানটি মান্য করা জরুরি হওয়ার আকিদা পোষণ না করে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি বিধানটি গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করে, তবে উদাসীনতা বা দুষ্টামিবশত তার উপর আমল না করে, তাহলে তার অবস্থাকে কুফরি ও ধর্মত্যাগ বলা হবে না। পুরো জীবনে তার উপর একবারও আমল না করলেও তাকে মুসলমান বলা হবে।

প্রথমোক্ত ব্যক্তির অবস্থা ভিন্ন। সে কোনো অকাট্য বিধানকে আমলে পরিণত করা জরুরিই মনে করে না; যদিও কোনো কারণে পুরো জীবন তার উপর আমল করে যায়। এ ব্যক্তিকে মুরতাদ ও কাফের আখ্যা দেওয়া হবে। যেমন এক ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কঠোরভাবে আদায় করে, কিন্তু নামাজকে ফরজ ও আদায় করা জরুরি মনে করে না, এমন ব্যক্তি কাফের। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি যে নামাজকে ফরজ মনে করে, তবে কখনো পড়ে না, সে কাফের নয়, যদিও সে ফাসেক, পাপাচারী ও কঠিন গুনাহগার।

প্রমাণিত বিধানকে অস্বীকারকারী সর্বাবস্থায় মুরতাদ নয়

তিনি আরো লিখেছেন,[২] চিন্তাযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, প্রমাণিত হওয়ার দিক থেকে ইসলামের বিধানগুলো বিভিন্ন স্তরের। প্রত্যেক স্তরের হুকুম এক নয়। শুধু ঐসকল বিধান অস্বীকার করলে ব্যক্তি মুরতাদ ও কাফের হয়, যেগুলো শরিয়তে অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং যেগুলোর মর্মও অকাট্য।

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৪-১৩৫

২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৫-১৩৬

'অকাট্যভাবে প্রমাণিত'[১] হওয়ার অর্থ হলো, সেগুলো পবিত্র কুরআন বা এমন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, যার বর্ণনাকারী নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক এলাকায় এতো অধিকসংখ্যক যে, মিথ্যার উপর তাদের সকলের একমত হওয়া অসম্ভব। পরিভাষায় একেই 'তাওয়াতুর' এবং এ জাতীয় হাদিসকে 'মুতাওয়াতির হাদিস' বলা হয়।

পক্ষান্তরে 'মর্ম অকাট্য'[২] হওয়ার ব্যাখ্যা হলো, এ বিধান সম্পর্কে কুরআন মাজিদে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, অথবা যে মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা তা প্রমাণিত রয়েছে, তা তার উদ্দিষ্ট অর্থ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে। তাতে কোনো প্রকার জটিলতা বা অস্পষ্টতা নেই। ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যার অবকাশও নেই।

তারপর এ প্রকারের অকাট্য বিধানগুলো যদি মুসলমানদের বিশেষ ও সাধারণ প্রত্যেক স্তরে এমন প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হয়, যা জানা কোনো বিশেষ গুরুত্বদান, শেখা ও শেখানোর উপর নির্ভরশীল থাকে না, বরং সাধারণভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে মুসলমানদের সেগুলো জানা হয়ে যায়, যেমন– নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি ফরজ হওয়া, এবং চুরি, মদ্যপান প্রভৃতি কাজগুলো হারাম হওয়া, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষনবি হওয়া[৩]– এ ধরনের

---

১. قَطْعِيُّ الثُّبُوْتِ

২. قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ

৩. লালমনিরহাট জেলায় আমাদের এক সফরের ঘটনা। এলাকার এক যুবক নিজকে মুসলিম বলে পরিচয় দিল। তখন আমাদের এক সফরসঙ্গী তাকে মুসলমানদের নবির নাম জিজ্ঞাসা করল। যুবকটির অবস্থাদৃশ্যে মনে হলো, সে যেন 'নবি' প্রসঙ্গটির সঙ্গে পরিচিতই নয়। বেশ কয়েক মিনিট চিন্তা করে বলল, 'শেখ মুজিবর রহমান'। তারপর উত্তরটা সঠিক হয়েছে কি-না জানার জন্য, উৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

অকাট্য বিষয়গুলোকে 'জরুরিয়াতে দীন' বলা হয়। পক্ষান্তরে যেগুলো এ স্তরের প্রসিদ্ধ নয়, সেগুলোকে শুধু 'অকাট্য' বলা হয়, 'জরুরিয়াত' বলা হয় না।

দীনের 'জরুরিয়াত' ও 'শুধু অকাট্য'-এর পার্থক্য

তিনি আরো লিখেছেন,[১] 'জরুরিয়াত' ও 'শুধু অকাট্য' –এ দুটোর বিধানের মধ্যে পার্থক্য হলো, 'জরুরিয়াতে'র অস্বীকার উম্মাহর ঐকমত্যে সর্বাবস্থায় কুফরি। না জানা ও অজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে ওজর নয়। তদ্রূপ তাতে কোনো প্রকার ভিন্ন ব্যাখ্যার সুযোগ নেই।

শুধু অকাট্য বিষয়– যেগুলো প্রসিদ্ধির ক্ষেত্রে জরুরিয়াতের স্তরে পৌঁছেনি, হানাফি ফকিহদের নিকট সেগুলো ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। যদি কোনো সাধারণ মানুষ না জানা ও অজ্ঞতার কারণে তা অস্বীকার করে বসে, তাহলে এখনই তার কুফরি ও ধর্মত্যাগের হুকুম দেওয়া হবে না। বরং প্রথমে তাকে জানানো হবে, এটি ইসলামের ঐসকল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং তার মর্মও অকাট্য, তা অস্বীকার করা কুফরি। তারপরও যদি সে আপন প্রত্যাখ্যানে অনড়

এ ঘটনাকে প্রমাণরূপে পেশ করে একজন বলল, নবির নাম জানা 'জরুরিয়াতে দীনে'র অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও দেখা গেল, উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক মুসলমান তা জানে না। এমতাবস্থায় 'জরুরিয়াতে দীনে'র উক্ত সংজ্ঞা কী করে সঠিক হয়?
তখন একজন আলেম বলেছেন, 'জরুরিয়াতে দীনের অস্বীকার উম্মাহর ঐকমত্যে সর্বাবস্থায় কুফরি। না জানা ও অজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে ওজর নয়।' এ মূলনীতি থাকা দ্বারা বুঝে আসে, একটি জিনিস জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উদাসীনতার কারণে কিছু লোকের সে ব্যাপারে অজ্ঞ থাকা অসম্ভব নয়। এ জন্যই সংজ্ঞায় 'সাধারণভাবে' শব্দটি শর্ত হিসেবে উল্লেখ রয়েছে।

১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৬-১৩৭, ১৪৭

থাকে, তখন তার 'কাফের হওয়ার' হুকুম দেওয়া হবে। ইবনুল হুমাম রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'মুসায়ারা' ও 'মুসামারা'[১] কিতাবদ্বয়ে এমনই রয়েছে। তাঁর ভাষায়–

যে হুকুম অকাট্যভাবে প্রমাণিত, কিন্তু জরুরতের সীমায় পৌঁছেনি, যেমন উত্তরাধিকার সম্পদে যদি পুত্রের কন্যা ও আপন কন্যা একত্র হয়, তখন এক ষষ্ঠাংশ পুত্রের কন্যার পাওয়ার হুকুম উম্মাহর ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, এ ক্ষেত্রে হানাফি ফকিহগণের বক্তব্যের বাহ্যিক মর্ম হলো, তা অস্বীকার করলে কাফের আখ্যা দেওয়া হবে। কেননা তাঁরা কাফের আখ্যা দেওয়ার জন্য 'অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়া' ব্যতীত অন্য কোনো শর্ত আরোপ করেননি। ... কিন্তু তাঁদের এ উক্তিকে ঐ অবস্থায় প্রয়োগ করতে হবে, যখন অস্বীকারকারী হুকুমটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়া জানবে।[২]

মোদ্দাকথা, ইরতিদাদের একটি প্রকার হলো, ধর্ম পরিবর্তন করা। দ্বিতীয় প্রকার হলো, দীনের জরুরিয়াত ও অকাট্য কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা; অথবা জরুরিয়াতে দীনের এমন ব্যাখ্যা করা, যা দ্বারা তার পরিচিত মর্মের বিপরীত মর্ম সৃষ্টি হয় এবং জ্ঞাত উদ্দেশ্য পরিবর্তন হয়ে যায়।

তাই ইসলামের দাবিদারকে কাফের আখ্যা দেওয়া প্রসঙ্গে শরিয়তের মূলনীতি হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো বক্তব্য ব্যাখ্যা করে

---

১. المُسَايَرَةُ কিতাবটি শায়খ কামালুদ্দিন ইবনুল হুমাম হানাফি রাহিমাহুল্লাহ [৭৯০-৮৬১]-এর রচিত হলেও, المُسَامَرَةُ নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থটির লেখক তিনি নন। সেটির লেখক মূলত শায়খ কামালুদ্দিন ইবনু আবি শারিফ কুদসি শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ [৮২২-৯০৬ হি.]।

২. المُسَامَرَةُ পৃ. ১৪৯

সঠিক রাখার সুযোগ[১] থাকে, এবং বক্তার বক্তব্যে ঐ ব্যাখ্যার বিপরীত কিছু পরিস্কারভাবে না থাকে, অথবা ঐ বিশ্বাস কুফরি হওয়ার ব্যাপারে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে সামান্যতম মতানৈক্য থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কাফের বলা যাবে না। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি দীনের কোনো 'জরুরি' বিষয় অস্বীকার করে, অথবা এমন ব্যাখ্যা করে যা তার সর্বসম্মত মর্মের বিপরীত মর্ম সৃষ্টি করে, তাহলে তাকে কাফের আখ্যা দেওয়ার ব্যাপারে কালক্ষেপণ করার সুযোগ নেই।

কারও কাফের হওয়ার বিষয়ে দ্বিধা হলে করণীয়

মুফতি শফি রাহিমাহুল্লাহ আরো লিখেছেন,[২] যদি কোনো ব্যক্তি বা কোনো বিশেষ দলের কাফের হওয়ার হুকুম সম্পর্কে দ্বিধা হয়, চাই দ্বিধার কারণ আলেমদের মতপার্থক্য হোক, বা লক্ষণ ও

---

১. বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে সঠিক সাব্যস্ত করার সুযোগ থাকতে পারে। ভাস্কর্য তৈরি ও স্থাপন প্রভৃতি হলো কর্ম। কর্মের মধ্যে সে সুযোগ নেই। ১৮৩-১৮৪ নং পৃষ্ঠায় হজরত আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

উল্লেখ্য, 'প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণের অবৈধতা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান। এতে পূজার শর্ত নেই। এই অবৈধতার কারণ হল, আল্লাহর সৃষ্টিগুণের সঙ্গে সাদৃশ্য গ্রহণ, যা বিভিন্ন হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।' মাসিক আলকাউসার, ডিসেম্বর ২০০৮ দ্রষ্টব্য।

প্রাণীর ভাস্কর্য তৈরি অবৈধ হওয়ার বিষয়টি 'তাওয়াতুর' দ্বারা প্রমাণিত। অতএব তার 'মানসুস ও ইজমায়ি' ব্যাখ্যার বিপরীত ব্যাখ্যা করা যান্দাকা ও ইলহাদ। এক শ্রেণির লোক তা বৈধ হওয়ার পক্ষে যেসব যুক্তি পেশ করে, সেগুলোর অসারতা জানার জন্য 'আলকাউসারে'র উল্লিখিত সংখ্যার 'আমিও বলি, কোথায় যাব, কার কাছে যাব!' লেখাটি অবশ্যই পাঠ করুন।

২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৯-১৫০

ইঙ্গিতে পরস্পর বিরোধিতা হোক, বা মূলনীতির অস্পষ্টতা, তখন অধিক নিরাপদ হলো তাকে কাফেরও বলা হবে না এবং মুসলমানও না।

কাফের বলা হলে ব্যক্তির নিজের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না। পক্ষান্তরে মুসলমান বলা হলে অন্যান্য মুসলমানদের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না।

তাই সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে উভয় সতর্কতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ তাকে কোনো মুসলমান নারীকে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। তার পেছনে নামাজ পড়া যাবে না। তার জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করা যাবে না। এবং তার সঙ্গে কাফেরসুলভ আচরণও করা যাবে না।

সক্ষমতা থাকলে তার আকিদা-বিশ্বাস যাচাই করা হবে। যাচাই-বাছাইয়ের পর যা সাব্যস্ত হবে, সে সিদ্ধান্তই তার ব্যাপারে কার্যকর করা হবে। পক্ষান্তরে যদি যাচাই করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে চুপ থাকবে এবং তার বিষয়টি আল্লাহ তাআলার নিকট সোপর্দ করবে। তার উদাহরণ হলো ঐ হুকুম, যা খ্রিস্টান ও ইহুদিদের অস্পষ্ট বর্ণনাসমূহ সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

لَا تُصَدِّقُوْا أَهْلَ الكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ، وَقُوْلُوْا : آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا.

তোমরা কিতাবিদেরকে সত্যবাদী বলো না এবং মিথ্যাবাদীও বলো না। বরং এই বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং ঐ ওহির উপর, যা আমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।

ফিকহের অপর দৃষ্টান্ত হলো হিজড়া বা নপুংসকের বিধিবিধান–

ধর্মীয় বিষয়াদিতে হিজড়ার ঐ অবস্থা গ্রহণ করা হবে, যার মধ্যে সতর্কতা ও দৃঢ়তা বেশি। তার ব্যাপারে এমন কোনো বিধান সাব্যস্ত করা হবে না, যা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। সে যখন ইমামের পেছনে নামাজের কাতারে দাঁড়াবে, তখন পুরুষ ও মহিলাদের

কাতারের মধ্যখানে দাঁড়াবে। মহিলাদের মতো ওড়না পরিধান করে নামাজ পড়বে এবং নামাজে এমনভাবে বসবে, যেভাবে মহিলারা বসে।

তার জন্য গয়না ও রেশমের পোশাক পরিধান করা মাকরুহ। কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষ বা মহিলার সাথে নির্জনে বসা, এবং এমন পুরুষ বা মহিলার সাথে সফর করাও তার জন্য মাকরুহ। মৃত্যুর পর কোনো পুরুষ ও মহিলা তাকে গোসল দিবে না, বরং তায়াম্মুম করিয়ে এমনভাবে কাফন পরানো হবে, যেভাবে মেয়েদেরকে কাফন পরানো হয়। এভাবেই অন্যান্য বিধিবিধান; ফকিহগণ যেগুলো সবিস্তারে লিখেছেন।

কাফের হওয়ার জন্য ব্যক্তির ইচ্ছা থাকা জরুরি নয়

মুফতি শফি রাহিমাহুল্লাহ আরো লিখেছেন,

এক. এ বিষয়ে সর্বপ্রথম লক্ষণীয় হলো, ইসলামের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত তথা কাফের হয়ে যাওয়ার জন্য ব্যক্তির ইচ্ছা ও নিয়ত থাকা আবশ্যক নয়। বড় শয়তান ইবলিস কাফের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেনি। কিন্তু তার কর্মের কারণে সে কাফের হয়ে গেছে। তার সম্পর্কেই কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে– وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (সুরা বাকারা : ৩৪)

প্রথম শতাব্দিতে জাকাত দিতে অস্বীকারকারী ও মিথ্যুক মুসাইলিমার অনুসারীরাও ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার ইচ্ছা করেনি। অথচ সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতভাবে তাদেরকে ইসলাম থেকে বহির্ভূত গণ্য করেছেন। কারণ, ব্যাখ্যাসাপেক্ষ অস্বীকারকে যদি কখনো অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান গণ্য না করা হয়, তাহলে দুনিয়ার বড় থেকে বড় কাফেরকেও ইসলামের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত বলা যাবে না। বরং মূর্তিপূজক ও ইহুদি-খ্রিস্টানদেরকেও মুসলমান বলতে হবে।

কেননা ইবলিস শয়তান আল্লাহ তাআলাকে কখনো অস্বীকার করেনি; না সে আল্লাহর সত্তাকে অস্বীকার করেছে, না তাঁর কোনো

গুণকে অবিশ্বাস করেছে। বরং সে শুধু গায়রুল্লাহকে সিজদা করতে অস্বীকার করেছে। সে তো এ কথাও বলতে পারে, আমি সবচেয়ে বড় তাওহিদপন্থী। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার এ অবাধ্যাচরণকে অস্বীকারকরণের স্তরে রেখে তাকে সবচেয়ে বড় কুফর আখ্যা দিয়েছেন।

দুই. অনুরূপভাবে সাধারণ মূর্তিপূজকরা নিজেদের মূর্তিসমূহের পূজা করার কখনো এ ব্যাখ্যা করত যে, আমরা স্বয়ং মূর্তিগুলোকে আল্লাহ মনে করি না। বরং এগুলোকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে তাঁর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির আশায় তাদের পূজা করি। কিন্তু কুরআন মাজিদ তাদের এ ব্যাখ্যা অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দিয়েছে। তাদের ভাষায় ইরশাদ হয়েছে, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

আমরা তো তাদের উপাসনা কেবল এ জন্য করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। (সুরা যুমার : ৩)

কখনো এই ব্যাখ্যা করে, এই মূর্তিগুলো সরাসরি আল্লাহ নয়; বরং আল্লাহর অধীনস্ত। তবে অত্যন্ত নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তারাও জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি গুণের ক্ষেত্রে আল্লাহর অংশীদার। হাদিসে এসেছে, আরবের মুশরিকরা তাদের হজে তালবিয়া হিসেবে বলত, لَا شَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ [আপনার কোনো অংশীদার নেই, এমন এক অংশীদার ব্যতীত যে আপনারই অধীন। অর্থাৎ মূর্তি প্রভৃতি।]

মোটকথা, মূর্তিপূজক ও মুশরিকরাও لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ [আল্লাহ ব্যতীত ইবাদত লাভের উপযুক্ত কেউ নেই] কালিমার সুস্পষ্ট বিরোধিতা করত না। বরং ব্যাখ্যার পথ গ্রহণ করত। কিন্তু কুরআন মাজিদ এমন অসার ব্যাখ্যাগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ও অস্বীকার করার সমার্থক ধরে তাদের সকলকে কাফের আখ্যা দিয়েছে। কারণ, لَا شَرِيْكَ لَكَ [আপনার কোনো অংশীদার নেই] বিষয়ক কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের উক্তিগুলো এতটাই দ্ব্যর্থহীন যে, তা থেকে কোনো একটি

জিনিসও ব্যতিক্রম হওয়ার সুযোগ নেই। এবং কোনো ধরনের বিশেষত্ব ও ব্যতিক্রম ব্যতীত আপন বাহ্যিক অর্থে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ব্যাপক হওয়া মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত আকিদা।

তিন. তদ্রূপ যে ব্যক্তি خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ [শেষ নবি/নবিগণের ধারা সমাপ্তকারী] আয়াত অথবা لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ [আমার পর কোনো নবি নেই] হাদিসে মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত আকিদার বিপরীত কোনো বিশেষত্ব ও ব্যতিক্রমের পথ বের করে বলবে, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন্নাবিয়্যিন তো আছেনই, এবং তাঁর পর কেউ নবি হতে পারে না। অবশ্য তাকে ব্যতীত, যে 'ছায়া বুরুজি' হিসেবে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুবহু সত্তা বা তাঁর ছায়া হবে। এ ব্যাখ্যা প্রকৃতপক্ষে আরবের মুশরিকদের ঐ বিশ্বাসের অনুকরণ ছাড়া কিছুই নয়, যা তারা إِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ [এমন এক অংশীদার ব্যতীত, যে আপনারই অধীন] বলে ব্যক্ত করত।

যদি 'খাতামুন্নাবিয়্যিন' ও 'আমার পর কোনো নবি নেই'-এর অসার ব্যাখ্যাকারীদেরকে ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত মনে না করা হয়, তাহলে মূর্তিপূজারি ও মুশরিকদেরকে, বরং তাদের গুরু ও শিক্ষক ইবলিসকেও ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত বা কাফের বলা যাবে না।

এ ধরনের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে উম্মাহর সর্বসম্মত আকিদাসমূহ ও কুরআন-হাদিসের সুস্পষ্ট উক্তিগুলো প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে মুসলিম উম্মাহ থেকে পৃথক করাকে যেসকল লোক এজন্য মন্দ মনে করে যে, তাতে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হবে; তাদের সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে; তাদের চিন্তা করা উচিত, যদি বিভেদ ও মতানৈক্য থেকে বাঁচার অর্থ এটাই হয় যে, কেউ যা-ই করুক ও যা-ই বলুক, তাকে ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত মনে করা যাবে না, তাহলে ঐ সব মাটিভর্তি মুলহিদ ও যিন্দিকদের দ্বারা উম্মাহর কী লাভ হবে?

এমন বাজে ব্যাখ্যাসমূহ দ্বারা তো সমগ্র বিশ্বের কাফেরদেরকে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যদি এমনই সহনশীল আচরণ করতে হয়, তাহলে তা পেট ভরেই করুন, যেন পৃথিবীর সকল জাতি ও সাম্রাজ্যসমূহ নিজের হয়ে যায়, এবং ইমান-কুফরের এ যুদ্ধই সমাপ্ত হয়ে যায়।

এটি এমন চমকদার কল্পনা ও সহনশীলতা, যা গ্রহণ করলে কুরআন মাজিদ থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে। কারণ, পাক কুরআন ঘোষণা করেছে,

فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ.

তারপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের, কেউ ঈমানদার। (সুরা তাগাবুন : ২)

কুরআন পাক 'আল্লাহর দল' ও 'শয়তানের দল' নামে পার্থক্যরেখা টেনেছে। কুরআন পাকের প্রায় অর্ধাংশই কুফর ও কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও বিরোধিতায় পূর্ণ।[১]

---

১. جَوَاهِرُ الفِقْهِ খ. ১, পৃ. ১১৮-১২১

তাকফির বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন থেকে বাঁচার উপায়

তাকফির বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন থেকে বাঁচার উপায় হলো, কারো মধ্যে ইমানভঙ্গের কারণ পাওয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ তাকে তাকফির না করা। বরং সংশ্লিষ্ট জিনিসসমূহ গভীরভাবে জানা এবং সেগুলোর প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখা। তাকফির সংশ্লিষ্ট জিনিস তিনটি–

১. মুকাফফির। অর্থাৎ যিনি তাকফির করবেন।

২. মুকাফফার। অর্থাৎ যাকে তাকফির করা হবে।

৩. যে কথা বা কাজের ভিত্তিতে তাকফির করা হবে।

প্রতিটির কিছু স্বতন্ত্র শর্ত রয়েছে। আছে তাকফিরের কিছু প্রতিবন্ধকতা।[১] তদ্রূপ তাকফিরের ক্ষেত্রে কী কী ভুল হয় সেগুলো জানা ও তা পরিহার করাও জরুরি।[২] নিম্নে তাকফিরের প্রতিবন্ধকতাগুলোর ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, ইমান ভঙ্গের কারণ চারটি–

১. কুফরি উক্তি।

২. কুফরি কর্ম।

---

১. বিস্তারিত জানার জন্য উদাহরণস্বরূপ إِبْكَارُ الأَفْكَارِ فِيْ أُصُوْلِ الإِكْفَارِ কিতাবের ১৬৬-২৩৮ পৃষ্ঠাগুলো দ্রষ্টব্য।

২. ৩৩ টি বড় বড় ভুলের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে الرِّسَالَةُ الثَّلَاثِيْنِيَّةُ فِي التَّحْذِيْرِ مِنَ الغُلُوِّ فِي التَّكْفِيْرِ কিতাবটিতে। প্রসঙ্গত, إِبْكَارُ الأَفْكَارِ ও الرِّسَالَةُ الثَّلَاثِيْنِيَّةُ কিতাবদুটি মাহাদের 'আকিদা ও তাওহিদ বিভাগে'র পাঠ্যভুক্ত।

৩. দীনের অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয়ে সন্দেহ।

৪. কুফরি বিশ্বাস।

এ চারটি কারণের কোনো একটি কারণ কারো মধ্যে পাওয়া গেলে তার আর ইমান থাকে না। সে কাফের হয়ে যায়। কিন্তু তাকফির করা হয় শুধু প্রথম দুইটির ভিত্তিতে। শেষোক্ত দুই কারণে দুনিয়াতে কাউকে কাফের আখ্যা দেওয়া হয় না।

১৭৯ নং পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে, ইমান ভঙ্গের কিছু উক্তি ও কর্ম এমন, যা ইমানের অপরিহার্য দাবি ও শর্তসমূহের সঙ্গে সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে, সেগুলো ইমান ভঙ্গের কারণ হিসেবে বিবেচিত। ১৮৩ নং পৃষ্ঠায় ইমানের অপরিহার্য দাবি ও শর্তসমূহ বর্ণিত হয়েছে। আর কিছু উক্তি ও কর্ম এমন, যাতে কুফর অপরিহার্যকারী প্রধান তিন কারণের যেকোনো এক বা একাধিক কারণ বিদ্যমান থাকার ফলে, সেগুলো ইমান ভঙ্গের কারণ হিসেবে বিবেচিত। ১৮৩ নং পৃষ্ঠায় কারণ তিনটির বিবরণ অতিবাহিত হয়েছে।[১]

তাকফিরের প্রতিবন্ধকতা

এবার বর্তমানের মূল আলোচনা শুরু হচ্ছে।[২]

প্রতিবন্ধকতা হলো এমন বিষয়, যা বিদ্যমান থাকলে বিধান আরোপিত হয় না। আর বিদ্যমান না থাকলে বিধান আসা না-আসা, কোনোটিই আবশ্যক হয় না।

---

১. الْجَامِعُ فِي أَلْفَاظِ الْكُفْرِ নামে ডক্টর মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান খুমায়্যিস-এর তাহকিকে প্রকাশিত একটি কিতাব রয়েছে। এটি কুফরি উক্তি ও কুফরি কর্মের বিবরণ সম্বলিত একটি বড় সংকলন। তাতে চারটি পুস্তিকা রয়েছে। প্রকাশক : دَارُ إِيْلَافِ الدَّوْلَةِ কুয়েত।

২. مُخْتَصَرُ الرِّسَالَةِ الثَّلَاثِيْنِيَّةِ পৃ. ৯-১৮ দ্রষ্টব্য। আগত আলোচনা এ কিতাব থেকে অনূদিত।

উদাহরণস্বরূপ তাকফিরের একটি প্রতিবন্ধকতা হলো ইকরাহ বা বাধ্যকরণ। সুতরাং 'বাধ্যকরণ' পাওয়া গেলে অর্থাৎ কাউকে কুফরে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হলে, সে ক্ষেত্রে ব্যক্তির উপর কুফরের বিধান আরোপিত হয় না। অর্থাৎ ব্যক্তি তখন কাফের হয়ে যায় না।

আবার 'বাধ্যকরণ' না থাকলে ব্যক্তির কুফর করা না করা কোনোটিই আবশ্যক হয় না। অর্থাৎ মুকাল্লাফ [শরিয়তের আদিষ্ট] ব্যক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে এবং কেউ তাকে কুফরি করতে বাধ্য না করলে, কুফরি করা না করা কোনোটিই তার জন্য আবশ্যক হয় না। বরং তখন সে কুফর করতেও পারে, নাও করতে পারে।

তাকফিরের প্রতিবন্ধকতা তিন প্রকার–

১. উক্তিকারী ও কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা।

২. উক্তি ও কর্মের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা।

৩. উক্তি ও কর্ম প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা।

প্রথম প্রকারের আলোচনা

প্রথম প্রকার ছিল, উক্তিকারী ও কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা। তা এমন কিছু বিষয়, যা কারো মধ্যে বিদ্যমান থাকলে, কুফরি উক্তি বা কুফরি কর্ম তার থেকে প্রকাশিত হলেও, সে কাফের হয় না।

তা আবার দু প্রকার

ক. এমন প্রতিবন্ধকতা যার মধ্যে ব্যক্তির ইচ্ছার কোনো ভূমিকা নেই। যেমন অপ্রাপ্তবয়স, উন্মাদনা, নির্বুদ্ধিতা, বিস্মৃতি ইত্যাদি। এ সকল কারণ বিদ্যমান থাকলে ব্যক্তি গুনাহগার ও অপরাধী বিবেচিত হয় না। কেননা তখন শরিয়তের আদেশ-নিষেধ তার উপর বর্তায় না।

অবশ্য বান্দার হকের কারণে এসকল অবস্থায়ও ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হবে। যেমন এরা কেউ কারো কোনো জিনিস নষ্ট

করে ফেলল, বা দিয়ত [ক্ষতিপূরণ] আরোপিত হয় এমন কোনো কাজ করে ফেলল।

খ. যে প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ব্যক্তির ইচ্ছার কিছুটা ভূমিকা রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ–

১. **ইচ্ছার অনুপস্থিতি**। কোনো ব্যক্তি যদি ভুলবশত [অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে] কোনো কুফরি উক্তি বা কর্মে লিপ্ত হয়, তাহলে তা তাকফিরের একটি প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ এমন হলে উক্ত কুফরি কর্ম বা উক্তির কারণে তাকে কাফের আখ্যা দেওয়া হবে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ.

তোমাদের দ্বারা কোনো ভুল হয়ে গেলে সে জন্য তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না। কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের অন্তর ইচ্ছা পোষণ করে, [তা করলে তোমাদের গুনাহ হবে]। (সুরা আহযাব : ৫)

এক হাদিসে যে রয়েছে, এক ব্যক্তি মরুভূমিতে তার বাহন হারিয়ে ফেলার পর পুনরায় তা পেয়ে বলেছে, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা, আমি আপনার রব!' তার সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'লোকটি আনন্দের আতিশয্যে ভুল করে ফেলেছে।' এ হাদিসটিও প্রমাণ বহন করে যে, ইচ্ছার অনুপস্থিতি তাকফিরের একটি প্রতিবন্ধক।[১]

---

১. ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।
'ইচ্ছার অনুপস্থিতি'র প্রতিবন্ধকতা প্রসঙ্গে কতিপয় আলেম 'আনন্দের আতিশয্যজনিত ভুলে'র সঙ্গে, 'রাগের আতিশয্যজনিত ভুল'কেও যুক্ত করেছেন। তবে এটি একটি মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়। অবশ্য যারা 'রাগের আতিশয্যজনিত ভুলকে'ও বিবেচনা করেন, তাঁদের মতেও যে ব্যক্তি রাগের অবস্থায় কুফরি উক্তি ও কুফরি কর্মে লিপ্ত হতে অভ্যস্ত, আর

তদ্রূপ অন্যের কুফরি কথার বিবরণ দিতে গিয়ে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করাও, 'ইচ্ছার অনুপস্থিতি' নামক প্রতিবন্ধকতার অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা ব্যক্তি কাফের হয় না। যেমন কোনো ব্যক্তি পবিত্র কুরআনে কাফেরদের কোনো উক্তি পাঠ করল। এসকল উক্তি উচ্চারণ করার কারণে কেউ কাফের হয় না; বরং সে সওয়াবের অধিকারী হয়। তদ্রূপ বিচারক ও অন্যান্যদের সামনে শ্রবণকৃত কুফরি উক্তি উচ্চারণ করার ফলেও সাক্ষী কাফের হয় না।

অনুরূপভাবে কাফেরদের বক্তব্যের সমস্যাগুলো তুলে ধরা অথবা সেগুলো খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে, তাদের যেসব কুফরি বাক্য উচ্চারণ করা হয়, তার কারণে উচ্চারণকারী কাফের হয় না। বরং এ ক্ষেত্রে সেগুলো উচ্চারণ করা জায়েজ অথবা ওয়াজিব। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে, 'কুফর বর্ণনাকারী কাফের নয়'। পক্ষান্তরে যদি কেউ ওই কুফরি কথাকে ভালো মনে করে অথবা তাকে সমর্থন করে প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে, তবে তা নিঃসন্দেহে কুফর। লক্ষণ ও পূর্বাপর অবস্থা বিবেচনা করে এসব ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে।

কাজি ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি অন্য কারো থেকে কুফরি উক্তি বর্ণনা করলে দেখতে হবে, বর্ণনাকারী তার কথাটা কীভাবে বর্ণনা করছে। এ বিবেচনায় তার ওই বাক্য উচ্চারণের হুকুম চার ধরণের হতে পারে– ওয়াজিব, মুসতাহাব, মাকরুহ ও হারাম।'[১]

একটি সতর্কবাণী

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন যে, কাফের আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে 'ইচ্ছার অনুপস্থিতি'কে প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত করার অর্থ

যে ব্যক্তির মূল অবস্থা হলো তাকওয়া ও খোদাভীরুতা, দুজনের মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক।

১. الشفا খ. ২, পৃ. ৯৯৭-১০০৩

এটা নয় যে, কুফরি উক্তি বা কর্মটি দ্বারা ব্যক্তির ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফেরে পরিণত হওয়ার ইচ্ছা থাকতে হবে, যেমনটি এ যুগের অনেক মুরজিয়ারা মনে করে। এর ভিত্তিতে তারা তাগুত, যিন্দিক ও মুরতাদদের ব্যাপারে অজুহাত পেশ করে। তারা বলে, কুফর অপরিহার্যকারী উক্তি বা কর্মে লিপ্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত ওই কর্ম বা উক্তি দ্বারা ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফের হওয়ার ইচ্ছা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কাফের বলা যাবে না। বরং উদ্দেশ্য হলো, ওই উক্তি বা কর্মটি স্বেচ্ছায় করা।

বলাবাহুল্য, দীন থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যাওয়ার ইচ্ছায় কুফরি কর্ম ও উক্তি কম লোকই করে থাকে, অথবা এমন ইচ্ছা থাকলেও কম লোকই তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। এমনকি ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকেও যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা কি 'ইসা/উজাইর আল্লাহর পুত্র' এ জাতীয় উক্তিগুলো করা দ্বরা আল্লাহর দীন থেকে বের হয়ে কাফের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেছ? তাহলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে বলবে, না আমরা কাফের হওয়ার ইচ্ছা করেনি।

বরং 'ইচ্ছার অনুপস্থিতি'কে প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত করার অর্থ হলো, কেউ যদি ভুলবশত কুফরি উক্তি বা কুফরি কর্ম করে, তাহলে সে কাফের হবে না। যেমন কুফরি উক্তি করল। কিন্তু ওই উক্তি করা তার ইচ্ছা ছিল না, বা অন্যের কথা হিসেবে সে তা উল্লেখ করেছে, কিংবা লোকদেরকে সতর্ক করার জন্য উল্লেখ করেছে, অথবা তা উচ্চারণ করলেও তার মর্ম সে জানে না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ 'আস-সারিমুল মাসলুল' গ্রন্থের ১৭৭-১৭৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'কেউ কুফরি উক্তি বা কর্মে লিপ্ত হলেই কাফের হয়ে যাবে, যদিও সে কাফের হওয়ার ইচ্ছা না করে থাকে। কারণ, কাফের হওয়ার ইচ্ছা কেউ করে না। অবশ্য কেউ করতেও পারে।'

মোটকথা, তাকফিরের প্রতিবন্ধকতার আলোচনায় 'ইচ্ছার অনুপস্থিতি' দ্বারা কুফরি উক্তি বা কর্মটি অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ পাওয়া উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে কাফের হওয়ার ইচ্ছা না থাকা উদ্দেশ্য নয়।

২. **ব্যাখ্যা থাকা।** অর্থাৎ ইজতিহাদবশত শরিয়তের দলিলকে অপাত্রে ব্যবহার করা। অথবা দলিলের মর্ম না বোঝার কারণে কোনো সংশয়ের শিকার হওয়া। অথবা ভুল বুঝকে সঠিক মনে করা। কিংবা যেটা দলিল নয় সেটাকে দলিল মনে করা। যেমন দুর্বল হাদিসকে সহিহ মনে করে তার দ্বারা দলিল পেশ করা। ইত্যাদি কারণে কেউ যখন কোনো কুফরি কর্মে লিপ্ত হয়, যেটাকে সে কুফর মনে করে না, তাহলে কুফরি কর্ম করার ইচ্ছা না থাকার কারণে, তার ব্যাখ্যার এ ভুলটি তাকফিরের প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হয়। এখন ব্যাখ্য থাকলে কাউকে কাফের আখ্যা দেওয়া হয় না। তবে দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে ভুল স্পষ্ট করে দেওয়ার পরও যদি কেউ নিজের ভুল ব্যাখ্যার ওপর অটল থাকে, তখন তাকে কাফের বলা হয়।

এ ধরণের ব্যাখ্যা তাকফিরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে। সাহাবি হজরত কুদামা বিন মাযউন রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক জামাতবদ্ধভাবে মদ পান করার ঘটনা, এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। নিম্নোক্ত আয়াতটিকে তিনি তার উক্ত কাজের দলিল মনে করেছিলেন।

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা যা কিছু খেয়েছে তাতে তাদের কোনো গোনাহ নেই, যদি তারা [আল্লাহকে] ভয় করে চলে এবং ইমান আনে ও নেক আমল করে। অতঃপর ভয় করে চলে

ও ইমান আনে, পুনরায় ভয় করে চলে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। (সুরা মায়েদা : ৯৩)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ 'আস-সারিমুল মাসলুল' গ্রন্থের ৫৩০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'এক পর্যায়ে উমর রাদিআল্লাহু আনহু ও শুরা সদস্য সবাই একমত হলেন যে, কুদামা ইবনে মাযউন ও তার সঙ্গীদেরকে তাওবা করতে বলা হোক। অতঃপর যদি তারা [মদ পান করা] হারাম হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নেয়, তাহলে শুধু [মদপানের শাস্তিস্বরূপ] বেত্রাঘাত করা হবে। আর যদি হারাম হওয়ার স্বীকৃতি না দেন, তবে তাদের তাকফির করা হবে।'

অতঃপর উমর রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর ভুল ধরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'তুমি যদি তাকওয়া অবলম্বন করতে, তবে আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন, তা হতে বিরত থাকতে এবং মদ পান করতে না।' অতঃপর তিনি তাওবা করে ফিরে আসেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে কাফের আখ্যা দেননি। বরং শুধু মদ পানের হদ প্রয়োগ করে ক্ষান্ত হয়েছেন। এ ব্যাপারে একজন সাহাবিও ভিন্নমত পোষণ করেননি।

কখন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়?

স্মর্তব্য, আলেমগণ পরিষ্কারভাবে বলেছেন, শরয়ি দলিল ছাড়া কোনো শব্দকে তার বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা, কোনো অবস্থাতেই অনুমোদিত ব্যাখ্যা নয়। কারণ. একে পুঁজি করেই পরবর্তীরা শরিয়তের অনেক উক্তি বিকৃত করেছে। তারা তাদের বিকৃতির নাম দিয়েছে ব্যাখ্যা। যাতে লোকেরা তাদের সুশোভিত কথাগুলো গ্রহণ করে নেয়।

যারা দ্বিধায় ফেলার জন্য মানুষের সামনে নিজেদের বাতিল ও অসার কথাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে উপস্থাপন করে, আল্লাহ তাআলা তাদের নিন্দা করে ইরশাদ করেছেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا.

[তারা যেমন আমার নবির সাথে শত্রুতা করছে] এভাবেই আমি [পূর্ববর্তী] প্রত্যেক নবির জন্য কোনো না কোনও শত্রু সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ মানব ও জিনদের মধ্য হতে শয়তানদেরকে, যারা ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একে অন্যকে [সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত] চমৎকার কথা শেখাত। (সুরা আনআম : ১১২)

৩. অজ্ঞতা। অজ্ঞতা তখনই তাকফিরের প্রতিবন্ধক ও ওজর হিসেবে বিবেচ্য হয়, যখন ব্যক্তি তা দূর করতে সক্ষম না হয়। পক্ষান্তরে যে অজ্ঞতা দূর করা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব, কিন্তু বিমুখতা প্রদর্শন করতঃ সে তা করে না, এমন ব্যক্তির অজ্ঞতা তাকফিরের প্রতিবন্ধক নয়। কারণ, সে ইচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞতাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তাই তার ওপর জ্ঞাত ব্যাক্তির মতই হুকুম আসবে; যদিও বাস্তবে সে অবগত নয়।

তার দৃষ্টান্ত দীন থেকে বিমুখতা প্রদর্শনকারী ওই ব্যাক্তির মত, যার কাছে সতর্কবাণী সম্বলিত আল্লাহর কিতাব পৌঁছেছে, কিন্তু সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অতিব গুরুত্বপূর্ণ যে কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টি করেছেন, তা জানা অথবা তা নিয়ে চিন্তা ফিকির করার ব্যাপারে বিমুখতা প্রদর্শন করেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ. كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ.

ওদের কি হলো যে, ওরা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে! যেন ওরা ভয়ে পলায়নকারী গাধা, যা সিংহের ভয়ে পালিয়েছে। (সুরা মুদ্দাছছির : ৪৯-৫০)

আল্লাহ তাআলা নবির ভাষায় ইরশাদ করেছেন,

وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ.

আমার প্রতি এ কুরআন ওহির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে আমি তার দ্বারা তোমাদের এবং যার নিকট তা পৌঁছে তাকে সতর্ক করি। (সুরা আনআম: ১৯)

এ কারণেই আলেমগণ শরিয়তের মুলনীতি বিষয়ক তাঁদের গ্রন্থাবলীতে সুস্পষ্টভাষায় বলেছেন, যেমন ইমাম শিহাবুদ্দিন কারাফি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৬৮৪ হি.] লিখেছেন, 'যে অজ্ঞতা মুকাল্লাফ ব্যক্তির দূর করা সম্ভব, তা অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ওজর গণ্য হয় না।'[১]

অজ্ঞতা বস্তুত তাকফিরের প্রতিবন্ধক হিসেবে ধর্তব্য হয় সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাওহিদের মূল বিষয়টি যার মধ্যে যথাযথ আছে, কিন্তু এমন কিছু বিষয় তার অজানা রয়ে গেছে যা কখনো অস্পষ্ট থাকে, কিংবা যা কিছুটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবিদার। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলির জ্ঞান। যে ব্যক্তির তাওহিদ নির্ভেজাল আছে, এমন ব্যক্তি যদি এসব ক্ষেত্রে ভুলের শিকার হয়, তাহলে শরিয়ত তাকে মাযুর হিসেবে গণ্য করে। সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দলিল প্রতিষ্ঠিত করার পূর্বে এ ধরনের ব্যক্তিকে কাফের আখ্যা দেওয়া জায়েজ নেই।

তদ্রূপ যে ব্যক্তি সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছে, অথবা দূরবর্তী এমন কোনো এলাকায় বেড়ে উঠেছে, যেখানে শরিয়তের বিস্তারিত বিধি-বিধান পৌঁছা কঠিন, এ ধরণের ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত তাওহিদের ধারক-বাহক থাকবে, বড় শিরক পরিহার করবে, কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না, তার কাছে কোনো বিষয় অস্পষ্ট থাকলে তা ওজর হিসেবে বিবেচিত হবে।

---

১. الفُرُوْقُ (أَنْوَارُ البُرُوْقِ فِي أَنْوَاءِ الفُرُوْقِ) খ. ৪, পৃ. ২৬৪ এবং খ. ২, পৃ. ১৪৯-১৫১

৪. বাধ্য হওয়া। অর্থাৎ ব্যক্তি থেকে কুফরি কথা বা কাজ অন্য কারো বল প্রয়োগের ফলে প্রকাশ পাওয়া; স্বেচ্ছায় নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ইমান আনার পর কুফরি করল, –তবে সে ব্যক্তি নয়, যাকে কুফরির জন্য বাধ্য করা হয়েছে এবং তার অন্তর ইমানের ব্যাপারে প্রশান্ত, বরং সেই ব্যক্তি, যে কুফরির জন্য নিজ হৃদয় খুলে দিয়েছে,– তাদের ওপর রয়েছে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (সুরা নাহল : ১০৬)

'বাধ্য হওয়া' তাকফিরের প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত হওয়ার জন্য উলামায়ে কেরাম কিছু শর্ত উল্লেখ করেছেন-[১]

ক. বাধ্যকারী ব্যক্তি হুমকি বাস্তবায়নে সক্ষম হওয়া এবং বাধ্য ব্যক্তি সেখান থেকে পলায়ন করার মাধ্যমেও তা প্রতিহত করতে অক্ষম হওয়া।

খ. বাধ্য ব্যক্তির মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল থাকা যে, সে যদি বিরত থাকে, তাহলে বাধ্যকারী তার প্রদত্ত হুমকি বাস্তবায়ন করবে।

গ. বাধ্য ব্যক্তি থেকে এমন কোনো কাজ প্রকাশ না পাওয়া, যা দ্বারা তার কুফরিতে লেগে থাকা বোঝায়। যেমন যে পরিমাণ উক্তি বা কর্মের মাধ্যমে বিপদ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল, তার চেয়ে বাড়িয়ে কথা বলা বা কাজ করা।

ঘ. হুমকিটা এমন শাস্তি প্রসঙ্গে হওয়া, যাতে ধৈর্যধারণ করা সম্ভব নয়। যেমন তীব্র যন্ত্রণা দেওয়া, অঙ্গচ্ছেদ ঘটানো, আগুনো

---

১. فَتْحُ الْبَارِيْ كِتَابُ الْإِكْرَاهِ দ্রষ্টব্য।

পোড়ানো, হত্যা করা ইত্যাদি। কারণ, যে সাহাবিকে কেন্দ্র করে 'বাধ্য হওয়া' একটি ওজর বলে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি হলেন আম্মার বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাঁর পিতা-মাতাকে হত্যা করা হয়েছে, তাঁর পাঁজরের হাড়গোড় ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহর জন্য তিনি কঠোর নির্যাতন ভোগ করেছেন, তারপরই তিনি যা বলার বলেছেন।

৬. বাধ্যকৃত অবস্থা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ইসলাম প্রকাশ করা। যদি ইসলাম প্রকাশ করে, তাহলে সে মুসলমান হিসেবে বাকি থাকবে; আর যদি কুফর প্রকাশ করে, তাহলে কুফরি বাক্য উচ্চারণের সময় থেকে তাকে কাফের গণ্য করা হবে।[১]

একটি সতর্কবাণী

আলেমগণ পরিষ্কারভাবে বলেছেন, কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি প্রমাণ থাকে যে, সে কাফেরদের নিকট বন্দী অবস্থায় ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হয়ে কুফরি কথা বা কাজে লিপ্ত হয়েছে, তাহলে তার ওপর মুরতাদের হুকুম আরোপ করা হবে না।[২] কারণ, সে যতক্ষণ কাফেরদের নিকট বন্দী আছে, বাধ্য অবস্থায় থাকার সম্ভাবনা আছে। কাফেররা তাকে যা খুশি করতে পারে। কিন্তু যদি প্রমাণ পাওয়া যায়, কুফরি কথা বা কাজে লিপ্ত হওয়ার সময় সে নিরাপদ ছিল, তাহলে তাকে মুরতাদ গণ্য করা হবে।[৩] কারণ উপর্যুক্ত আয়াতে কেবল বাধ্য ব্যক্তিকেই মাযুর সাব্যস্ত করা হয়েছে।

---

১. المُغْنِي لِابْنِ قُدَامَةَ كِتَابُ المُرْتَدِّ فَصْلُ «وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الكُفْرِ...» দ্রষ্টব্য।

২. প্রাগুক্ত।

৩. হামদ বিন আতিক রাহিমাহুল্লাহ রচিত سَبِيلُ النَّجَاةِ والفِكَاكِ পৃ. ৬২

আরেকটি সতর্কবাণী

'বাধ্য হওয়া' সংক্রান্ত উপর্যুক্ত আলোচনা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে কুফরি উক্তি বা কর্ম করে মুক্ত হওয়ার পর পুনরায় ইসলাম প্রকাশ করে। এ ধরনের ব্যক্তির জন্য উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে কুফরি উক্তি বা কর্ম করা বৈধ। কিন্তু কুফরের ওপর বহাল থাকার জন্য বাধ্য করা হলে, ব্যক্তির জন্য তা গ্রহণ করা জায়েজ নয়। শরিয়ত তাকে মাযুর মনে করে না। কোন্ প্রকার 'বাধ্য' শরিয়তে ওজর বলে বিবেচিত হয়, আর কোন্ প্রকার বিবেচিত হয় না, ফুকাহায়ে কেরাম ইকরাহের অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্যে উপর্যুক্ত দুই প্রকার ইকরাহের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। একজন বন্দীকে কুফরি করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, 'তার জন্য কি মুরতাদ হওয়ার সুযোগ আছে?'

তিনি কথাটি খুবই অপছন্দ করে বললেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব সাহাবির ব্যাপারে বাধ্য হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, আমার দৃষ্টিতে তাঁদের মধ্যে এবং এ ব্যক্তির মধ্যে মিল নেই। সাহাবায়ে কেরামকে কুফরি করতে বাধ্য করা হতো, তারপর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হতো। ছাড়া পেয়ে তাঁরা নিজেদের মতো করে [ইমানের পথে] চলতেন। পক্ষান্তরে এদেরকে কাফেররা নিজ ধর্ম ত্যাগ করে কুফরের উপর অটল-অবিচল রাখতে চায়।[১]

কারণ, যাকে [সাময়িকভাবে] কুফরি করতে বাধ্য করা হয়, অতঃপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তাদের মাঝে অবস্থানকারী এ ব্যক্তি স্থায়ীভাবে কুফরকে গ্রহণ করে নিচ্ছে, হারামকে হালাল করছে, ফরজ-ওয়াজিব বিধানসমূহ

১. সম্ভবত এতটুকু কথাই আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহর। এর পরের অংশ ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহর নিজের। আল্লাহই ভালো জানেন।

ছেড়ে দিচ্ছে, খারাপ ও নিষিদ্ধ কাজসমূহে জড়িয়ে পড়ছে। বাধ্য ব্যক্তি যদি মহিলা হয়ে থাকে, তারা তাকে বিবাহ করবে, তার গর্ভে কাফের সন্তান-সন্ততি জন্ম দেবে। তদ্রূপ পুরুষ হলেও একই অবস্থা।[১] তাদের বাহ্যিক অবস্থা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়, তারা খাঁটি ধর্ম ইসলাম থেকে বের হয়ে প্রকৃত কুফরে পৌঁছে গেছে।[২]

দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা

প্রথম প্রকার ছিল কুফরি উক্তিকারী ও কুফরি কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা। দ্বিতীয় প্রকার হলো, কুফরি উক্তি ও কর্মের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা। এটি দুই প্রকার-

১. কথা বা কাজটি কুফর হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়া। এমন হলে উক্ত কথা বা কাজের কারণে ব্যক্তিকে কাফের আখ্যা দেওয়া যাবে না।[৩]

২. উক্ত কথা বা কাজটি কাফের আখ্যাদানকারী প্রমাণিত হয় শরিয়তের যে দলিলের ভিত্তিতে, ঐ দলিলটি অকাট্য অর্থবোধক না হওয়া।[৪] দলিলটি যদি অকাট্য অর্থবোধক না হয়, তাহলে তার ভিত্তিতে কাউকে কাফের আখ্যা দেওয়া যাবে না।[৫]

---

১. অর্থাৎ কাফের অবস্থায় জীবন যাপন করবে। তার থেকে কাফের বংশবিস্তার হবে।

২. المُغْنِيْ، كِتَابُ المُرْتَدِّ، فَصْلٌ : «وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى كَلِمَةِ الكُفْرِ فَالأَفْضَلُ لَه أَنْ يَصْبِرَ وَلَا يَقُوْلَهَا» দ্রষ্টব্য।

৩. الرِّسَالَةُ الثَّلَاثِيْنِيَّةُ কিতাবের 'অষ্টম ভুল' প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৪. قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ

৫. الرِّسَالَةُ الثَّلَاثِيْنِيَّةُ কিতাবের 'সপ্তম ভুল' প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

তৃতীয় প্রকারের আলোচনা

তৃতীয় প্রকার প্রতিবন্ধকতা হলো, কুফরি উক্তি ও কর্ম কারো থেকে প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায়। এটি প্রতিবন্ধকতার বিচারিক দিক। বস্তুত কেউ কাফের প্রমাণিত হলে তার জান-মালের ক্ষতিসাধন বৈধ হওয়ার প্রসঙ্গ চলে আসে। তাই কুফরি উক্তি ও কর্ম কারো থেকে প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি খুব জোরালোভাবে যাচাই করতে হয়।

১. ইরতিদাদ [ধর্মত্যাগ] প্রমাণিত হয় দু'ভাবে– ১. নিজের স্বীকারোক্তি দ্বারা। ২. অথবা দু'জন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা। অতএব কুফরি উক্তি ও কর্ম যদি কারো থেকে এই দুই পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে প্রমাণিত না হয়, তাহলে তা প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে গণ্য হবে। এমন ব্যক্তি বাস্তবে কাফের হয়ে গেলেও তার কুফরটা শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে প্রমাণিত না হওয়ার কারণে, তাকে কাফের আখ্যা দেওয়া যাবে না।

২. সাক্ষীদের কোনো একজন যদি কাফের, উন্মাদ অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়, তাহলে এ বিষয়ে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে, সাক্ষী যদি তার প্রতিপক্ষ হয়, অথবা সাক্ষীর ন্যায়পরায়নতা যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তাহলে এগুলোও কুফরি উক্তি ও কর্ম প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা। তাছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অভিযোগ অস্বীকার করে এবং শপথ করে অভিযোগের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তা-ও তাকফিরের ক্ষেত্রে অন্তরায়।

তাকফিরের প্রতিবন্ধকতা সংশ্লিষ্ট কিছু সতর্কবার্তা

প্রথম সতর্কবার্তা

তাকফিরের প্রতিবন্ধকতাসমূহ যাচাই-বাছাই করা, আয়ত্তাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে জরুরি; আয়ত্তবহির্ভূত ব্যক্তি অথবা মুহারিবের [ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীর] ক্ষেত্রে জরুরি নয়।

কাউকে তাকফির করার পূর্বে তার মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কি না, তা ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করতে হয়। তবে যাচাই-বাছাইয়ের ব্যাপারটি আয়ত্তবহির্ভূত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং আয়ত্তাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আয়ত্তবহির্ভূত হওয়া

আয়ত্তবহির্ভূত হওয়ার দুটি অর্থ–

১. শরিয়তের ওপর আমল করা থেকে আংশিক বা পূর্ণ বিরত থাকা। অর্থাৎ নিজেকে শরিয়তের পূর্ণ বা আংশিক গণ্ডিবহির্ভূত রাখা।[১]

২. কুফরে লিপ্ত ব্যক্তি মুসলমানদের ধরাছোঁয়ার বাহিরে থাকা। তাকে শরিয়তের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে হিসাব-নিকাশ নেওয়ার সুযোগ না থাকা।

---

১. যারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে, তারা শরিয়তের ওপর আমল করা থেকে পূর্ণ বিরত থাকার নীতি গ্রহণকারী। পক্ষান্তরে উদাহরণস্বরূপ যারা রাষ্ট্রীয় জীবনে [আইনবিভাগ, নির্বাহীবিভাগ ও বিচারবিভাগে] ইসলামি বিধি-নিষেধ অনুসরণ না করার নীতি গ্রহণ করে নিয়েছে, তারা নিজেদেরকে শরিয়তের আংশিক গণ্ডিবহির্ভূত রেখেছে।

উপর্যুক্ত দুই প্রকারের একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়। উভয় প্রকারের সহাবস্থান না-ও হতে পারে, আবার হতেও পারে।

কোনো ব্যক্তি যদি দারুল ইসলামের বাসিন্দা হয় এবং শরিয়ত অনুসারে আমল করা থেকে বিরত থাকে, যেমন কেউ জাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকল, তাহলে সে শরিয়তের [আংশিক] গণ্ডিবহির্ভূত। কিন্তু মুসলমানদের ধরাছোঁয়ার ভেতরে। এটি উভয় প্রকারের সহাবস্থান না হওয়ার উদাহরণ।

আবার কখনও উভয় প্রকার একত্রও হতে পারে। যেমন দারুল কুফরে বসবাস করার সুযোগে, অথবা শক্তিমত্তা ও দলবল থাকার কারণে, কিংবা আইন ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সুবাদে কোনো ব্যক্তি শরিয়ত প্রত্যাখ্যান করে বসল। এমতাবস্থায় মুসলমানগণ উক্ত ব্যক্তিকে আল্লাহর শরিয়তের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে, তার ওপর শরিয়তের নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করতে অক্ষম। এ ব্যক্তি শরিয়তেরও গণ্ডিবহির্ভূত। আবার মুসলমানদের ধরাছোঁয়ারও বাহিরে।

মুসলমানদের ধরাছোঁয়ার বাইরের ব্যক্তি কখনো বাহুবলে যুদ্ধ করে, আবার কখনো শুধু কথার মাধ্যমে যুদ্ধ করে।[১]

উলামায়ে কেরাম পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, মুসলমানদের ধরাছোঁয়ার বাইরের ব্যক্তিকে তওবা করতে বলা হবে না। তাহলে যে মুহারিব [ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী] মুসলিমদের ভূখণ্ডে আক্রমণ চালিয়ে তা দখল করে নিয়েছে এবং শাসনের বাগডোর নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই তাকে তওবা করতে বলা হবে না।

---

১. الصَّارِمُ الْمَسْلُوْلُ عَلَى شَاتِمِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ পৃ. ৩৮৮ দ্রষ্টব্য।

তওবা চাওয়ার দুই অর্থ

১. যার ব্যাপারে মুরতাদ হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে, তাওবা করে তাকে ইসলামে ফিরে আসতে বলা।

২. কারো ব্যাপারে রিদ্দাহর [ধর্মত্যাগের] হুকুম দেওয়ার পূর্বে তার মধ্যে তাকফিরের প্রতিবন্ধকতাসমূহ আছে কি না, তা যাচাই-বাছাই করা। এই দ্বিতীয় দিকটির ব্যাপারে সতর্ক করাই এখানে আমাদের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় সতর্কবার্তা

যে বিষয়গুলো তাকফিরের প্রতিবন্ধক নয়; কিন্তু অনেকেই - এমনকি মুরতাদ ও তাদের সহযোগীরাও- এগুলোকে ওজর মনে করে।

১. **বেতন-ভাতা কর্তন বা চাকরিচ্যুতির ভয়। দুনিয়াবি কিছু সম্পদ বাজেয়াপ্ত কিংবা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা।**

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ.

মানুষের মধ্যে কতক এমন আছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি। অতঃপর যখন তারা আল্লাহর পথে নির্যাতিত হয়, তখন মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর শাস্তির মতো মনে করে। (সুরা আনকাবুত : ১০)

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ.

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

হে ইমানদারগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। ওরা একে অন্যের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যেকেউ ওদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে ওদেরই দলভুক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ জালেম জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, অচিরেই তুমি তাদেরকে দেখবে, তারা দৌড়ে গিয়ে তাদের [ইহুদি-খ্রিস্টানদের] দলভুক্ত হচ্ছে এই বলে যে, আমাদের আশঙ্কা হয়, না জানি আমাদের উপর কালের চক্র এসে পড়ে। কিন্তু ঐ সময় সন্নিকটে, যখন আল্লাহ [মুসলমানদের] বিজয় দান করবেন অথবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু ঘটাবেন, যার ফলে ওরা নিজেদের অন্তরে গোপন করা বিষয়ের জন্য অনুতাপ করতে থাকবে।

আর মুমিনরা [একে অপরকে] বলবে, এরাই কি তারা, যারা আল্লাহর নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করে বলত, তারা তোমাদের সাথে আছে! [আল্লাহ তাআলা বলেন], ওদের আমলগুলো বিনষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং ওরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

হে ইমানদারগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যারা নিজ ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, আল্লাহ [তাদের পরিবর্তে] অবশ্যই এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। [যারা হবে] ইমানদারদের প্রতি কোমল, কাফেরদের প্রতি কঠোর। [যারা] আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। তা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি

যাকে ইচ্ছা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, পরিজ্ঞাত। (সুরা মায়েদা : ৫১-৫৪)

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর বিবরণ অনুযায়ী, যারা নিছক ভয়ের কারণে কাফেরদেরকে বন্ধু বানাবে, তারা মুরতাদ এবং তাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, একমাত্র কুফরির কারণেই এমনটি হয়ে থাকে।

২. নিজকে অসহায় ও দূর্বল ভাবা। শাসক শ্রেণির বিরোধিতা করার মতো কোনো পথ না থাকার ওজর পেশ করা।

যদি বাস্তবেই অবস্থা গ্রহণযোগ্য দুর্বল পর্যায়ের হয়, তারপরও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুফর-শিরক ও তার ধ্বজাধারীদের সহযোগিতা করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, এতে তো কেউ তাদের বাধ্য করছে না। এ ধরণের কাজ যেসকল চাকুরিতে করতে হয়, সে চাকুরি গ্রহণ করতে তো কেউ তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে না। বরং তারাই তা পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে থাকে। এ সকল চাকুরির জন্য বিভিন্ন জনের সুপারিশ ও মধ্যস্ততা খুঁজতে থাকে। বড় অঙ্কের ঘুষ প্রদান করে।

বলাবাহুল্য, দুর্বলতার অজুহাতে যারা কুফর ও শিরকের ক্ষেত্রে কাফেরদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করেন না। কুরআনের বহু আয়াত থেকে তা সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত।

আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন,

وَاِذْ يَتَحَاجُّونَ فِيْ النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَا اِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ.

[স্মরণ করো ওই সময়ের কথা], যখন তারা আগুনের ভেতর পরস্পর বিতর্ক করবে- দুর্বলরা অহংকারীদের বলবে, আমরা

[দুনিয়াতে] তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, অতএব তোমরা কি আমাদের থেকে আগুনের কিছু অংশ দূর করবে? অহংকারীরা বলবে, আমরা সকলেই ততে [আগুনে] আছি, আর নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে বিচার করে ফেলেছেন। (সুরা মুমিন/গাফির : ৪৭-৪৮)

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ.

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ.

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

তুমি যদি দেখতে, যখন জালেমদেরকে তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে, এমতাবস্থায় যে, তারা একে অপরের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে থাকবে, যাদের দুর্বল ভাবা হতো, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই ইমানদার হতাম।

অহংকারীরা, যাদের দুর্বল ভাবা হতো তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট হেদায়াত পৌঁছার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে বিরত রেখেছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী।

যাদের দুর্বল ভাবা হতো, তারা অহংকারীদের বলবে, [না,] বরং [আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের] রাত দিনের চক্রান্ত [আমাদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে], যখন তোমরা আমাদের নির্দেশ দিতে, যেন আমরা আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সাথে সমকক্ষ স্থির করি। [আল্লাহ তাআলা বলেন,] তারা [উভয় দলই] ভেতরে ভেতরে অনুতাপ

করতে থাকবে, যখন আযাব দেখবে। আর আমি কাফেরদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে সেসব আমলেরই প্রতিফল দেওয়া হবে, যা তারা করত। (সুরা সাবা : ৩১-৩৩)

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে, দুর্বলতার অজুহাতে যারা কাফেরদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের কুফর ও শিরক ক্ষমা করেন না। তাদের এসব আপত্তি কিয়ামতের দিন কোনো উপকারে আসবে না। কাফেরদের অনুগামী হওয়ার অপরাধে তারাও জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে। এই আপত্তিগুলো তাদের কাফের হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়।

৩. নিজেদেরকে ইমানদার মনে করা, অথবা কুফরি কথা, কাজ বা বিশ্বাসে জড়িয়েও নিজেকে এসব ক্ষেত্রে হকের ওপর অবিচল বলে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এ শ্রেণির কাফেরদের আলোচনা তুলে ধরেছেন। তারা তাদের কাজগুলোকে ভালো বলে মনে করলেও, আল্লাহ তাআলা তাদের এই 'মনে করা'কে তাকফিরের প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত করেননি।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

বলো, আমি কি তোমাদেরকে তাদের সংবাদ দেব, যারা আমলের দিক দিয়ে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত? [তারা] সেসব লোক, দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা-সাধনা বিনষ্ট হয়েছে, আর তারা ধারণা করছে, তারা ভালো কাজ করছে। (সুরা কাহফ : ১০৩-১০৪)

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন,

إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ.

তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু বানিয়েছে। আর ধারণা করছে, তারা সঠিক পথের ওপর রয়েছে। (সুরা আরাফ : ৩০)

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে কাফেরদের ধারণাকে অসার সাব্যস্ত করা হয়েছে। হকের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইমানদার হিসেবে গণ্য করেননি। সুতরাং নিজেকে ইমানদার মনে করা তাকফিরের প্রতিবন্ধক নয়।

৪. **ইসলামের কিছু প্রতীক যেমন দুই কালিমার শাহাদাতের স্বীকৃতি, নামাজ ইত্যাদির পাবন্দ থাকা।**[১]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মুশরিকদের অনেক আমলের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের অনেকের মাঝে ইমানের অনেক শাখাও বিদ্যমান ছিল। সেগুলোর কারণে তাদের শিরক ক্ষমা হয়ে যায়নি, তারা ইমানদার হয়ে যায়নি। তাই কারো মধ্যে ইমান ভঙ্গের বা কুফরির কারণ বিদ্যমান থাকা প্রমাণিত হলে, সে নামাজের মতো ইসলামের বিভিন্ন আমলের পাবন্দ হলেও কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.

তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি ইমান রাখলেও তা এভাবে যে, শিরক[ও] করে। (সুরা ইউসুফ : ১০৬)[২]

---

১. এগুলোই যখন তাকফিরের প্রতিবন্ধক হচ্ছে না, তাহলে এর চেয়ে নিম্নস্তরের বিষয়- যেমন, সাহাবায়ে কেরাম ও আকাবির-আসলাফের নামে সড়ক-মহাসড়ক, স্কুল-মাদরাসা, এয়ারপোর্ট ইত্যাদি নির্মাণ করা তো তাকফিরের প্রতিবন্ধক হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এটাকেই শাইখ আলবানি ইরাকের তাগুত শাসকের তাকফিরের প্রতিবন্ধক গণ্য করেছেন।

২. সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ বিন আম্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন–

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ لَيْسَ فِيْهِمْ مُؤْمِنٌ.

৫. পুরোহিত-সন্ন্যাসী অথবা নেতা-শাসকদের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে কুফরিতে লিপ্ত হওয়া।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا، رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا.

নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের প্রতি লানত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। তারা না পাবে কোনো অভিভাবক এবং না কোনো সাহায্যকারী। যেদিন তাদের উপুড় করে আগুনে ফেলা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! কত ভালো হতো, যদি আমরা আল্লাহর কথা মান্য করতাম এবং মান্য করতাম রাসুলের কথা। তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতা ও আমাদের বড়দের কথা মেনেছিলাম, তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। হে আমাদের রব! তাদের দ্বিগুন শাস্তি দিন এবং তাদের চরম লানত করুন। (সুরা আহযাব : ৬৪-৬৮)

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে।

মানুষের সামনে এমন একটি সময় আসবে যখন তারা [সালাত আদায় করার জন্য] মসজিদগুলোতে একত্রিত হবে, তাদের মধ্যে কোনো ইমানদার থাকবে না। [মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস নং ৮৩৬৫] এ হাদিস থেকে বোঝা গেল, ইমানভঙ্গের কারণ পাওয়া গেলে জামাতের সাথে সালাত আদায় করলেও ব্যক্তি ইমানদার থাকবে না। জাকাত, সিয়াম, হজ প্রভৃতি আমল সম্পাদনকারীদের অবস্থাও অনুরূপ হওয়ার কথা।

৬. আলেম হওয়া, দাড়িওয়ালা হওয়া, কোনো ইসলামি দলের সদস্য হওয়া, শরিয়াহ অনুষদে ডক্টরেট ডিগ্রিধারী হওয়া ইত্যাদি।

নিজ সময়ের যুগশ্রেষ্ঠ এক আলেম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ.

তুমি তাদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দান করেছিলাম, কিন্তু সে তা ছেড়ে বেরিয়ে গেল, আর শয়তান তার পেছনে লাগল। ফলে সে হয়ে গেল পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা আরাফ : ১৭৫)

তাছাড়া শ্রেষ্ঠতম মানুষ নবিগণের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ آتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ.

তারা যদি শিরক করত, তারা যে আমল করেছিল তা অবশ্যই বরবাদ হয়ে যেত। ওঁরাই তারা, যাদেরকে আমি কিতাব, হেকমত ও নবুওয়াত দান করেছি। (সুরা আনআম : ৮৮-৮৯)

তবে হ্যাঁ...

এখানে একটি বিষয় অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে তাহলো, কোন্‌টি দীন থেকে বহিষ্কারকারী সুস্পষ্ট কুফরি, আর কোন্‌টি কুফরি নয়, বরং ইজতিহাদি ভুল, তার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করতে হবে। কারণ, ইজতিহাদি ভুলের কারণে ব্যাক্তি কাফের হওয়া তো দূরের কথা, ফাসেকও হয় না, উপরন্তু সওয়াবের অধিকারী হয়।

তদ্রূপ কখনও কতক আহলে ইলম ও দীনি শিক্ষার্থীদের থেকেও বিভিন্ন বিচ্যুতি প্রকাশ পায়। এগুলোর কারণে তাঁদের সাথে দুর্ব্যবহার

করা, বাড়াবাড়ি করা, কিংবা তাদের ইলমকে অবজ্ঞা করা বা খাটো করে দেখা, অথবা তাঁদের বই-পুস্তক পড়া হতে যুবকদের বারণ করা, ইত্যাদি অনুচিৎ কাজ। বিশেষকরে তাঁরা যদি তাগুত ও মুরতাদদের থেকে সম্পর্ক ছিন্নকারী দীনের ধারক-বাহক ও ইসলামের সাহায্যকারী হন।

৭. বিরাট সংখ্যক মানুষ কাফের হয়ে যাওয়া।

অনেকে মনে করেন, যদি এ কাজটির কারণে তাকফির করা হয়, তাহলে তো বিরাট সংখ্যক মানুষকে তাকফির করতে হবে। তাদের মনে রাখা উচিৎ আল্লাহর দীন কারো পরোয়া করে না। কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ.

মুসা বলেছে, যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলে কুফরি কর, তবে [তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই। কারণ,] আল্লাহ তো অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (সুরা ইবরাহিম : ৮)

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন,

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.

আপনি আকাঙ্ক্ষা করলেও অধিকাংশ লোক ইমান আনার নয়। (সুরা ইউসুফ : ১০৩)

তিনি আরোও ইরশাদ করেন, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ

নিশ্চয় অনেক মানুষ তাদের রবের সাক্ষাৎকে অস্বীকারকারী। (সুরা রুম : ৩০)

৮. ঠাট্টাচ্ছলে, হেলায়-খেলায় কিংবা রসিকতা করে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করা।

এটি তাকফিরের প্রতিবন্ধক না হওয়ার ব্যাপারে সকল আলেম একমত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ.

তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর, তবে তারা অতি অবশ্যই বলবে, আমরা খোশগল্প ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। বলো, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসুলকে উপহাস করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা ইমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ। (সুরা তাওবা : ৬৫-৬৬)

হাসি-তামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুক তাকফিরের প্রতিবন্ধক না হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি একেবারেই স্পষ্ট। আল্লাহ তাআলা তাদের খোশগল্প ও ক্রীড়া-কৌতুককে ওজর হিসেবে গ্রহণ করেননি। অথচ তারা ছিল ওই সকল লোক, যারা কঠিন পরিস্থিতিতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুকের যুদ্ধে গমন করেছে। তাছাড়া কথাগুলো তারা হাস্য-রসিকতাচ্ছলে সময় কাটানোর জন্য বলেছিলো।

৯. যাদেরকে কাফের আখ্যা দিতে হচ্ছে তাদের ওপর ধর্মত্যাগের দণ্ডবিধি কার্যকর করা, মুরতাদ শাসককে অপসারণ করে মুসলিম শাসককে ক্ষমতার মসনদে বসানো, ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্ভব না হওয়া।

এ বিষয়ে হক ও সঠিক কথা হলো, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সামর্থ পরিমাণ কাজ করার আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

তোমরা তোমাদের সামর্থানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো। (সুরা তাগাবুন : ১৬)

হজরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের ভাষায় ইরশাদ করেছেন,

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ.

আমি তো সাধ্যানুযায়ী সংশোধন করতে চাই। (সুরা হুদ : ৮৮)

এর থেকেই ফকিহগণ সুপ্রসিদ্ধ ফিকহি মূলনীতি তৈরি করেছেন, الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ অর্থাৎ কোনো বিষয়ের কিছু অংশ সহজ ও কিছু অংশ কঠিন হলে, কঠিন অংশের কারণে সহজ অংশ রহিত হয়ে যায় না।[১]

সুতরাং কোনো এক পর্যায়ে মুসলমানরা কাফের শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এবং তাকে অপসারণ করতে অপারগ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাকে তাকফির করা থেকে তাদের বিরত থাকতে হবে। বরং এটা শরিয়তের একটি হুকুম, যা পালনের সক্ষমতা তাদের আছে। অতএব এ ক্ষেত্রে এবং এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও, যেখানে তাদের সক্ষমতা আছে, আল্লাহকে ভয় করা জরুরি। যেমন তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা, তাদের কুফরি আইনে বিচার প্রার্থনা করা, দীন ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের নাক গলানোর সুযোগ করে দেওয়া, ইত্যাদি আরো যে সকল বিষয় থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব, মুসলমানদের অবশ্যই তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

তাছাড়া তার হাতে বাইয়াত দেওয়া, তার পতাকাতলে যুদ্ধ করা, তার বাতিল কথা-কাজে সাহায্য-সমর্থন জোগানো, মুসলমানের বিরুদ্ধে তাকে সহায়তা করা, ইত্যাদি কাজগুলো থেকেও অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কারণ, এগুলো থেকে বিরত থাকা মুসলমানদের জন্য অসম্ভব নয়। আর এমন শাসককে অপসারণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও প্রস্তুতির জন্য তার কুফরির বিষয়টি জানা থাকা জরুরি। তাহলেই একদিন তাকে অপসারণ করা সম্ভব হবে।

---

১. শাফিয়ি ও আশআরি ইমাম তাকিউদ্দিন হুসনি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৮২৯ হি.] রচিত القَوَاعِدُ কিতাবের টীকার ভাষা নিম্নরূপ–

معناها أنّ الأمر المُتَيَسَّرَ بَعْضُه لا يَسْقُط بسببِ تَعَسُّرِ بعضِه الآخرة أو غيرِه، والأمرُ المُتَيَسَّرُ كُلُّه لا يَسْقُط بِسببِ تَعَسُّرِ غَيرِه أو بعضِ غيرِه. قال السُّيُوْطِيُّ : قال ابنُ السُّبْكِيِّ : وهِيَ مِن أَشهَرِ القواعدِ المُستَنْبَطَةِ من قوله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

১০. কুফরে লিপ্ত ব্যক্তি ভালো তারবিয়াত না পাওয়া।

কতক অনুসৃত ও প্রশিদ্ধ ব্যক্তি এটাকে আল্লাহ, দীন ও রাসুলের গালিদাতাকে কাফের বলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক মনে করে থাকে। অথচ অধিকাংশ কাফের ও মুশরিক মন্দ তারবিয়াত ও পরিবেশের কারণেই কুফর-শিরকে লিপ্ত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.

প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের ওপরই জন্মলাভ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারীরূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাতে কোনো [জন্মগত] নাককাটা দেখতে পাও?[১]

মন্দ তারবিয়াত ও পরিবেশের কারণে তারা কাফের আখ্যা পাওয়া থেকে বাঁচেনি।

১১. উত্তম বিবেচনা করে বা উপযোগী মনে করে বা দীনের স্বার্থ মনে করে কুফরি করা।

বস্তুত কুফর ও শিরকের মধ্যে দীনের কোনো কল্যাণ থাকতে পারে না। কারণ, কুফর ও শিরক তো অস্তিত্বজগতের সবচেয়ে বড় গুনাহ। এজন্যই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ.

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরিক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের [গোনাহ] –যার জন্য ইচ্ছা– ক্ষমা করবেন। (সুরা নিসা : ১১৬)

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কোন্ গুনাহ সবচেয়ে

---

১. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৩৫৯।

বড়? তিনি বলেছেন, আল্লাহর জন্য সমকক্ষ সাব্যস্ত করা; অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

তাকফিরের কারণ

২২৪-২২৫ নং পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হওয়া একটি কথা ভিন্ন ভাষায় আবারও বলা হচ্ছে–

'কারণ' এমন বিষয়, যা বিদ্যমান থাকলে হুকুম আরোপিত হয়; আর বিদ্যমান না থাকলে হুকুম আরোপিত হয় না। শরিয়তপ্রণেতা সংশ্লিষ্ট হুকুমকে 'কারণ'-এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। 'কারণ' পাওয়া গেলে হুকুম আসবে; না পাওয়া গেলে হুকুম আসবে না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট যেহেতু ইমান তিন রোকনের সমষ্টিত রূপ- ক. বিশ্বাস, খ. উক্তি, গ. কর্ম; তাই কুফর অপরিহার্যকারী 'কারণ'ও তিনভাগে বিভক্ত-

১. কুফর অপরিহার্যকারী বিশ্বাস। শরিয়তের অকাট্য কোনো বিষয়ে সন্দেহ-সংশয়ও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।
২. কুফর অপরিহার্যকারী উক্তি।
৩. কুফর অপরিহার্যকারী কর্ম।

বাস্তবিকপক্ষে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ের কারণেই ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়। কিন্তু প্রথম প্রকারের সম্পর্ক যেহেতু অন্তরের সাথে, তাই তাকফিরসহ দুনিয়াবি বিধিবিধান তার সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না। বরং শেষোক্ত দুটি বিষয়ের সাথেই তা সম্পৃক্ত হয়। তবে যদি অন্তরের বিষয়টি কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে তো তা পরবর্তী দুই প্রকারের অন্তর্ভুক্তই হয়ে গেল। তখন তার সাথেও দুনিয়াবি হুকুম সম্পৃক্ত হবে।

মোটকথা দুনিয়ার বিচারে কুফর অপরিহার্যকারী বিষয় দুটি-

১. কুফরি উক্তি।
২. কুফরি কর্ম।

কুফরি বিশ্বাস লালনকারী ব্যক্তি যদিও দুনিয়ার আদালতে ছাড় পেয়ে যায়, বাহ্যদৃষ্টিতে মুসলমান হওয়ার কারণে তার সাথে মুসলমানদের মতোই আচরণ করা হয়, আল্লাহর আদালতে সে ছাড় পাবে না; বরং মুনাফিক [কুফর গোপন করে মুসলিমের বেশ ধারণকারী] সাব্যস্ত হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা অন্তরের গহীনের খবরও জানেন।

সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি কুফর অপরিহার্যকারী উক্তি বা কর্মে লিপ্ত হয়; তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধকতা তার মধ্যে বিদ্যমান না থাকে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে, যদিও তার ধারণা অনুসারে সে কুফর গ্রহণ করার ও দীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেনি। আর এ ধরণের ইচ্ছা ক'জনই বা করে। এমনকি ইহুদি, খ্রিস্টানদেরও যদি জিজ্ঞাসা করা হয়- তোমরা কি 'ইসা/উজাইর আল্লাহর পুত্র' অথবা এ জাতীয় কথা দ্বারা আল্লাহর দীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা কর? তারা তা প্রত্যাখ্যান করে বলবে, না আমরা তা ইচ্ছা করি না।

একটি সতর্কবাণী

কোনো ব্যক্তির মধ্যে কুফর অপরিহার্যকারী কোনো একটি বিষয় পাওয়া গেলেই -যদি তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধকতা তার মধ্যে না থাকে- সে কাফের হয়ে যাবে। কাফের হওয়ার জন্য কুফরের একাধিক কারণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক নয়। হ্যাঁ, একাধিক কারণ পাওয়া গেলে তা কুফরকে জোরদার করবে বৈ কি! কারণ, ইমানের মতো কুফরও বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইমান ও নেক আমলের ওপর অবিচল রাখুন। আমিন![১]

---

১. مُخْتَصَرُ الرِّسَالَةِ الثَّلَاثِيْنِيَّةِ পৃ. ৯-১৮-এর উদ্ধৃতি সমাপ্ত হয়েছে। তাকফির বিষয়ে সীমালঙ্ঘন থেকে বাঁচার জন্য الرِّسَالَةُ الثَّلَاثِيْنِيَّةُ কিতাবের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদদুটো গভীরভাবে পাঠ করাও জরুরি। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাকফির বিষয়ে ঘটে এমন ৩৩টি ভুলের

'আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার' প্রসঙ্গ

সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজ থেকে বারণ করা ওয়াজিব। শর্ত হলো, তা যেন ফিতনার কারণ না হয় এবং 'ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে' এই ধারণা বদ্ধমূল থাকে।

আম্‌র ও নাহির সংজ্ঞা

'কাশফুল আসরার' গ্রন্থের লেখক আল্লামা আলাউদ্দিন বুখারি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৭৩০ হি.] আদেশ [আমর]-এর সংজ্ঞায় বলেছেন, আদেশ এমন শব্দকে বলা হয়, যা অন্যের থেকে কোনো কাজ 'প্রতাপের সাথে' চাওয়া বোঝায়। অতএব আবেদন বা প্রার্থনা করার নাম 'আদেশ' নয়। এ মতটিই সঠিক হওয়ার অধিক নিকটবর্তী।[১]

এ সংজ্ঞার মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা [নাহি]-এর পরিচয়ও স্পষ্ট হয়ে যায়।

অনুনয়কারী ব্যক্তি আদেশকারী কিংবা নিষেধকারী নন

সংজ্ঞাটি থেকে বোঝা যায়, অনুনয়কারী ব্যক্তি আদেশকারী কিংবা নিষেধকারী নন। তাই আদেশ-নিষেধের হুকুম অনুনয়ের মাধ্যমে আদায় হয় না। তবে একটি স্তর পর্যন্ত তাতে দাওয়াতের সওয়াব পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

বিবরণ ও সেগুলো পরিহার করার উপায় বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে চতুর্থ পরিচ্ছেদে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনকারী তাকফিরিদের [খারেজিদের] মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে।

১. আল্লামা আলাউদ্দিন বুখারি হানাফি রাহিমাহুল্লাহ রচিত كَشْفُ الأَسْرَارِ شَرْحُ أُصُوْلِ البَزْدَوِيِّ খ. ১, পৃ. ১০১, প্রকাশক : دَارُ الكِتَابِ الإِسلَامِيِّ কায়রো।

ইসলামের দাওয়াত দানকারী জামাতের রূপরেখা

জেনে রাখা ভালো, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর নববি যুগে ও সাহাবায়ে কেরামের আমলে ইসলামের দাওয়াত দানকারী এমন কোনো জামাতের অস্তিত্ব ছিল না, যাদের দাওয়াত গ্রহণ না করলে, জিজিয়া প্রদানের আহ্বান ছিল না। এবং জিজিয়া প্রদান করতে অসম্মত হলে, যুদ্ধের আহ্বান ছিল না। উল্লেখ্য, এখানে ব্যক্তিবিশেষের কথা বলা হয়নি; জামাত ও দলের কথা বলা হয়েছে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষায় 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বারণ'-এর রূপরেখা

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ[১] আয়াত সম্পর্কে বলেন, তোমরা মানুষের জন্য কল্যাণকর এভাবে যে, তোমরা তাদের ঘাড়ে [আল্লাহর আনুগত্যের] শিকল লাগিয়ে টেনে আনবে। এক পর্যায়ে তারা ইসলামে দাখেল হবে।[২]

উল্লেখ্য, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তিটি كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ-এর পরবর্তী অংশ তথা تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ। [তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করো]-এর ব্যাখ্যা।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাখ্যা

তাবারানি রাহিমাহুল্লাহ 'আদ দুআ' কিতাবে হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই আয়াতের তাফসিরে বর্ণনা করেছেন,

---

১. তোমরা শ্রেষ্ঠতম জাতি, মানুষের [কল্যাণের] জন্য যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। (সুরা আলে ইমরান : ১১০)

২. সহিহ বুখারি : ৪৫৫৭

তিনি বলেছেন, তারা তাদেরকে আদেশ করবে যেন তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি দেয় এবং এর পক্ষে বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।[১]

সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজ হতে বারণ করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি অসংখ্য নস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী- وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

সৎকাজের আদেশ করো এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করো। (সুরা লুকমান : ১৭)

আমর-নাহি কখন হারাম ও কখন মুস্তাহাব?

গ্রন্থকার সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হতে বারণের জন্য দুটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। ১. তা যেন ফিতনার কারণ না হয়; ২. সম্বোধিত ব্যাক্তি তা গ্রহণ করবে বলে ধারণা থাকে।

প্রথম শর্তের ব্যাপারে ইমাম [আবু হামিদ] গাযযালি রাহিমাহুল্লাহর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হচ্ছে। তিনি বলেন,

যদি কেউ কোনো শক্তিশালী ফাসেক ব্যক্তিকে দেখে, যার কাছে তরবারি আছে এবং হাতে মদের পেয়ালা আছে, এবং সে জানে, যদি তাকে বারণ করা হয় তাহলে সে মদ পান করবে এবং তরবারি দিয়ে ঘাড় উড়িয়ে দেবে! এই অবস্থায় আমি 'সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হতে বারণ'-এর কোনো সুযোগ দেখি না। এটা নিরেট মৃত্যু! বরং কাম্য হলো, দীনের ক্ষেত্রে [সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হতে বারণের] কোনো প্রভাব থাকা এবং দীনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। পক্ষান্তরে কোনো প্রভাব না রেখে নিজেকে ধ্বংস করে দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং এটা হারাম হওয়া উচিত।

---

১. الدُّعَاءُ لِلطَّبَرَانِيِّ : ১৫৪৩, প্রথম প্রকাশ : ১৪১৩ হি., প্রকাশক : دَارُ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ বৈরুত।

'অসৎকাজ হতে বারণ' তখনই মুসতাহাব হবে, কর্তা যখন বারণ করা দ্বারা অসৎকাজটা দুর করতে সক্ষম হবে, অথবা তাতে কোনো উপকারিতা থাকবে। আর এর জন্য শর্ত হলো, কোনো ক্ষতি হলে তা নিজের ভেতর সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। যদি জানা থাকে যে, ক্ষতিটা নিজেকে অতিক্রম করে সাথি, নিকটাত্মীয় কিংবা বন্ধুদের পর্যন্ত গড়াবে, তাহলে 'সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হতে বারণ' জায়েজ থাকবে না, বরং হারাম হবে। কারণ, সে অসৎকাজটা দমন করতে পারছে না, উপরন্তু তা অন্য একটা অসৎকাজের জন্ম দিচ্ছে! এটাকে কোনোভাবেই 'সক্ষমতা' বলা যায় না।[১] খানিক পর আল্লামা খুরাশি রাহিমাহুল্লাহর উক্তি আসবে। তার কিয়াদংশও এ কথার সমর্থন করছে।

একটি ভিন্ন ফিতনা

এ ব্যাপারে আরেকটি ফিতনার কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আপনি যখন কাউকে এমন হাদিস শোনাবেন, যা তাদের মেধা গ্রহণ করতে অক্ষম, তখন সেটা তাদের কতকের জন্য ফিতনা হয়ে দাঁড়াবে।[২]

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ হজরত আলি কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মানুষকে সে কথাই বলো, যা তাদের নিকট পরিচিত। তোমরা কি এটা পছন্দ করো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মিথ্যা-প্রতিপন্ন করা হবে?[৩]

অর্থাৎ তোমরা কি এটা চাও যে, যখন মানুষকে তাদের বোধ-ক্ষমতার উর্ধ্বে কিছু বলবে, তখন তারা আল্লাহ ও রাসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বসবে? কারণ, তারা যখন তোমাদের কথা বুঝতে না

---

১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ২/২৩, ইমাম গাযযালি, প্রকাশক : دَارُ الْمَعْرِفَةِ বৈরুত।

২. সহিহ মুসলিম : ১৪

৩. সহিহ বুখারি : ১২৭

পারবে, তখন হয়তো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেবে! তারা সরাসরি আল্লাহ ও রাসুলকে মিথ্যাবাদী বলবে না, বরং কথাটি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হওয়াকে তারা সুদূরপরাহত মনে করবে। তখন মূলত তোমাদের মাধ্যমে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মিথ্যা-প্রতিপন্ন করে বসবে।

হাদিসে 'মানুষের পরিচিত কথা' বলতে বোঝানো হয়েছে, যে কথা তাদের মেধা গ্রহণ করতে সক্ষম, যেন তারা ফিতনার শিকার না হয়। যা পূর্ব থেকেই মানুষ জানে, তা বলা উদ্দেশ্য নয়। তাহলে তো তা চর্বিতচর্বণ হবে এবং উপকারবিহীন কথা হবে।

আমর-নাহি ফরজে কিফায়া হওয়ার শর্ত

গ্রন্থকার 'সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হতে বারণ' ওয়াজিব হওয়ার জন্য দ্বিতীয় যে শর্ত [সম্বোধিত ব্যাক্তি তা গ্রহণ করবে বলে ধারণা থাকা] উল্লেখ করেছেন, সে ব্যাপারে আল্লামা খুরাশি রাহিমাহুল্লাহর উক্তি উল্লেখ করা হচ্ছে। 'শরহু মুখতাসারিল খলিল' গ্রন্থে আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ খুরাশি রাহিমাহুল্লাহ [১০১০-১১০১ হি.] লিখেছেন, 'সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হতে বারণ' হলো ফরজে কিফায়া। এর জন্য শর্ত হলো :

১. আদেশকারী ব্যক্তি সৎকাজ ও অসৎকাজ সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে। যেন সে অসৎকাজ ভেবে কোনো সৎকাজ থেকে বারণ না করে এবং অসৎকাজকে সৎকাজ ভেবে আদেশ না করে!

২. যে অসৎকাজ থেকে বারণ করা হবে, এর চেয়ে বড় কোনো অসৎকাজ ঘটার আশঙ্কা না থাকতে হবে। যেমন, কেউ মদপান থেকে বারণ করতে গেল, এরপর মদ্যপ তাকে হত্যা করে ফেললো!

৩. এই বিষয়টি জানা থাকতে হবে অথবা প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, 'অসৎকাজ হতে বারণ' করা দ্বারা অসৎকাজটা দূর হয়ে যাবে এবং 'সৎকাজের আদেশে'র কোনো প্রভাব বা উপকারিতা থাকবে।

প্রথম দুটি শর্ত না থাকলে 'সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হতে বারণ' করা হারাম। আর তৃতীয় শর্তটি না থাকলে তা ওয়াজিব থাকবে না, বরং জায়েজ পর্যায়ের হবে অথবা মুসতাহাব স্তরের হবে।[১]

এই হলো আমার আকিদা। প্রকাশ্যে ও গোপনে এ সকল বিশ্বাস পোষণ করার মাধ্যমে আমি আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করি। শুরুতে ও শেষে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্যই।

* * *

হজরত দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'আল আকিদাতুল হাসানাহ' পুস্তিকা এ পর্যন্তই। ... دارُ العُلُومِ دِيُوبَنْد : مَدْرَسَةٌ فِكْرِيَّةٌ تَوْجِيْهِيَّةٌ কিতাবের ৪৬৮ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে,

هذه الزيادة زادَها الشيخ أبو الحسَن عليّ الحسَنيُّ الندويُّ، -وهو من علماء ديوبند انتماءً واستفادةً من دار العلوم- في كتابه «العقيدة والعبادة والسُّلوك» آخِذًا من كُتب العقائد وعلم التوحيد لبعض كبار علماء السُّنَّة [راجِع الكتابَ ص ٧٧-٨٣]، وهي زيادةٌ غيرُ مستنكَرَةٍ من الجماعة.

অর্থাৎ নিম্নের উক্তিগুলো সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রাহিমাহুল্লাহ -এর পক্ষ থেকে যুক্ত। আর তিনিও একজন দেওবন্দি মহান মনীষী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : কিতাবের শুরুতে 'নিরীক্ষকের আরজ' শিরোনামের অধীনে কিছু আলোচনা স্থানান্তর করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে 'তাকদিরের প্রতি ইমান'-এর পরের যে আলোচনাগুলো স্থানান্তরের কথা বলা হয়েছে, তা মূলত হজরত আলি নাদাবি রাহিমাহুল্লাহর সংযুক্ত মতনের ব্যাখ্যা।

---

১. شَرْحُ مُخْتَصَرِ الخَلِيْلِ لِلْخُرَشِيِّ খ. ৯, পৃ. ৪৩৬

তাকদিরের প্রতি ইমান

তাকদিরের ভালো-মন্দ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ.

আমি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। (সুরা কামার : ৪৯)

অর্থাৎ প্রতিটি জিনিস সেই পরিমাণে সৃষ্টি করেছি, যা আমি নির্ধারণ করে রেখেছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি। এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান রয়েছে এবং এটি লওহে মাহফুজেও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন,

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ.

পৃথিবীতে অথবা তোমাদের প্রাণের ওপর যে মুসিবত দেখা দেয়, আমি মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্ব হতেই তা এক কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সুরা হাদিদ : ২২)

অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টির আগেই তা লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ আছে।

ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন, 'জেনে রাখো, যদি সমগ্র উম্মত তোমার কোনো উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার কোনো ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে

রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ [তাকদিরের লিপি] শুকিয়ে গেছে।[১]

হাদিসে জিবরিল নামক প্রসিদ্ধ হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমানের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন, 'তুমি আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রাসুলগণ ও আখেরাতের ওপর ইমান আনবে। এবং ইমান আনবে ভালো-মন্দ তাকদিরের ওপর।'[২]

যা কিছু অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং যা অস্তিত্ব লাভ করবে, সবকিছুই আল্লাহ তাআলার সত্তাগত চিরন্তন ইলমের আওতায় রয়েছে। প্রতিটি জিনিস অস্তিত্বে আসার পূর্বে তিনিই তা অস্তিত্বে আসার বিষয়টি নির্ধারণ করেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

তোমার রব থেকে আসমান ও জমিনের এক অণু-পরিমাণ জিনিসও গোপন থাকে না। এবং এর চেয়ে ছোট ও এর চেয়ে বড় এমন কিছু নেই, যা এক স্পষ্ট কিতাবে [অর্থাৎ লাওহে মাহফুজে] লিপিবদ্ধ নেই। (সুরা ইউনুস : ৬১)

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আকাশমণ্ডল ও জমিন সৃষ্টির ৫০,০০০ [পঞ্চাশ হাজার] বছর পূর্বেই আল্লাহ তাআলা মাখলুকের তাকদির লিখে রেখেছেন।'[৩]

---

১. সুনানুত তিরমিজি : ২৫১৬

২. সহিহ মুসলিম : ১০২

৩. সহিহ মুসলিম : ৬৯১৯

শাইখ আলি তানতাবির ভাষায় তাকদির

তাকদির বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য এখানে শাইখ আলি তানতাবি রাহিমাহুল্লাহর [১৩২৭-১৪২০ হি.] কিছু কথা উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন, কখনও কখনও মানুষ আল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এবং তাঁর ওপর ভরসা করে সম্ভাব্য সকল উপকরণ গ্রহণ করে, ঐকান্তিক চেষ্টা করে এবং শক্তি ব্যয় করে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। কতো রোগি সবচেয়ে বড় চিকিৎসকের কাছে যায়, সবচেয়ে বড় হাসপাতালে ভর্তি হয়, কিন্তু সুস্থ হয় না! কতো ব্যক্তি চাকরি খোঁজে; জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সার্টিফিকেট, চরিত্র ইত্যাদি সকল প্রয়োজনীয় জিনিস একত্রিত করে, কিন্তু চাকরি পায় না! এ ধরণের উদাহরণ অসংখ্য।

এগুলো দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, শুধু উপকরণ সর্বদা গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয় না। এর পেছনে ভিন্ন কিছু রয়েছে। তার মাধ্যমেই লাভ হয়, ক্ষতি হয়। সুস্থতা আসে, মৃত্যু আসে। সফলতা আসে, ব্যর্থতা আসে। একেই মূর্খরা বলে কপাল, ধর্মদ্রোহীরা বলে কাকতালীয় বিষয়। আর বুদ্ধিমান মুমিনরা জানে এর নাম হলো কাযা ও কদর, তা আসবাব [উপকরণ] ও মুসাব্বাবের [কর্মসমূহের] সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার কর্ম।[১]

মুমিনের উচিত হলো আমল করা ও প্রচেষ্টা করা, তাকদিরের ওপর কোনো বিষয় অর্পণ করা নয়, এ বিষয়টি বোঝার জন্য এখানে শাইখ আবুল ওয়াফা মুহাম্মাদ দারবিশ রাহিমাহুল্লাহর [মৃ. ১৩৮২ হি.] 'আমরা তাকদির দ্বারা তাকদির প্রতিহত করি' শীর্ষক একটি দরস উল্লেখ করা উপযোগী মনে হচ্ছে।

---

১. البَيَانُ فِي أَرْكَانِ الإِيمَانِ কিতাবের ৪৮০-৪৮১ পৃষ্ঠার বরাতে শাইখ আলি তানতাবি রচিত خَوَاطِرُ فِي تفسيرِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

তাকদির দ্বারা তাকদির প্রতিহত করা

শরিয়ত আমাদের তাকদির দ্বারা তাকদির প্রতিহত করতে আহ্বান করে। উদাহরণস্বরূপ ক্ষুধা একটি তাকদির, আমরা খাবার গ্রহণের তাকদির দ্বারা তা প্রতিহত করি। পিপাসা একটি তাকদির, আমরা পান করার তাকদির দ্বারা তা প্রতিহত করি। রোগ একটি তাকদির, আমরা ওষুধের মাধ্যমে তা প্রতিহত করি। এটিও একটি তাকদির।

কোনো ব্যক্তি যদি উদাহরণস্বরূপ ক্ষুধা বা পিপাসার তাকদির মেনে নেয়, অথচ সে তা প্রতিহত করতে সক্ষম, আর এমন অবস্থায় সে মারা যায়, তাহলে সে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে মারা যাবে। কারণ নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে তিনি নিষেধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন–

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

তোমরা নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। (সুরা বাকারা : ১৯৫)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টি পরিপূর্ণ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যখন তাঁকে বলা হয়েছে, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা যে ওষুধ গ্রহণ করি, ঝাঁড়ফুক দ্বারা চিকিৎসা করি এবং কৌশল দ্বারা নিজেদের বাঁচাই, এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন? এগুলো কি আল্লাহর তাকদির প্রতিহত করতে পারে? তিনি বললেন, এগুলোও আল্লাহর তাকদির।[১]

এই প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাবটি মানুষকে ভালো কাজের প্রতি উচ্চাভিলাষী করে তোলে। উপকরণ গ্রহণের পাশাপাশি সতর্কতা অবলম্বনের প্রতি আহ্বান জানায়।

---

১. তিরমিজি ফিত তিব্বি : ২০৬৬, ফিল কাদারি : ২১৪৯, তিনি এটিকে হাসান বলেছেন।

হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মহামারীর কারণে শাম থেকে ফিরতে চাইলেন, তখন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি কি আল্লাহর তাকদির থেকে পালাচ্ছেন? উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আবু উবাইদা, যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ এই কথা বলতো! হ্যাঁ, আমি আল্লাহর এক তাকদির থেকে অন্য তাকদিরের দিকে পালাচ্ছি।

আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা ও অগ্রগামিতা সত্ত্বেও, তাকদিরের এই অর্থ না বুঝতে পারার কারণে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তা অপছন্দ করেছেন। তিনি বুঝিয়েছেন, তাকদির সকল জিনিসকে বেষ্টন করে রেখেছে। অতএব, যার থেকে পালানো হচ্ছে, তা-ও আল্লাহর তাকদির, যার দিকে পালানো হচ্ছে তা-ও আল্লাহর তাকদির। মহামারি আল্লাহর তাকদির, মহামারি থেকে আত্মরক্ষাও আল্লাহর তাকদির।

এরপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো একটি উদাহরণ দিলেন। তিনি বললেন, যদি তোমার একটি উট থাকে, আর তোমার সামনে একটি সজীব ভূমি থাকে এবং একটি শুষ্ক ভূমি থাকে, তখন তুমি সজীব ভূমিতে উট চরালে তা কি আল্লাহর তাকদির নয়? এবং শুষ্ক ভূমিতে চরালে তা-ও কি আল্লাহর তাকদির নয়? আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, অবশ্যই। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এটিও তেমনই।'[১]

মহান ফকিহ শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রাহিমাহুল্লাহ [৪৭০-৫৬১ হি.] কী চমৎকার বলেছেন : 'পুরুষ সে নয়, যে নিজেকে তাকদিরের হাতে ছেড়ে দেয়। বরং পুরুষ তো সে-ই, যে তাকদির

১. সহিহ বুখারি : ৫৭২৯, সহিহ মুসলিম : ২২১৯, দুটি গ্রন্থেই কিতাবুত তিব্ব দ্রষ্টব্য, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদিস।

দ্বারা তাকদির প্রতিহত করে!' অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, 'আমরা উত্তম তাকদির থেকে অতি-উত্তম তাকদিরের দিকে পলায়ন করি।' এটি হলো বিবেক ও শরিয়তের নির্যাস থেকে উৎসারিত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ বাণী। এর ভিত্তি ও সূত্র পবিত্র কুরআন ও হাদিসে রয়েছে।[১]

অতএব বোঝা গেলো, বান্দার জীবনে কল্যাণ পূর্ণ হয় কেবল তাকদির দ্বারা তাকদির প্রতিহত করার মাধ্যমে। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাকদিরসমূহ নির্ধারণ করেন, এবং কিছু তাকদিরকে অন্য তাকদিরের দ্বারা প্রতিহত হওয়ার ব্যাপারটিও নির্ধারণ করেন।

তাকদির প্রতিহত করার দুই পদ্ধতি

এক. যে তাকদিরের আসবাব [হেতু বা উপকরণ] প্রকাশ পেয়ে গেছে, কিন্তু তাকদির এখনও ঘটেনি, তাকে অন্য তাকদির দ্বারা প্রতিহত করা এবং তা ঘটতে না দেওয়া। যেমন অপেক্ষমান শত্রুদলকে রণপ্রস্তুতি গ্রহণ ও সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে প্রতিহত করা। আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী এদিকেই ইশারা করছে–

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ.

[হে মুসলিমগণ!] তোমরা তাদের [মোকাবিলার] জন্য যথাসাধ্য শক্তি[২] ও অশ্বপালন প্রভৃতি প্রস্তুতি গ্রহণ করো, যা দ্বারা তোমরা

---

১. التَّصْرِيْحُ بِمَا تَوَاتَرَ فِي نُزُوْلِ الْمَسِيْحِ কিতাবের শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহিমাহুল্লাহ লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২. ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সহিহ গ্রন্থে ৫০৫৫ নং হাদিসে হজরত উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরে বসে

আল্লাহর শত্রু ও নিজেদের শত্রুদেরকে সন্ত্রস্ত করে রাখবে এবং তাদের ছাড়া সেই সব শত্রুদেরকেও যাদেরকে তোমরা এখনও জানো না, [কিন্তু] আল্লাহ তাদের জানেন। (সুরা আনফাল : ৬০)

তিনি আরো ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا.

হে মুমিনগণ! তোমরা [শত্রুর সাথে লড়াইকালে] সতর্কতা অবলম্বন করো। অতঃপর পৃথক পৃথক বাহিনীরূপে [জিহাদের জন্য] বের হও কিংবা সকলে একই সঙ্গে বের হও। (সুরা নিসা : ৭১)

দুই. ঘটে যাওয়া তাকদির ভিন্ন তাকদির দ্বারা প্রতিহত করা। যেমন, ওষুধ দ্বারা রোগ প্রতিহত করা। এ ব্যাপারে আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহর বান্দারা, [অসুস্থ হলে] চিকিৎসা গ্রহণ করো। কারণ, আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার ওষুধ নেই। তবে একটি রোগ ব্যাতীত। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসুল, সেটি কী? তিনি বললেন, বার্ধক্য।[১]

সুতরাং তাকদির দুর করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও, তাকদিরের কাছে আত্মসমর্পণ করলে তা আলস্য, অবহেলা ও ঘাটতি বলে বিবেচিত হবে। আর এগুলো থেকে আমাদের বারণ করা হয়েছে। তাই আমাদের উচিত হলো, সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা, কর্মের পরিণাম বিবেচনা করা, উত্তম বিষয়ের আশা করা, সাফল্যের লক্ষ্যে আমল করা, অকল্যাণ থেকে পলায়ন করা এবং এর থেকে

বলতে শুনেছি, 'জেনে রাখো, শক্তি হলো ক্ষেপণশক্তি, জেনে রাখো, শক্তি হলো ক্ষেপণশক্তি, জেনে রাখো, শক্তি হলো ক্ষেপণশক্তি!'।

১. আবু দাউদ ফিত তিব্ব : ৩৮৫৫, তিরমিজি ফিত তিব্ব : ২০৩৮, হাদিসটি হাসান সহিহ।

মুক্তির জন্য আমল করা। 'তাকদিরের প্রতি ইমান' যেন আমাদের এবং এ বিষয়গুলোর মাঝে প্রতিবন্ধক না হয়।[১]

আল্লাহ তাআলা জানেন, মানুষ দুর্বল। প্রবৃত্তি মানুষের ওপর ছেয়ে থাকে। শয়তান তা মানুষের সামনে সাজিয়ে তোলে। ফলে মানুষ পাপে লিপ্ত হয়ে যায়। তাই আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হয়ে খাঁটি তাওবার মাধ্যমে মানুষের পাপের চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। বস্তুত তিনি গুনাহের তাকদির মিটিয়ে ফেলার জন্য তাওবার আদেশ করেছেন।

অতএব যে ব্যক্তি গুনাহের তাকদিরকে তাওবা দ্বারা প্রতিহত করলো, যেভাবে ক্ষুধার তাকদিরকে খাবার দ্বারা প্রতিহত করে, সে ব্যক্তি মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরলো। আর যে ব্যক্তি অবাধ্যতা ও অনীহায় একগুঁয়ে হয়ে রইলো, সে তার নিজের বিরুদ্ধেই অন্যায় আচরণ করলো। আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার ওপর বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না।

---

১. সতর্কতা অবলম্বন করা এবং উপকরণ গ্রহণ করা দ্বারা তাকদির প্রতিহত হোক বা না-হোক, শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তা অবশ্যই কাম্য। মহান তাবেয়ি মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ শিখখির রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৯৫ হি.] বড় চমৎকার কথা বলেছেন,

কারো জন্য এ সুযোগ নেই যে, সে ওপরে উঠে নিচে লাফ দিয়ে বলবে, 'আমার রব আমার জন্য এটা নির্ধারণ করে রেখেছেন'। বরং তার কাজ হলো সতর্ক থাকা এবং চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। যদি কোনো বিপদের শিকার হয়ে যায়, তাহলে বুঝে নেবে, তার জন্য যে বিপদ লিখে রাখা হয়েছে, তাতেই সে আক্রান্ত হয়েছে।

যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ [১/৬৪] কিতাবে তাঁর জীবনীতে উক্তিটি উল্লেখ করেছেন। আমরা এটি গ্রহণ করেছি رِسَالَةُ الْمُسْتَرْشِدِيْنَ কিতাবের [পৃ. ১০১] টীকা থেকে।

আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে রেখেছেন; চেষ্টা-প্রচেষ্টা হলো দুনিয়াতে সফলতা ও কল্যাণ অর্জনের মাধ্যম। আর নেক আমল হলো আখেরাতে নিয়ামত লাভ করে সফল হওয়ার উপায়। এখন আমরা যদি আমলে ত্রুটি করি এবং এর মন্দ ফল আমাদের ঘিরে ধরে, তাহলে আমরাই নিন্দা ও শাস্তির উপযুক্ত হবো। কারণ আমরা সতর্কতা অবলম্বন করতে, দীনের প্রতি যত্নবান হতে, নিজেদের জন্য কল্যাণ আহরণ করতে এবং সাধ্যমতো নিজেদের থেকে অকল্যাণ দূর করতে আদিষ্ট।

মুমিনের জন্য আবশ্যক হলো আমল করা ও চেষ্টা করা। তাকদিরের নিকট আত্মসমর্পণ করা নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্যই জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে আবাস নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি এর ওপর ভরসা করব না? তিনি বললেন, না, তোমরা আমল করো। কারণ, প্রত্যেকের জন্য সেই আমল করা সহজ, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[১]

বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیۡءٍ.

আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা। (সুরা যুমার : ৬২)

---

১. সহিহ বুখারি কিতাবুল কদর : ৭৫৫২, সহিহ মুসলিম কিতাবুল কদর : ২৬৪৭, দুটি হাদিসই আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। শাইখ আবুল ওয়াফা মুহাম্মাদ দারবিশ রাহিমাহুল্লাহর আলোচনা এখানে সমাপ্ত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ.

তিনি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। (সুরা আনআম : ১০১)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন,

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ.

অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর, তা সৃষ্টি করেছেন! (সুরা সাফফাত : ৯৬)

এবং বান্দার অর্জন

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ.

কিয়ামতের দিন আমি তাকে দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন করাব! [সেদিন তাকে বলা হবে,] তা তোমার দু-হাত যা পূর্বে প্রেরণ করেছে, তার বিনিময়ে। (সুরা হজ : ৯-১০)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা উপার্জন করেছে, তা পুরোপুরি দেওয়া হবে। তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (সুরা বাকারা : ১৮১)

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

وَلٰكِن يُّؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ.

কিন্তু তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন, তোমাদের অন্তর যা অর্জন করেছে তার কারণে। (সুরা বাকারা : ২২৫)

'অর্জন'-এর অর্থ হলো, বান্দা তার সামর্থ ব্যয় করা, যা আল্লাহ তাআলা তাকে দান করেছেন এবং আদেশ করেছেন তাঁর আনুগত্যে তা ব্যয় করতে।

কাদারিয়্যাহ ও জাবরিয়্যাহ ফিরকা গোমরাহ হওয়ার কারণ

ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দি রাহিমাহুল্লাহ [৩৩৩-৩৭৩ হি.] 'শরহুল ফিকহিল আবসাত' গ্রন্থে[১] লিখেছেন, 'দুটো দল পথভ্রষ্ট হয়েছে– কাদারিয়্যাহ এবং জাবরিয়্যাহ। কাদারিয়্যাহ গোষ্ঠী আল্লাহর 'কর্মসমূহ সৃষ্টি' সংক্রান্ত গুণটি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আর জাবরিয়্যাহ গোষ্ঠী বান্দার মন্দ কাজগুলোকে আল্লাহর দিকে নিসবত করেছে। আল্লাহ তাআলা এর থেকে উর্ধ্বে এবং পবিত্র। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর সাথিরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সৃষ্টি করা হলো আল্লাহর কাজ। বান্দার কর্ম সৃষ্টি করা অর্থ হলো, বান্দাকে সামর্থ্য দেওয়া। আর সেই সামর্থ্যকে কাজে লাগানো বাস্তবিক অর্থেই বান্দার কাজ, রূপকার্থে নয়। ফলে তারা কাদারিয়্যাহ এবং জাবরিয়্যাহ গোষ্ঠীর ভ্রান্তি থেকে মুক্ত রয়েছেন।'

অর্জন ও সৃষ্টির পার্থক্য

মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, অর্জন করা এবং সৃষ্টি করার মধ্যে পার্থক্য হলো, অর্জন এমন বিষয়, যাতে অর্জনকারী ব্যক্তি স্বনির্ভর নয়। পক্ষান্তরে সৃষ্টি এমন বিষয়, যাতে স্রষ্টা স্বনির্ভর। কেউ কেউ বলেন, যা কোনো 'মাধ্যম' দ্বারা সংঘটিত হয়, তা অর্জন। আর যা কোনো 'মাধ্যম' ছাড়াই সংঘটিত হয়, তা সৃষ্টি।[২]

তাকদিরের দুই প্রকার

১. যেসব বিষয় কেবল আল্লাহ তাআলার নির্ধারণেই বান্দার ওপর আসে। এতে বান্দার কোনো ইচ্ছা বা এখতিয়ার থাকে না।

---

১. المِنَحُ الإلهِيَّةُ شَرْحُ العقيدةِ الطَّحَاوِيَّةِ পৃ. ১০৬ দৃষ্টব্য।

২. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১১৪

যেমন, অস্তিত্বে আসা ও অস্তিত্বহীন হওয়া, লম্বা হওয়া ও খাটো হওয়া, সুন্দর হওয়া ও অসুন্দর হওয়া, মেধাবী হওয়া ও মেধাহীন হওয়া, সুস্থ হওয়া ও অসুস্থ হওয়া, বেঁচে থাকা ও মৃত্যুবরণ করা... এবং এ জাতীয় যতো বিষয় বান্দার সাথে ঘটে, যাতে বান্দার কোনো দখল থাকে না এবং সে তার কারণও নয়, এ ধরণের বিষয়ে আমরা জিজ্ঞাসিত হব না। আমাদের উচিত, এ ধরণের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা এবং এই বিশ্বাস করা যে, এগুলো পূর্বলিখিত তাকদিরের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। এগুলোর পেছনে এমন হিকমত ও প্রজ্ঞা রয়েছে, যা কখনও আমাদের সামনে প্রকাশ পায়, আর কখনও গুপ্ত থাকে। কখনও তার কিছু বিষয় আমরা জানতে পারি, আর অনেক বিষয় আমাদের অজান্তে থেকে যায়।

এ ধরণের বিষয়ে ভালোর জন্য বান্দাকে সওয়াব দেওয়া হয় না, এবং খারাপের জন্য বান্দাকে শাস্তি দেওয়া হয় না।

এ প্রকারে কেবল বান্দার পক্ষ থেকে প্রকাশ-পাওয়া কর্মের প্রতিক্রিয়ার জন্য শাস্তি বা সওয়াব দেওয়া হয়। কারণ নিয়ামত পেলে ওয়াজিব হলো, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, যেন শুকরিয়ার সওয়াব পাওয়া যায়। অপরদিকে মুসিবত এলে ওয়াজিব হলো, ধৈর্যধারণ করা। আর এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সওয়াব ও প্রতিদান দেবেন।

২. যেসব বিষয় পূর্ব থেকে আল্লাহ তাআলার ইলম ও হিকমত অনুযায়ী বান্দার ওপর আসে,... তবে তাতে মানুষের ইচ্ছা, আমল ও ইখতিয়ার থাকে এবং সে তার কারণ হয়। যেমন : মুবাহ বিষয়গুলোর মধ্যে খাওয়া, পান করা, পোশাক পরা

ইত্যাদি। আনুগত্যসমূহের মধ্যে সালাত, আল্লাহর পথে ব্যয়, জিহাদ ইত্যাদি। হারাম বিষয়গুলোর মধ্যে, যিনা, চুরি, মদ পান করা ইত্যাদি।

অতএব এই আমলগুলো আল্লাহর জ্ঞান, লিখন, ইচ্ছা ও কুদরত অনুসারেই হয়ে থাকে।

এ ধরণের তাকদিরে উত্তম কাজের বিনিময়ে মানুষকে বহুগুণে সওয়াব দেওয়া হয়, এবং মন্দ কাজের জন্য তার কর্ম অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয়।

মুমিনরা বিশ্বাস করে যে, বান্দার সকল কাজ –ইচ্ছামূলক হোক কিংবা বাধ্যতামূলক– আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও পূর্বনির্ধারণের মাধ্যমেই হয়। কাজ সংঘটিত হওয়ার আগেই আল্লাহ তাআলা তা জানেন।

তাকদির বোঝার ক্ষেত্রে দুটি ভুল

তাকদিরের দুটি প্রকারের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। তাকদির বুঝতে গিয়ে অনেক মানুষই ভুল করে উভয় প্রকারকে এক বানিয়ে ফেলে। ফলে বড় ধরণের দুটো ভুল বিশ্বাসের শিকার হয়–

১. মানুষ বাধ্য। তাকদিরের ওপর ইমান আনলে কোনো আমল করার ও আসবাব গ্রহণ করার দরকার নেই। ফলে তারা অন্ধভাবে ভরসা করে বসে থাকে।

২. তাকদির হলো জুলুম। তাকদিরের ওপর ইমান আনলে ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের স্বাধীনতা হারিয়ে যায়। এ কারণে তারা তাকদিরকে অস্বীকার করে। ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

তাকদিরের প্রতি ইমান-এর প্রভাব

মুমিনের জীবনে 'তাকদিরের প্রতি ইমান'-এর প্রচুর প্রভাব ও উপকারী ফল রয়েছে।

১. উপকরণ গ্রহণের সময় আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা সৃষ্টি হয়। কেননা তিনিই আসবাব ও মুসাব্বাব নির্ধারণকারী।

২. যখন বান্দা বুঝতে পারে, সবকিছুই আল্লাহ তাআলার তাকদির ও ফায়সালার মাধ্যমে হয়, তখন তার আত্মিক প্রশান্তি ও হৃদয়ের সুকুন অর্জিত হয়।

৩. তাকদিরে বিশ্বাসী ব্যক্তির উদ্দেশ্য অর্জন হলে আত্মমুগ্ধতা আসে না। কারণ তা অর্জন হওয়া আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। তিনি ওই উপকরণের মাধ্যমে তার জন্য কল্যাণ ও সফলতা নির্ধারণ করেছেন। ফলে সে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করে এবং আত্মমুগ্ধতা ঝেড়ে ফেলে।

৪. উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে, কিংবা অপছন্দনীয় কিছু ঘটলে পেরেশান হয়ে পড়ে না। কারণ সে জানে, তা আল্লাহ তাআলার ফায়সালা ও তাকদিরেই হয়েছে। ফলে সে এর ওপর ধৈর্যধারণ করে এবং সওয়াবের আশা করে।[১]

---

১. أُصُوْلُ الإيمانِ فِي ضَوْءِ الكتابِ والسُّنَّةِ পৃ. ২৪৮-২৪৯।

কিয়ামত প্রসঙ্গ

আমরা কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করি, হাদিসে যেভাবে আছে সেভাবে।

কিয়ামতের আলামতগুলো দুই ধরণের হয়ে থাকে। ১. আলামতে সুগরা বা ছোট আলামত। ২. আলামতে কুবরা বা বড় আলামত।

কিয়ামতের ছোট আলামত

১. **আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন।** ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি এবং কিয়ামত এ দুটির [দূরত্বের] মতো করে প্রেরিত হয়েছি।' তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলদুটি মিলিয়ে এ কথা বলেছেন। এর অর্থ হলো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কিয়ামতের মাঝে অন্য কোনো নবি আসবেন না। নবিজির পরেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।[১]

২. **মানুষের দায়দায়িত্ব অনিরাপদ হাতে থাকা।** ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন আমানত নষ্ট হবে, তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করো।' প্রশ্নকারী ব্যক্তি বললো, আমানত কিভাবে নষ্ট হয়? তিনি বললেন, 'যখন দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা হবে, তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করো।'[২]

---

১. সহিহ মুসলিম : ৭৫৯৭

২. সহিহ বুখারি : ৫৯

৩. **সন্তানরা প্রচুর অবাধ্য হবে। নিঃস্ব-গরিব ব্যক্তিরা উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে**। হাদিসে জিবরিলে রয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে বলেছেন, 'বাঁদি তার মনিবকে জন্ম দেবে। তোমরা নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, দরিদ্র রাখালদের বড় বড় ভবন নির্মানের প্রতিযোগিতায় মত্ত দেখতে পাবে।[১]

কিয়ামতের বড় আলামত

১. কিয়ামতের প্রথম বড় আলামত হলো, **আল্লাহর খলিফা মাহদি রাহিমাহুল্লাহর আগমন**।[২] আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যদি দুনিয়ার মাত্র একদিনও অবশিষ্ট থাকে, তবে আল্লাহ সেই দিনকে দীর্ঘ করবেন। এরপর আমার হতে [অথবা বলেছেন, 'আমার পরিবার হতে'] একজন লোক আবির্ভূত করবেন, যার নাম আমার নামের সঙ্গে ও পিতার নাম আমার পিতার নামের সঙ্গে মিলবে। সে পৃথিবীকে আদল-ইনসাফে পরিপূর্ণ করবে, যেভাবে তা জুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল।[৩]

আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাহদি হবে আমার থেকে। সে হবে প্রশস্ত ললাটের অধিকারী, উন্নত নাকবিশিষ্ট। সে পৃথিবীকে

---

১. সহিহ মুসলিম : ১০২, হজরত উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে।

২. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২২৯

৩. সুনানে আবু দাউদ : ৪২৮৪

আদল-ইনসাফে পরিপূর্ণ করবে, যেভাবে তা জুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। সে সাত বছর রাজত্ব করবে।[১]

'মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা' কিতাবে আছে, তিনি সাত বছর, আট বছর কিংবা নয় বছর রাজত্ব করবেন।[২]

মাহদি প্রথমে হারামাইন শরিফাইনে প্রকাশ হবেন। তারপর বাইতুল মাকদিসে আসবেন।[৩]

২. **অতঃপর মাসিহ দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে**। দাজ্জাল একজন মানুষ। ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। সে অবস্থান করবে চল্লিশ ...আমি জানি না, চল্লিশ দিন, চল্লিশ মাস, না-কি চল্লিশ বছর...![৪]

৩. **এরপর আসবেন ইসা আলাইহিস সালাম**। তিনি আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। যেমনটি উপর্যুক্ত হাদিসের পরের অংশে বলা হয়েছে, 'অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করবেন, তাঁর আকৃতি হবে উরওয়া বিন মাসউদ-এর মতো। তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বের করে হত্যা করবেন।' আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا.

---

১. সুনানে আবু দাউদ : ৪২৮৭

২. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩৭৬৩৮, প্রথম প্রকাশ : ১৪০৯ হি., প্রকাশক : مَكْتَبَةُ الرُّشْدِ রিয়াদ।

৩. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২২৯

৪. সহিহ মুসলিম : ৭৫৬৮

আর নিশ্চয় সে [ইসা আলাইহিস সালাম] কিয়ামতের এক নিদর্শন। সুতরাং তোমরা তার [কিয়ামত] সম্পর্কে সংশয় পোষণ করো না। (সুরা যুখরুফ : ৬১)

অর্থাৎ ইসা আলাইহিস সালামের অবতরণ হলো কিয়ামতের একটি আলামত। অতএব তোমরা তাতে সন্দেহ পোষণ করো না।

ইমাম বুখারি ও মুসলিম রাহিমাহুমাল্লাহ [হাদিসের শব্দ বুখারির] হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, অতি-অবশ্যই তোমাদের মধ্যে মারইয়ামের পুত্র [ইসা আলাইহিস সালাম] একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে অবতরণের সময় নিকটবর্তী হয়েছে।[১] তিনি ক্রুশ ভাঙবেন।[২] শুকর হত্যা করবেন। জিযিয়ার বিধান রহিত করবেন।[৩] সম্পদ এতো বেশি হবে যে, তা কেউ গ্রহণ করবে না। তখন দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যবর্তী যা কিছু আছে, তা থেকে একটি সিজদাহ উত্তম হবে।' এরপর আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা যদি চাও, তা হলে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করো–

---

১. তিনি স্বতন্ত্র রিসালাত ও নতুন শরিয়ত নিয়ে আগমন করবেন না। বরং এই উম্মতের একজন শাসক হিসেবে আসবেন এবং শরিয়তে মুহাম্মদির আলোকেই শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।

২. বাস্তবিক অর্থেই তিনি ক্রুশ ভাঙবেন এবং খ্রিষ্টানরা এর প্রতি অন্তরে যে সম্মান লালন করে, তা নিশ্চিহ্ন করবেন।

৩. অর্থাৎ জিযিয়া গ্রহণ করবেন না। কাফেরদের থেকে কেবল ইসলামই গ্রহণ করবেন। কেউ জিযিয়া দিলেও তা যথেষ্ট হবে না। ইসলাম গ্রহণ করবেন, নয়তো হত্যা করবেন।

وَاِنۡ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهٖ قَبۡلَ مَوۡتِهٖ‌ ۚ وَيَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ يَكُوۡنُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيۡدًا‌ ۚ

আহলে কিতাবের প্রত্যেকে অবশ্যই তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ইমান আনবে। আর [যারা তাঁর প্রতি ইমান আনবে না] কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন। (সুরা নিসা : ১৫৯)[১]

মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অতঃপর ইসা আলাইহিস সালাম শামদেশের দামেশকে পূর্ব মিনার থেকে অবতরণ করবেন। এরপর দাজ্জালের কাছে আসবেন এবং তখনই এক আঘাতে তাকে হত্যা করবেন। কারণ, আকাশ থেকে ইসা আলাইহিস সালামের অবতরণের সময়, পানিতে লবন গলে যাওয়ার মতো সে গলে যাবে। এরপর ইসা আলাইহিস সালাম মাহদির সাথে সাক্ষাত করবেন।[২]

ইমাম আবু দাউদ তায়ালিসি রাহিমাহুল্লাহ [১৩৩-২০৪ হি.] হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইসা আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে অবতরণের পর ৪০ বছর বসবাস করবেন। তারপর মৃত্যুবরণ করবেন। মুসলমানগণ তাঁর জানাজা পড়বে এবং তাকে দাফন করবে।[৩]

মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে তিনি ৭ বছর অবস্থান করবেন। বলা হয়, এটিই বিশুদ্ধ অভিমত এবং ৪০ বছর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাঁকে আসমানে

---

১. সহিহ বুখারি : ৩৪৪৮, সহিহ মুসলিম : ৪০৬

২. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২২৯

৩. মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসি : ২৬৬৪, প্রথম প্রকাশ : ১৪১৯ হি., প্রকাশক : دَارُ هَجْر মিশর।

উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বে ও পরে অবস্থানের মোট সময়কাল। কারণ, তাঁকে যখন উঠিয়ে নেওয়া হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৩ বছর।[১]

৪. **এরপর ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হবে**। তারা একটি মূর্খ ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ.

অবশেষে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে খুলে দেওয়া হবে, তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে ছুটে আসবে। (সুরা আম্বিয়া : ৯৬-৯৭)

অর্থাৎ বাদশাহ জুলকারনাইন তাদেরকে যে প্রাচীরের পেছনে বন্দী করে রেখেছিলেন, যখন তা খুলে দেওয়া হবে।

মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইয়াজুজ-মাজুজকে আল্লাহ তাআলা ইসা আলাইহিস সালামের দুআর বরকতে ধ্বংস করে দেবেন। তারপর মুসলমানরা মৃত্যুবরণ করবে।[২]

৫. **পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবে**। ইমাম বুখারি ও মুসলিম রাহিমাহুমাল্লাহ হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যতক্ষণ-না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, ততক্ষণ কিয়ামত সংঘটিত হবে না। যখন মানুষ তা দেখবে, তখন পৃথিবীর সবাই ইমান আনবে। সেটি হচ্ছে এমন সময়, যখন তাদের ইমান কোনো কাজে আসবে না, যারা পূর্বে ইমান আনেনি।[৩]

---

১. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২২৯-২৩০

২. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২৩০

৩. সহিহ বুখারি : ৪১৩, সহিহ মুসলিম : ৪৬৩৫

৬. **দাব্বাতুল আরদের আত্মপ্রকাশ ও মানুষের সঙ্গে তার কথা বলা।** আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ.

আর যখন তাদের ওপর 'বাণী' [আযাবের বাণী] বাস্তবায়িত হবে, তখন আমি মাটি থেকে একটি জন্তু বের করব, যে তাদের সাথে কথা বলবে যে, [আখেরাতে অবিশ্বাসী] লোকেরা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস রাখত না[১]। (সুরা নামল : ৮২)

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হলো, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া এবং চাশতের সময় একটা জন্তু মানুষের নিকট বের হওয়া। এ দুটির যে কোনো একটি প্রথমে প্রকাশ পাবে, পরক্ষণে অপরটিও দ্রুত প্রকাশ পাবে।[২] দাব্বাতুল আরদ হলো জমিনের প্রথম নিদর্শন, আর পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হলো আসমানের প্রথম নিদর্শন।

৭. **আবিসিনিয়ার ছোট নলা বিশিষ্ট এক লোকের হাতে কাবা শরিফ ধ্বংস হওয়া** এবং কাবার অলঙ্কার লুণ্ঠন হওয়া। ইমাম বুখারি ও মুসলিম রাহিমাহুমাল্লাহ হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আবিসিনিয়ার ছোট নলা বিশিষ্ট এক লোক কাবা শরিফ ধ্বংস করবে।[৩]

---

১. অর্থাৎ চিহ্নিত করে দেবে, কে ইমানদার, আর কে কাফের।

২. সহিহ মুসলিম : ৭৫৭০

৩. সহিহ বুখারি : ১৫৯৬, সহিহ মুসলিম : ৭৪৮৯

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, আবিসিনিয়ার ছোট নলা বিশিষ্ট এক লোক কাবা ধ্বংস করবে, তার অলঙ্কার লুণ্ঠন করবে এবং তার গিলাফ কেড়ে নেবে। আমি যেন তাকে দেখছি, টাকমাথা, হাড়ের বাঁকা জোড়াবিশিষ্ট, তার কোদাল ও কুঠার দিয়ে কাবাঘরে আঘাত করছে।[১]

৮. **কুরআন পাক উঠিয়ে নেওয়া।** ইবনে মাজাহ রাহিমাহুল্লাহ হজরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামের চিহ্নসমূহ মুছে যাবে, যেভাবে কাপড়ের কারুকার্য মিটে যায়। শেষে এমন অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না, সিয়াম কী, সালাত কী, কুরবানি কী, যাকাত কী। এক রাতে পৃথিবী থেকে মহান আল্লাহর কিতাব উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না।[২]

ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ হজরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কুরআন উঠিয়ে নেওয়ার আগেই তোমরা তা তিলাওয়াত করো। কারণ, যতক্ষণ-না কুরআন উঠিয়ে নেওয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, এই মুসহাফগুলো উঠিয়ে নেওয়া হবে, তা হলে মানুষের বুকে যা থাকবে, তার কী হবে? তিনি বললেন, এক রাতে তা নিয়ে নেওয়া হবে। তখন তাদের বুক থেকে কুরআন উঠে যাবে।

---

১. মুসনাদে আহমাদ : ৭০৫৩, প্রকাশক : مُؤَسَّسَةُ قُرْطُبَةَ কায়রো।

২. সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০৪৯

যখন সকাল হবে, তারা বলবে, মনে হয় আমরা কিছু জানতাম। এরপর তারা ধাঁধাঁয় পড়ে যাবে।[১]

মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, আর এটি [কুরআন উঠিয়ে নেওয়া] সংঘটিত হবে ইসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর এবং আবিসিনিয়ার লোকটি কাবাঘর ধ্বংস করার পর।[২]

৯. **আকাশ থেকে বিশাল ধোঁয়া প্রেরিত হওয়া**। তা মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং সবাইকে ঢেকে নেবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.

অতএব অপেক্ষা করো সেদিনের, যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে দেখা দেবে, যা লোকদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এটি এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (সুরা দুখান : ১০-১১)

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ হজরত হুজাইফা বিন উসাইদ গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, 'নিশ্চয় তা [কিয়ামত] সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ-না তোমরা দশটি নিদর্শন দেখো।' তারপর তিনি ধোঁয়া, দাজ্জাল...-এর কথা উল্লেখ করেন।[৩]

১০. **মহা অগ্নি**। এডেন থেকে এক মহা অগ্নি বের হবে। তা মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে হাশরের স্থানে। এটিই হলো কিয়ামতের সর্বশেষ বড় নিদর্শন। হুজাইফা বিন উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

---

১. শুআবুল ইমান লিল বাইহাকি : ১৮৬৮

২. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২৩০

৩. সহিহ মুসলিম : ৭৪৬৭

কর্তৃক বর্ণিত উল্লিখিত হাদিসের শেষাংশে রয়েছে, 'সর্বশেষ হলো আগুন। তা ইয়ামান থেকে বের হবে এবং মানুষকে হাশরের স্থানে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।'

'হাশর' অর্থ একত্রিত হওয়া। হাশরের স্থান দ্বারা এখানে শামদেশের ভূমি উদ্দেশ্য। সেখানে সকলকে একত্রিত করা হবে এবং সকলের রুহ কবয করা হবে। কবর থেকে ওঠার পর যে হাশর হবে, সেই হাশরের স্থানে নিয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়।

আর এডেন হলো বর্তমান ইয়ামানের দক্ষিণাঞ্চলের প্রসিদ্ধ উপকূলীয় শহর।

সহিহ মুসলিমে হজরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'এবং একটি আগুন এডেনের ভূমির গভীর থেকে বের হবে, তা মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।'[১]

জেনে রাখা উচিত, এই আলামতগুলোকে কিয়ামতের বড় আলামত বলার কারণ হলো, এগুলো পরপর প্রকাশিত হবে। অর্থাৎ একটি প্রকাশ হওয়ার পরপরই আরেকটি প্রকাশ হবে। যখন আলামতগুলোর প্রকাশ সমাপ্ত হবে, তখন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় কিয়ামত সংঘটিত হবে।

হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে তিনটি চন্দ্রগ্রহণের কথাও রয়েছে। অধিকাংশ মুহাক্কিক আলেমের অভিমত হলো, সেগুলোও নিঃসন্দেহে কিয়ামতের আলামত। তবে তা এই দশটির আগে প্রকাশ হবে। বলা যায়, সেই তিনটি হলো এই দশটির জন্য ভূমিকাস্বরূপ।[২]

---

১. সহিহ মুসলিম : ৭৪৬৭

২. أُصُوْلُ الإِيمانِ فِي ضَوْءِ الكتابِ والسُّنَّةِ পৃ. ২১৪

জামাত আঁকড়ে ধরার এবং শুযুয ও বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকার উপায়

আমরা মনে করি, জামাতবদ্ধতা হলো হক ও সওয়াবের কাজ, আর বিচ্ছিন্নতা হলো বক্রতা ও আযাব।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۚ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا۔

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পৃথক পৃথক হয়ে যেয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে, তারপর তিনি তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। (সুরা আলে ইমরান : ১০৩)

আয়াতে আল্লাহর রজ্জু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কিতাব এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ।

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا...

আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস পছন্দ করেন, এবং তিনটি জিনিস অপছন্দ করেন। তিনি পছন্দ করেন, তোমরা তাঁর ইবাদত

করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না এবং সকলে মিলে তাঁর রজ্জু আঁকড়ে ধরবে; পৃথক পৃথক হবে না।...[১]

নিন্দনীয় মতবিরোধ-এর পরিচয়

আয়াত এবং হাদিসে পৃথক পৃথক হয়ে যাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাযমুম ইখতিলাফ বা নিন্দনীয় মতবিরোধ। আর তা হলো, প্রবৃত্তির চাহিদা এবং ইলম ছাড়া কথা বলার ফলে সৃষ্ট মতভেদ, কিংবা যাতে কোনো ধরণের বিদ্বেষ থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যেটি মতবিরোধের জায়গা নয়, সেখানে মতবিরোধ করা। যেমন, অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও অকাট্য অর্থবোধক[২] বিষয়ে মতবিরোধ করা। 'জরুরিয়্যাতে দীনে'র[৩] কোনো বিষয়ে মতবিরোধ করা, যাতে একাধিক মত থাকা সম্ভব নয়। এগুলো নিন্দনীয় বিভক্তি ও মতবিরোধ।

বৈধ মতবিরোধের ক্ষেত্র

বৈধ মতবিরোধের ক্ষেত্র হলো, যার প্রমাণ ও মর্ম কোনোটিই অকাট্য নয়।[৪] কিংবা যা অকাট্যভাবে প্রমাণিত, তবে তার মর্ম অকাট্য নয়।[৫] অথবা যার মর্ম অকাট্য, তবে প্রমাণ অকাট্য নয়।[৬]

কখনও আবার অযোগ্য কারো ইজতিহাদ থেকে সৃষ্ট হওয়ার ফলেও মতবিরোধ নিন্দনীয় হয়। সুতরাং যদি মতবিরোধ যোগ্য ব্যক্তি থেকে সঠিক স্থানে প্রকাশিত হয়, তাহলে সেটি নিন্দনীয় মতবিরোধ নয়।

---

১. সহিহ মুসলিম : ৪৫৭৮

২. قَطْعِيُّ الثُّبُوْتِ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ

৩. ২০১ নং পৃষ্ঠায় জরুরিয়াতে দীনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

৪. ظَنِّيُّ الثُّبُوْتِ ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ

৫. قَطْعِيُّ الثُّبُوْتِ ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ

৬. قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ ظَنِّيُّ الثُّبُوْتِ

জামাতকে আঁকড়ে ধরার নববি নির্দেশ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ. مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ، فَلْيَلْزَمِ الجَمَاعَةَ.

তোমরা জামাতকে আঁকড়ে ধরো, বিভক্ত হয়ো না। কারণ শয়তান একজনের সাথে থাকে, দুইজন থেকে দূরে থাকে। যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যভাগ ও উত্তম স্থান পেতে চায়, সে যেন জামাত আঁকড়ে থাকে।[১]

নবিজি আরও ইরশাদ করেছেন,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسلامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ.

যে ব্যক্তি জামাত থেকে বের হয়ে এক বিঘত পরিমাণ দূরত্বে চলে গেলো, সে তার ঘাড় থেকে ইসলামের লাগাম খুলে ফেলল; যতক্ষণ না আবার ফিরে আসে।[২]

ইমাম আবু শামা রাহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা

এ হাদিসে 'জামাত' দ্বারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের পরিপূর্ণ অনুসারীদের জামাত উদ্দেশ্য। যেকোনো জামাত উদ্দেশ্য নয়। যেকোনো একজনের বিপরীতে যেকোনো দুইজনকে আঁকড়ে থাকার আদেশ এ হাদিসে করা হয়নি। প্রত্যেক একাকী ব্যক্তির সঙ্গে শয়তান থাকার এবং প্রত্যেক দুইজন

---

১. সুনানে তিরমিজি : ২১৬৫

২. মুসনাদে আহমাদ : ১৭৮০০, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৪২০ হি., প্রকাশক : مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ বৈরুত।

থেকে শয়তান দূরে থাকার কথা বলা হয়নি। ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহর উস্তাদ ইমাম হাফেজ আবু শামা রাহিমাহুল্লাহ [৫৯৬-৬৬৫ হি.]-এর ব্যাখ্যা দেখুন।

তিনি লিখেছেন, যেখানে 'জামাত'কে আঁকড়ে থাকার আদেশ এসেছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য 'হক' আঁকড়ে থাকা ও তার অনুসরণ করা। যদিও হকের অনুসারী কম হয় এবং বিরোধীদের সংখ্যা অধিক হয়। কেননা 'হক' তো হচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে প্রথমদিকের 'জামাত' যে আদর্শের ওপর ছিল তা। পরবর্তীতে বাতিলের আধিক্যের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।[১]

অতএব উল্লিখিত হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের পরিপূর্ণ অনুসারীদের জামাতকে আঁকড়ে থাকার আদেশ করা হয়েছে। যেকোনো একজনের বিপরীতে যেকোনো দুইজনকে আঁকড়ে থাকার আদেশ করা হয়নি। সালাফের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয়, একজনের বিপরীতে দুইজনকে 'জামাত' এবং একজনকে 'শায' তখন বলা হবে, যখন দুইজন হকের ওপর এবং একজন বাতিলের ওপর থাকবে। সর্বাবস্থায় দুইজনের বিপরীতে একজন 'শায' নয় এবং একজনের বিপরীতে দুইজন 'জামাত' নয়। জামাত ও জুমহুর এক নয়।

---

১. الْبَاعِثُ عَلَى إِنْكَارِ الْبِدَعِ وَالْحَوَادِثِ পৃ. ১৯। লেখক, ইমাম আবু শামা রাহিমাহুল্লাহ।

وحَيْثُ جاءَ الأمرُ بلُزُومِ الجماعةِ فالمرادُ به لُزُوْمُ الحقِّ واتِّبَاعُه وإنْ كان المتمسِّكُ بالحقِّ قليلًا والمُخالِفُ كثيرًا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى مِن عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه رضي الله عنهم، ولا نَظَرَ إلى كَثْرَةِ أهلِ الباطلِ بعدَهُم.

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাখ্যা

তাবেয়ি হজরত আমর বিন মাইমুন আউদি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ইয়ামেনে আমি মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহুর সোহবত গ্রহণ করেছি। শামে তাঁকে কবরে দাফন করার পূর্ব পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করিনি। অতঃপর আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ফকিহ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সোহবত গ্রহণ করেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তোমরা 'জামাত'কে আঁকড়ে ধরো, কেননা 'জামাতে'র ওপর আল্লাহ তাআলার সাহায্য রয়েছে। তিনি 'জামাতে'র ব্যাপারে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করলেন।

তারপর একদিন তাঁকে বলতে শুনলাম, তোমাদের ওপর এমন কিছু আমির নিযুক্ত হবে, যারা নামাজকে নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব করে আদায় করবে। তোমরা সময়মতো ফরজ নামাজ আদায় করে নেবে। তারপর তাদের সঙ্গে নফল হিসেবে নামাজ আদায় করবে।

আমর বিন মাইমুন আউদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি বললাম, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ! বুঝতে পারছি না তাঁরা কী বলতে চান? ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কেনো, কী হয়েছে? আমি বললাম, আপনি আমাকে 'জামাত' আঁকড়ে ধরার আদেশ করলেন। তারপর আপনিই আমাকে বলছেন, ফরজ নামাজ একাকী আদায় করে জামাতের সঙ্গে নফল হিসেবে নামাজ আদায় করতে।

জামাতের জমহুরই [জামাতের অধিকাংশ লোকই] জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আমর বিন মাইমুন! আমি তো তোমাকে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ফকিহ হিসেবে ধারণা করেছিলাম। তুমি কি জানো 'জামাত' কী? আমি বললাম, না! তিনি বললেন, জামাতের জুমহুরই [জামাতের অধিকাংশ লোকই] জামাত

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। 'জামাত' হচ্ছে যা 'হকে'র অনুকূল, যদিও তুমি একাকী হও। অন্য বর্ণনায় আছে, 'জামাত' হচ্ছে যা আনুগত্যের অনুকূল হয়, যদিও তুমি একাকী হও। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি আমার উরুর ওপর হাত মেরে বললেন, তোমার জন্য আফসোস; 'জুমহুর' [অধিকাংশ মানুষ] জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আল্লাহর আনুগত্য অনুযায়ী যা হবে, তা-ই 'জামাত'।[১]

ইমাম নুআইম বিন হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহর উস্তাদ মুহাদ্দিস নুআইম বিন হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ২২৮ হি.] বলেছেন, জামাতে যখন ফাসাদ এসে যায়, তখন তুমি ফাসাদ আসার পূর্বে জামাত যে আদর্শের ওপর ছিল, সেটিকে আঁকড়ে ধরবে, যদিও তুমি একাকী হও। কেননা তখন তুমিই 'জামাত'।[২]

'সাওয়াদে আজম' আঁকড়ে ধরার নির্দেশ

ইমাম ইবনে মাজাহ রাহিমাহুল্লাহ হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

---

১. তারিখে দিমাশক, ৪৬/৪০৯-৪১০

تَدْرِي مَا الجماعةُ؟ قال : قلتُ : لا! قال : إنّ جُمهور الجماعةِ الذين فارَقُوا الجماعةَ، الجماعةُ ما وَافَقَ الحقَّ وإنْ كُنْتَ وحدَكَ. وفي رواية : الجماعةُ ما وَافَقَ طاعةً وإنْ كنتَ وحدَك. وفي رواية : فضَرَبَ عَلى فَخِذِي وقال : وَيْحَكَ! إنّ جُمهور الناسِ فارَقُوا الجماعةَ، إنّ الجماعةَ ما وَافَقَ طاعةَ اللهِ عز وجل.

২. তারিখে দিমাশক, ৪৬/৪০৯

إذا فَسَدَتِ الجماعةُ فعَلَيْكَ بِمَا كانَتْ عَلَيهِ الجماعةُ قبلَ أن تَفْسُدَ وإنْ كنتَ وحدَكَ، فإنك أنتَ الجماعةُ حِينَئِذٍ.

إِنَّ أُمَّتِيْ لَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الِاخْتِلَافَ، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ.

নিশ্চয় আমার উম্মত গোমরাহির ওপর একত্রিত হবে না। যখন তোমরা মতবিরোধ দেখ, তখন 'সাওয়াদে আজম'কে আঁকড়ে ধরো।[১]

'আমার উম্মত গোমরাহির ওপর একত্রিত হবে না' হাদিসের এ অংশ এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, প্রত্যেক যুগে কিছু লোক বা কেউ না কেউ অবশ্যই হকের ওপর থাকবে। পুরো উম্মত কখনও গোমরাহির শিকার হবে না।

'সাওয়াদে আজমে'র ব্যাখ্যা

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, জেনে রাখা উচিত, 'ইজমা', 'হুজ্জত', 'সাওয়াদে আজম' ও বড় জামাত– সবই হচ্ছে মূলত হকের পতাকাবাহী আলেম, যদিও তিনি একাকী হন এবং দুনিয়াবাসী তার বিরোধিতা করে। [অতঃপর তিনি ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও নুয়াইম বিন হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন–] একজন হাদিসের ইমামকে সাওয়াদে আজম [বড় জামাত] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা কি জানো বড় জামাত কী? তা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনে আসলাম তুসি ও তার সঙ্গীরা। মতভেদ সৃষ্টিকারীরা বিকৃতি সাধন করে জুমহুরকে [অধিকাংশকে] 'সাওয়াদে আজম', 'হুজ্জত' ও 'জামাত' আখ্যা দিয়েছে। বিভিন্ন যুগে ও অঞ্চলে 'সাওয়াদে আজমে'র অনুসারীর স্বল্পতা ও একাকীত্বের কারণে, লোকেরা 'সুন্নাহ'র মোকাবেলায় অধিকাংশকে মানদণ্ড বানিয়ে সুন্নাতকে বিদআত এবং স্বীকৃতকে অস্বীকৃত আখ্যা দিয়েছে।

---

১. সুনানে ইবনে মাজা : ৩৯৫০, دَارُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ মিশর।

একজন ব্যতীত সকলেই হকের বিপরীত হলে, সকলেই 'শায', একজনই 'জামাত'

আরো দলিল দিচ্ছে, যে একাকী হবে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামে একাকী রাখবেন। এই মতভেদ সৃষ্টিকারীরা জানে না যে, **যা হকের বিপরীত তাই মূলত 'শায' [বিচ্ছিন্ন]। যদি একজন ব্যতীত সকলেই হকের বিপরীত থাকে, তাহলে তারা সকলেই 'শায'। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহর সময়ে কিছু সংখ্যক ব্যতীত সকলেই 'শায' ছিলো। আর কিছু সংখ্যক ছিলেন 'জামাত'। তখনকার বিচারকমণ্ডলী, মুফতিরা, খলিফা ও তার অনুসারীরা সকলেই ছিলো 'শায', আর ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ একাই ছিলেন 'জামাত'।**

লোকদের মেধা যখন তা অনুধাবন করতে পারল না, তখন তারা খলিফাকে বলল, হে আমিরুল মুমিনিন! এটি কী করে সম্ভব যে, আপনি, আপনার বিচারক, আপনার গভর্নর এবং ফকিহ ও মুফতি সকলেই বাতিলের ওপর রয়েছেন, আর এক আহমদই শুধু হকের ওপর আছে? খলিফার জ্ঞানে তা সঙ্কুলান হয়নি; তাই সে দীর্ঘ সময় ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহকে বন্দি রেখে ছড়ির আঘাত ও শাস্তি দিতে লাগলো।[১]

---

১. إِعْلَامُ الْمُوَقِّعِيْنَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ খ. ৫, পৃ. ৩৮৮

واعلَمْ أنّ الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالِمُ صَاحِبُ الحقِّ وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض. (ثم ذَكَرَ كلامَ ابنِ مسعود ونُعَيمِ بن حَمَّاد، ثم قال :) وقال بعض أئمة الحديث وقد ذُكِرَ له السوادُ الأعظم، فقال : أتَدري ما السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسِيُّ وأصحابه. فمسَخ المختلِفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجةَ والجماعةَ هم الجمهورَ، وجعلوهم عِيَارا على السنة، وجعلوا السنة بدعةً، والمعروفَ منكرًا لِقِلَّةِ أهلِه وتَفَرُّدِهم في الأعصار والأمصار.

হাফেজ ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা

ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, তো উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠতাই হলো আহলে হক, বিশেষকরে প্রথম যুগে। সে যুগে কাউকে বিদআতের ওপর পাওয়াই দুষ্কর ছিলো। কিন্তু পরবর্তী যুগে এসে এমন হচ্ছে যে, বড় জামাতও কখনো বিদআতের ওপর একত্রিত হয়ে যায়।(১)

হজরত হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা

হজরত হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ১১০ হি] বলেছেন, কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সবসময় সংখ্যায় কমই ছিলেন, যাঁরা বিলাসীদের সঙ্গে তাদের বিলাসিতায় এবং বিদাতিদের সঙ্গে তাদের বিদআতে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁরা প্রভুর সাক্ষাত পর্যন্ত তাঁদের

وقالوا : «مَنْ شَذَّ شَذَّ اللهُ به في النار». وما عرَف المختلِفون أن الشاذّ ما خالفَ الحقَّ، وإن كان الناسُ كلُّهم عليه إلا واحدًا منهم فهم الشاذُّوْن. وقد شَذَّ الناسُ كُلُّهم زَمَنَ أحمدَ بنِ حنبل إلا نفرًا يسيرًا؛ فكانوا هم الجماعةَ، وكانت القُضَاةُ حينئذ والمُفْتُونَ والخليفةُ وأتباعُه كلُّهم هم الشاذُّوْن، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعةَ.

ولمّا لم تَحمِل هذا عقولُ الناسِ قالوا للخليفة : يا أمير المؤمنين! أتكون أنتَ وقُضَاتُكَ ووُلَاتُكَ والفقهاءُ والمُفتُوْنَ كلُّهم على الباطل وأحمدُ وحدَه هو على الحق؟ فلم يَتَّسِعْ عِلمُه لذلك؛ فأخَذَه بالسِّيَاطِ والعقوبةِ بعد الحَبْسِ الطويل.

১. النِّهَايَةُ فِي الفِتَنِ والمَلَاحِمِ খ. ২, পৃ. ২৫

فأهْلُ الحقِّ هُمْ أكثَرُ الأمةِ، ولا سِيَّمَا في الصَّدْرِ الأوَّل، ولا يَكَادُ يُوْجَدُ فيهم مَنْ هو على بدعة، وأما في الأعصار المتأخِّرة فقد يَجتمِع الجمعُ الغَفِيرُ على بدعة.

সুন্নাতের ওপর অবিচল ছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলে তোমরাও তাঁদের মতো হও।[১]

জামাত আঁকড়ে ধরার রূপরেখা

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ব্যক্তিদের মাধ্যমে হক চেনা যায় না। হক চেনো, তাহলে হকওয়ালাদের চিনতে পারবে।[২]

প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যখন স্পষ্ট হয়ে গেল, ব্যক্তিদের মাধ্যমে হক চেনা যাবে না, তখন কীভাবে আমরা হকের সন্ধান পাব? এর উত্তর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদিসে রয়েছে,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে গেলাম; যতক্ষণ তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকবে, পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবির সুন্নাহ।[৩]

সুতরাং হক চেনা ও ভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি লাভের উপায় হলো, আল্লাহর কিতাব ও নবিজির সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা। হাদিসটি এ বাস্তবতার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কেউ যদি কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে না

---

১. البَاعِثُ عَلَى إِنْكَارِ البِدَعِ والحَوَادِثِ পৃ. ১৩

فإنّ أهلَ السنةِ كانوا أقلَّ الناسِ فيما بَقِيَ، الذين لم يَذهَبُوا مع أهل الإِتْرَافِ في إِتْرَافِهم، ولا مع أهل البِدَعِ في بِدَعِهم، وصَبَرُوا على سُنَّتِهم حتى لَقُوْا رَبَّهُم، فكذلك إن شاء اللهُ فكُوْنُوْا.

২. তাফসিরে কুরতুবি, সুরা বাকারার ৪২ নম্বর আয়াতের তাফসির, আল্লামা যামাখশারি ও আবুল হাইয়ান আন্দালুসি রাহিমাহুমাল্লাহর সুরা ক্বাফ-এর ১৫ নম্বর আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

إِنَّ الحَقَّ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ، اِعْرِفِ الحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ.

৩. মুআত্তা মালেক : ১৮৭৪, তাহকিক, বাশশার আওয়াদ মারুফ।

ধরে, বরং শুধু ব্যক্তিদের থেকে দীন গ্রহণ করে, তাহলে অবশ্যই সে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ হয়ে যাবে।

নবিযুগের পরবর্তীতে যেসকল বিষয়ের সমাধান কিতাব ও সুন্নাহের আলোকে অস্পষ্ট মনে হবে, সেগুলো নিরসন করা হবে সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ, তাঁদের ঐকমত্য, মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য এবং কিতাব ও সুন্নাহ থেকে আহরিত মুজতাহিদ ইমামদের মতামতের ভিত্তিতে। পরবর্তী করো সমাধান ও তরিকা যদি তাঁদের তরিকা ও সমাধানের বিপরীত প্রমাণিত হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণ পরিত্যজ্য। তিনি যে-ই হোন না কেন।

এটাই জামাতকে আঁকড়ে ধরার রূপরেখা এবং শুযুয ও বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকার উপায়। পরবর্তী যুগে যারা শুযুয ও বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থেকে জামাতকে আঁকড়ে থাকবেন, প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁরা তাঁদের সমাজের প্রশিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ হবেন না। অনেকেই তাঁদেরকে চিনবে না। পরবর্তী যুগে কারো অপরিচিত হওয়া তার 'শায' হওয়ার আলামত নয়। লক্ষণীয় বিষয় তার পরিচিত বা অপরিচিত হওয়া নয়; বরং দেখার বিষয় হলো, সাহাবায়ে কেরাম ও মুজতাহিদ ইমানগণের ব্যাখ্যা অনুসারে তিনি কিতাব ও সুন্নাহের দাওয়াত দিচ্ছেন কি না। তাহলে তিনিই 'জামাত' সাব্যস্ত হবেন, বিপরীতের পুরো জুমহুর 'শায' পরিগণিত হবেন। পরবর্তী যুগে এমন অপরিচিত ব্যক্তিবর্গই দীন শেখার বিশেষ মাধ্যম।

অপরিচিতদের জন্য নববি সুসংবাদ

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ.

ইসলামের সূচনা অপরিচিত অবস্থায় হয়েছে এবং অচিরেই

সূচনাকালের মত অপরিচিত অবস্থায় তার প্রত্যাবর্তন ঘটবে। সুতরাং অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।[১]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে হকের জামাত আঁকড়ে থাকার এবং শুযুয ও বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন!

* * *

এই হলো 'ইসলামি আকিদার ব্যাখ্যা' গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। চিরঞ্জীব ও সর্বসত্তার ধারক আল্লাহ তাআলা এর রচয়িতা ও সংশ্লিষ্ট সকলকে দুনিয়া ও আখেরাতে কালিমায়ে তাইয়েবার ওপর স্থিতি দান করুন এবং উভয় জগতে আফিয়াত দিন। মেহেরবান আল্লাহ এ দেশসহ মুসলমানদের সকল দেশকে দারুল ইসলাম বানিয়ে দিন। আমিন!

وصَلَّى اللّٰهُ عَلى سيِّدِنا محمَّدٍ -فِدَاهُ أَبِيْ وأُمِّيْ- وعَلى آلِه وصَحْبِه وعلماءِ أُمَّتِه أجمعين!

সমাপ্ত

১. সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান ১/১৩০, হাদিস নং : ১৪৫, دَارُ إِحْيَاءِ الكُتُبِ العَرَبِيَّةِ মিশর।

১২৬ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ঠাংশ

মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ [১৯৪৩- খ্রি.] রচিত 'সুদ পর তারিখি ফায়সালা' কিতাবের শুরুতে লিখিত মুফতি মুহাম্মদ রাফি উসমানি রাহিমাহুল্লাহ [১৯৩৬-২০২২ খ্রি.]-এর ভূমিকা থেকে আমরা জানতে পেরেছি, সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার মতো একটি রায়ও পাকিস্তানে আজ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। এ বিষয়ে জনৈক লেখকের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ–

১. যে দেশটি শুধু ইসলামের জন্য ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে দেশে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে একটি মাসআলা নিয়েও কথা বলার সুযোগ, দেশটি অস্তিত্ব লাভের ৩২ বছর পর ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হয়নি।

২. ৩২ বছর পর একটি বিশেষ মাসআলা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে। ইসলামি শরিয়ার সকল মাসআলা নিয়ে কথা বলার সুযোগ হয়নি। কতিপয় আলেমের ভাষায় এটি أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ [তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ইমান রাখ এবং কিছু অংশ অস্বীকার কর? -সুরা বাকারা : ৮৫]-এর স্তর।

৩. সুদের যে মাসআলা নিয়ে ৩২ বছর পর আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে, তা এমন এক মাসআলা, যা দেশের সকল মুসলমানের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। প্রতিদিনের প্রতি লোকমার হালাল-হারামের সাথে সম্পৃক্ত মাসআলা।

৪. তারও ১২ বছর পর অর্থাৎ দেশটি প্রতিষ্ঠার ৪৪ বছর পর আদালতের একটি বেঞ্চ সুদ হারাম হওয়ার রায় দিয়েছে। ৪৪ বছর পর্যন্ত দেশটির পরিবেশ এমন রায় দেওয়ার উপযোগী ছিল না।

৫. দেশটির সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো সুদ হারাম হওয়ার বিরুদ্ধে আপিল করেছে। ইসলাম প্রেমিকগণ

৬. আল্লাহ তাআলার দ্ব্যর্থহীন হুকুমের বিরুদ্ধে আপিলকারীদেরকে কোনো ধরনের শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়নি।

৭. আপিলের শুনানি শুরু হয়েছে তারও ৮ বছর পর। দেশটির বয়স তখন ৫২ বছর। উল্লেখ্য, আপিল শুনানির বৈঠকের গণ্যমান্য মেহমান হচ্ছে ঐসকল ব্যাংকার, যারা যুগের পর যুগ সুদের মহাজনি করেছে, সুদের ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিরাট 'অবদান' (?) রেখেছে।

৮. ৫৩ বছর পর ১৯৯৯ সনের শেষ মাথায় সুদ হারাম হওয়া প্রমাণিত করার জন্য আলেমসমাজ হাজার হাজার পৃষ্ঠা খরচ করেও সুদ হারাম হওয়ার রায় কার্যকর করতে পারেননি।

সর্বশেষ অবস্থা : পুরো পাকিস্তানে সুদের কারবার সেভাবেই চলছে, যেভাবে ছিল। বৃটিশ ভারতে যেভাবে ছিল, সেভাবেই আছে। বর্তমান ভারতে যেভাবে আছে, সেভাবেই আছে। আমেরিকা ও বৃটেনে যেভাবে আছে, সেভাবেই আছে। বিশ্বের প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশে যেভাবে আছে, সেভাবেই আছে। সারাবিশ্বে তাগুতের আইনে অর্থনীতি যেভাবে চলছে, সেভাবেই পাকিস্তানে চলছে। ব্যবধান হচ্ছে, সারাবিশ্বের মুসলমানরা যে পরিমাণ ধোঁকা খেয়ে চলেছে, সে তুলনায় পাকিস্তানের মুসলমানরা একটু বেশি খেয়ে চলেছে। অবশ্য যারা খাচ্ছে, তাদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলার এমন বহু বান্দাও আছেন, যারা এসব ধোঁকা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

এখানে آسان ترجمہ قرآن কিতাবে সুরা নিসা-র ৬০ নং আয়াতের অধীনে লিখিত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর উক্তিটি আবার পাঠ করা যায়– 'এখানে [তাগুত] শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য এমন শাসক, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানাবালি থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে বিচার করে; অথবা তাঁদের বিপরীত আইন দ্বারা বিচার করে। আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মুখে

নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসুলের বিধানাবলির ওপর অন্য কোনো বিধানকে প্রাধান্য দেয়, তার মুসলমান থাকার সুযোগ নেই।'

এই হলো পাকিস্তান রাষ্ট্রটির শাসকবৃন্দের অবস্থা, যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে ইসলামের জন্য। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবায়নের জন্য; ইসলামের জন্য নয়। সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য–

'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।'

উল্লিখিত বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়– পাকিস্তান দারুল ইসলাম, না দারুল হরব? আল্লামা উসমানি হাফিজাহুল্লাহ ও তাঁর কতিপয় শাগরিদ দেশটিকে দারুল ইসলাম মনে করলেও, অসংখ্য মুহাক্কিক মনীষীর দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্ত এর বিপরীত। উদাহরণস্বরূপ কয়েকজন মনীষীর কিছু উদ্ধৃতি নিম্নরূপ–

১. সাইয়িদ হোসাইন আহমদ মাদানি রাহিমাহুল্লাহ [১২৯৬-১৩৭৭ হি.] বলেছেন–

   'সেখানের [পাকিস্তানের] সরকার ইউরোপিয়ান পদ্ধতির গণতান্ত্রিক সরকার। জনসংখ্যা হিসেবে মুসলমান ও অমুসলমান সবাই তাতে অংশীদার। তাকে ইসলামি সরকার বলা ভুল।'[১]

২. আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ বানুরি রাহিমাহুল্লাহ [১৩২৬-১৩৯৭ হি.] তাঁর 'বাসায়ের ও ইবার' কিতাবে লিখেছেন–

---

১. 'মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম' ২ : ২৪২

‘কোনো রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়ার মাপকাঠি কী?

সমস্ত উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হওয়ার মাপকাঠি এটি নয় যে, সেখানে মুসলিম জনসংখ্যার হার কতো। বরং দারুল ইসলাম হওয়ার ভিত্তি হলো ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়নের ওপর। যে রাষ্ট্রে শাসকশ্রেণির পক্ষ হতে জনগণকে ইসলামি আইন-কানুনের ফয়েয-বরকত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না, যেখানে কুফরি ও জাহেলি আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন এবং যেখানের অসহায় জনগণ ধারাবাহিক বিরোধিতা করা সত্ত্বেও আল্লাহপ্রদত্ত আইন-কানুনের পরিবর্তে তাগুতি-কুফরি আইনে নিজেদের মামলা-মকদ্দমা ফয়সালা করাতে বাধ্য; সেটিকে হাজারবার মুসলমানদের রাষ্ট্র বলা হোক, কিন্তু সেটিকে বাস্তবিক অর্থে ইসলামি রাষ্ট্র ও দারুল ইসলাম বলতে লজ্জা লাগে। ইসলামের ঘরেও যদি ইসলামের পা রাখার অনুমতি না থাকে; তো সেটি মুসলমানদের ঘর তো হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি কি সেটিকে ইসলামের ঘর [দারুল ইসলাম] হিসেবে মেনে নেবে?[১]

৩. আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানবি রাহিমাহুল্লাহ [-১৪২১ হি.] তাঁর ‘আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল’ কিতাবে লিখেছেন–

‘যে রাষ্ট্রে ইসলামি আইন-কানুন জারি আছে তা দারুল ইসলাম। আর যেখানে ইসলামি আইন-কানুন জারি নেই, সেটিকে মুসলামানদের রাষ্ট্র বলা যেতে পারে, কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে তা দারুল ইসলাম নয়।[২]

৪. আল্লামা মুফতি আবসুস সালাম চাটগামি রাহিমাহুল্লাহ [১৯৪৩-২০২১ খ্রি.] লিখেছেন–

---

১. ‘বাসায়ের ও ইবার’ ২ : ২০

২. ‘আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল’ ৮ : ৩৯৫

'ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয় হল, সে রাষ্ট্রে ইসলামী আইন-কানুন তথা কুরআন-হাদীসের বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকবে। রাষ্ট্রের শাসকবর্গ থেকে শুরু করে প্রজাবর্গ পর্যন্ত সবাই উক্ত আইনের পাবন্দী করবে। তারপর এ রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত এবং ওখানকার শাসকবর্গ মুসলমানদের শাসনকর্তা ও ওখানকার প্রজা মুসলিম প্রজা হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত হবে।

যদি মুসলিম শাসকদের তরফ থেকে মুসলিম দেশে ইসলামী আইন জারি না করা হয়, বরং কুফর ও খোদাদ্রোহী আইন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং একে আরো উন্নতি প্রদান করা হয়, তখন ঐ দেশসমূহ ইসলামী দেশ হিসেবে কখনো গণ্য হওয়ার উপযুক্ত নয়। বরং সেগুলোকে অমুসলিম দেশ হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে।

কেননা ইসলামী দেশের পরিচয় ইসলামী আইন প্রয়োগের দ্বারা হয়। উদাহরণস্বরূপ কাফেরদের দেশসমূহ দেখা যেতে পারে– যে দেশে সাম্যবাদ প্রচলিত, সে দেশকে কমিউনিস্ট দেশ বলা হয়। কেননা কমিউনিজম হলো রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি। গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক নিয়ম প্রচলিত থাকে। এ কারণে সেটিকে গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয়। যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিদ্যমান, সেটাকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে।

সুতরাং কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকবর্গ যদি ইসলামী আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা না করে, তবে দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করার উপযুক্ততা থাকে না। এভাবে যদি কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসীরা না ইসলামী আইন চায়, না সেই আইনের প্রতি সন্তুষ্ট, বরং অনৈসলামিক আইনের বাস্তবায়ন চায় এবং সে আইনের প্রতি খুশি। তাহলে এদের মুসলমান বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা নেই। বরং এমন লোক কাফের উপাধী পাওয়ার উপযুক্ত।'[১]

প্রসঙ্গত, মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহর মতে দারুল ইসলাম ও দারুল হরব নসের ইসতেলাহ [পরিভাষা] নয়।

---

১. 'মাকালাতে চাটগামী, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য' পৃ. ১৬৮

ইজরাইল দারুল হরব কি না, তা নিয়ে মতভেদ আছে। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলো বর্তমানে দারুল ইসলামও নয়, দারুল হরবও নয়। বরং দারুল আম্ন। ফুকাহায়ে কেরামের কেউ এই তৃতীয় প্রকার দারের কথা স্বীকার করেন, কেউ করেন না। যারা স্বীকার করেন, তাদের মধ্যে তিনি আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ এবং তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর নাম উদ্ধৃত করেছেন।

তাঁর বক্তব্যের পর্যালোচনাকারী বিদগ্ধ মুফতি শাইখ আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আলমাহদি হাফিজাহুল্লাহ লিখেছেন– 'কিন্তু দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের মুকাবেলায় তৃতীয় আরেক প্রকার দার হিসেবে দারুল আমানের কথা বলেছেন– এমন কোনো নির্ভরযোগ্য ফকিহের মতামত আমরা খুঁজে পাইনি। আমরা পেয়েছি, তৃতীয় প্রকার দারের ধারণা কাদরিয়াদের আকিদা। আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ এবং তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ থেকেও এমন কথা পাইনি। যা পেয়েছি তা হলো, দারুল আম্ন দারুল হরবেরই একটি প্রকার।'

এখানে বিস্তারিত উদ্ধৃতি উল্লেখ করার সুযোগ নেই। বিষয়টি সবিস্তারে জানার জন্য 'দারুল ইসলাম ও দারুল হরব, মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহর একটি বক্তব্য : কিছু অসঙ্গতি' শীর্ষক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য। পুস্তিকাটির পিডিএফ ডাউনলোড লিংক–

https://www.mediafire.com/download/a20yef8q2hsix1q

اَللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ.

হে আল্লাহ! হককে আমাদেরকে হকরূপে দেখাও ও তা অনুসরণের জীবিকা আমাদের দান করো এবং বাতিলকে আমাদেরকে বাতিলরূপে দেখাও ও তা পরিহার করার জীবিকা আমাদের দান করো। আমিন!

মিল্লাতে ইবরাহিমের চেতনাধারীদের
তাগুতদের কূটকৌশল থেকে বাঁচার উপায়

[তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত কোনো মানুষ ঈমানদার হয় না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا.

অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে দৃঢ়তর হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙ্গে যাওয়ার নয়। (সুরা বাকারা : ২৫৬) ১২৬ নং পৃষ্ঠায় তাগুতের সংজ্ঞা অতিবাহিত হয়েছে।

মিল্লাতে ইবরাহিম তথা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দীনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো– ১. ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য করা। ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরিক না করা। যারা আল্লাহ তাআলার বিধানের বিপরীত আইন ও বিধান প্রণয়ন করে, তাদের বিধান ও আইন মান্য করাও একটি ইবাদত। এ পুস্তিকার ২৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হজরত আদি বিন হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস দ্রষ্টব্য। ২. শিরক ও মুশরিকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করার ঘোষণা করা। ১২৭ নং পৃষ্ঠায় সুরা মুমতাহিনার ৪র্থ আয়াত দ্রষ্টব্য।

মিল্লাতে ইবরাহিম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ.

আর ইবরাহিমের দীন থেকে ঐ ব্যক্তি ছাড়া আর কে বিমুখ হয়, যে নিজেকে নির্বোধ সাব্যস্ত করেছে? (সুরা বাকারা : ১৩০)

আরো ইরশাদ করেছেন–

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

তারপর আমি আপনার নিকট ওহি প্রেরণ করেছি যে, আপনি একনিষ্ঠ ইবরাহিমের দীনের অনুসরণ করুন। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (সুরা নাহল : ১২৩) –সফিউল্লাহ ফুআদ আফাল্লাহু আনহু।]

আপনি যদি মিল্লাতে ইবরাহিম ভালোভাবে বুঝে থাকেন এবং জেনে থাকেন যে, সেটাই সকল নবি-রাসুল ও তাঁদের অনুসারীদের পথ এবং দুনিয়া-আখেরাতের সাহায্য, সফলতা ও সৌভাগ্যের পথ, তাহলে আপনি নিশ্চিতরূপে জেনে রাখুন, কোনো যুগের তাগুতই মিল্লাতে ইবরাহিমের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে না। তারা বরং এ দীনকে ভয় পায়। এর কারণে শঙ্কিত থাকে। তাই বিভিন্ন কূটকৌশলের মাধ্যমে দাইদের অন্তর থেকে এ দীনকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য সদা সচেষ্ট থাকে।

আল্লাহ তাআলা অনেক আগেই এর সংবাদ দিয়েছেন। মক্কায় অবতীর্ণ সুরা কালামে ইরশাদ করেছেন–

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.

তারা আপনার শিথিল হওয়া প্রত্যাশা করে, তখন তারাও শিথিল হবে। (সুরা কালাম : ৯)

তাগুতরা চায়, দাইরা মিল্লাতে ইবরাহিম ছেড়ে অন্য কোনো বক্র পথ অবলম্বন করুক এবং নবি-রাসুলগণের এই সুদৃঢ় ও সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাক। দাইদেরকে এই সরল পথ থেকে বিচ্যুত করতে তারা আমরণ পরিকল্পনা করে যায়। পরিকল্পনায় এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে, যার ফাঁদে পড়ে দাইরা তাগুতদের অনেক ভ্রান্ত বিষয়ে চুপ থাকে, তাদের মনকে খুশি করে অথবা কিছু বিষয়ে তাদের সাথে সমঝোতা করে নেয়। এক পর্যায়ে দাওয়াতের কাজে ভাটা পড়ে যায়, তা নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হয় এবং দাইগণ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হন।

তাগুতরা একথা ভালো করেই জানে যে, পরাজয়ের প্রথম ধাপ হলো পশ্চাৎগমন। তারপর অব্যাহতভাবে চলতে থাকে এই পশ্চাৎগমন। দাইরা ধীরে ধীরে দাওয়াতের মৌলিক পদ্ধতি[1] ভুলে

---

১. 'হিদায়া' কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ইনায়া' কিতাবের লেখক আল্লামা আকমালুদ্দিন বাবিরতি রাহিমাহুল্লাহ [মৃ. ৭৮৬ হি.]-এর একটি উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে। উদ্ধৃতিটি দ্বারা দাওয়াতের নববি পদ্ধতির পর্যায়ক্রম যেমন বুঝে আসবে, অনুরূপভাবে কুরআন মাজিদের এ বিষয়ের আয়াতসমূহের মধ্যকার বাহ্যিক বৈপরীত্যের সমাধানও জানা যাবে। 'হিদায়া'র 'সিয়ার' অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় 'ইনায়া'-র লেখক লিখেছেন–

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিকে মুশরিকদেরকে ক্ষমা করার ও এড়িয়ে চলার জন্য আদিষ্ট ছিলেন। ইরশাদ হয়েছে–

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.

সুতরাং আপনি সুন্দরভাবে ক্ষমা করুন। (সুরা হিজ্‌র : ৮৫)

আরো ইরশাদ হয়েছে– وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (সুরা আনআম : ১০৬)

তারপর উপদেশদান ও সুন্দর পদ্ধতিতে বিতর্ক করে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা। (সুরা নাহ্‌ল : ১২৫)

এরপর মুমিনদেরকে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যদি আক্রমণ কাফেরদের পক্ষ থেকে শুরু হয়। ইরশাদ হয়েছে– أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ.

যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয়, তাদেরকে [যুদ্ধ করার] অনুমতি দেওয়া হলো। (সুরা হজ : ৩৯)

আরো ইরশাদ হয়েছে– فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ.

যায়। এবং এই বিস্মৃতি ও বিচ্যুতির ফলে তাগুতদের সাথে তাদের অনেক বিষয়ে বা কিছু বিষয়ে সমঝোতা হয়। তাগুতরা প্রথম দিকে এতটুকুই চায়। তাই যদি তারা লক্ষ্য করে, দাইরা ছাড় দিচ্ছে বা পশ্চাৎগমন করছে, তখন দাইদের সামনে তাদের ও তাদের

যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরা তাদেরকে হত্যা করো। (সুরা বাকারা : ১৯১)

তারপর আল্লাহর শত্রুদের পক্ষ থেকে আক্রমণ না হলেও কিছু সময় তাদের উপর আক্রমণ করার জন্য মুমিনদেরকে আদেশ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.

অতএব যখন নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হবে, তখন মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা করো। (সুরা তাওবা : ৫)

এরপর সকল সময় এবং সকল স্থানে আল্লাহর শত্রুদের উপর আক্রমণ করার জন্য মুমিনদেরকে আদেশ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ.

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফেতনা [শিরক] দূরীভূত হয় এবং আনুগত্য আল্লাহর জন্য হয়। (সুরা বাকারা : ১৯৩)

আরো ইরশাদ হয়েছে–

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ও শেষদিনের প্রতি ঈমান আনে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম সাব্যস্ত করে না এবং সত্য দীন গ্রহণ করে না, তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাও, যে পর্যন্ত না তারা অপমানিত হয়ে স্বহস্তে জিযয়া প্রদান করে। (সুরা তাওবা : ২৯) 'ইনায়া' কিতাবের উদ্ধৃতি সমাপ্ত হয়েছে।

দাওয়াতের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে, তাদেরকে কাছে টেনে নেয়, তাদের দাওয়াতি প্রচেষ্টার প্রশংসা করে এবং তাদের প্রতি সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা প্রকাশ করে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا

আমি ওহি মারফত আপনার নিকট যা প্রেরণ করেছি তা থেকে তারা আপনাকে বিচ্যুত করার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল, যেন আপনি তা [অর্থাৎ ওহি] ছাড়া অন্য কিছু [বানিয়ে] আমার প্রতি আরোপ করেন। তখন তারা আপনাকে অবশ্যই বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। (সুরা ইসরা : ৭৩)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন মুশরিকদের পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন অবস্থা ও তাদের উপাস্যদের তিরষ্কার না করেন– দীন ও দাওয়াত সংশ্লিষ্ট এ জাতীয় বিভিন্ন বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুশরিকদের দরকষাকষির প্রচেষ্টা উল্লেখ করার পর, এ আয়াতের তাফসিরে 'ফি যিলালিল কুরআন' কিতাবে এসেছে–

এগুলো এমন কিছু প্রচেষ্টা যা থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে হেফাজত করেছেন। এগুলো দাইদের সাথে ক্ষমতাসীনদের সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা। যেমন দাইদেরকে প্রলুব্ধ করা, যেন তারা দাওয়াতের ময়দানে দৃঢ়তা ও অবিচলতা থেকে সামান্য পরিমাণ হলেও সরে আসে এবং বিপুল বিনিময় গ্রহণ করে তাগুতদের সাথে মধ্যবর্তী সমঝোতায় সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

দাওয়াতি মিশনের অনেকে এ লোভ ও প্রলোভনের শিকার হয়ে দাওয়াত থেকে সরে পড়ে। কারণ, বিষয়টিকে তারা হালকা দৃষ্টিতে দেখে। বস্তুত ক্ষমতাসীনরা এটা চায় না যে, দাই তার দাওয়াত থেকে পুরোপুরি সরে পড়ুক। তারা মূলত চায়, দাই তার দাওয়াতে হালকা পরিবর্তন আনুক, যেন উভয় কাফেলা এক মোহনায় মিলিত হতে পারে।

শয়তান কখনো এই ছিদ্র পথে দাইর নিকট প্রবেশ করে। তখন দাই ভাবে, কিছু দিক থেকে সামান্য পরিমাণ সরে হলেও ক্ষমতাসীনদেরকে হাতে রাখার মধ্যেই দাওয়াতের কল্যাণ নিহিত। কিন্তু বাস্তব হলো, পথের শুরু অংশের সামান্য বিচ্যুতি শেষ পর্যন্ত পূর্ণ বিচ্যুতির কারণ হয়। দাই যখন দাওয়াতের কোনো অংশে শিথিলতাকে গ্রহণ করে নেয় –তা যত সামান্যই হোক– এবং দাওয়াতের কোনো বিষয়ে উদাসীন থাকে –তা যত অল্পই হোক–; সে তখন প্রথম শিথিলতাগ্রহণের উপর ক্ষান্ত থাকতে পারে না। কেননা, দাই যতই পেছনে হটবে, শিথিলতা গ্রহণের যোগ্যতা ও মানসিকতা ততই তার বৃদ্ধি পাবে।

ক্ষমতাসীনরা দাইদেরকে সুযোগ দিয়ে থাকে। তাই যখন দাইরা কোনো বিষয় মেনে নেয়, তখন ক্ষমতাসীনদের নিকট তাদের প্রভাব ও দৃঢ়তা হারিয়ে যায়। এবং তারা বুঝে ফেলে যে, দরকষাকষি ও মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে দাইদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনা অতি সহজ।[১]

আর ক্ষমতাসীনদেরকে দাওয়াতের কাতারে আনার জন্য শিথিলতাকে গ্রহণ করা –তা যত সামান্যই হোক– এক ধরনের আত্মিক পরাজয়। আর এই পরাজয় অর্জন হচ্ছে দাওয়াতের সাহায্যার্থে ক্ষমতাসীনদের উপর ভরসা করার মাধ্যমে। অথচ দাওয়াতের ময়দানে মুমিনদের কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করা জরুরি। বলাবাহুল্য, পরাজয় যখন অন্তরের গভীরে একবার প্রবেশ করে, তা আর জয়ে রূপান্তরিত হয় না!! ['ফি যিলালিল কুরআন'-এর উদ্ধৃতি সমাপ্ত হয়েছে।]

---

১. একজন বিশ্লেষক এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন– যেমন বাংলাদেশে যখন মূল্যবৃদ্ধি কওমি মাদরাসার সনদকে সরকারী স্বীকৃতি দানের স্তরে পৌঁছেছে, তখন ২০১৩ সালের ৫ই মে-র শাপলা চত্বরে আমরা যারা সমাবেশ করেছিলাম, আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনা সহজ হয়ে গেছে। ৩১৯-৩২০ নং পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

বর্তমানে আমরা অনেক দাইকে দেখতে পাই, তাগুত তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে রেখেছে। তারা দাইদের কোনো ক্ষতি করে না, বিরোধিতাও করে না। কেননা এই দাইরা তাগুতদের অনেক অসার ও বাতিল বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করছে, মাঝপথে তাদের সাথে একাত্মতা পোষণ করছে এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক অনুষ্ঠানে তাদের সঙ্গে বৈঠক করছে।

আমাদের সমকালীন বাস্তবতায় তাগুতদের কূটকৌশলের কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ–

- দাই ও নিজেদের অন্যান্য প্রতিপক্ষকে একত্র করার জন্য তাগুতরা বিভিন্ন দেশে সংসদ, জাতীয় পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে। তারা সেখানে তাদের সঙ্গে বসে এবং নিজেদের দীনবিরোধী অবস্থানগুলোকে আলোচনার বিষয় থেকে সরিয়ে রাখে। ফলে ব্যাপারটা তখন তাগুত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা বা তাদের আইন ও সংবিধান প্রত্যাখ্যান করা বা তাদের সকল গোমরাহি থেকে দায়মুক্তির মধ্যে থাকে না।[১] বরং তাদের সমর্থন, সহযোগিতা ও কল্যাণকামিতার পর্যায়ে চলে যায়। শুধু কি তাই! বরং এমন দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনার টেবিলে বসার পর্যায়ে চলে যায়, যে দেশের শাসক হলো তাগুত, আর সে নিজের কুফরি ও প্রবৃত্তি দ্বারা তা শাসন করে চলছে।

  আজকের দিনে এটি এমন একটি পদস্খলন, যারা এর শিকার তাদের সঙ্গে আমরা বসবাস করছি। এসকল দাইদের অধিকাংশ নিজেদেরকে আকাবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার দাবি করে। তা সত্ত্বেও তারা তাগুতদের সমর্থনে হাততালি দেয়। তাদের সম্মানে দাঁড়ায়। তাদেরকে বিভিন্ন মুখরোচক উপাধিতে সম্বোধন করে।

---

১. অথচ এই প্রত্যাখ্যান ও সম্পর্কছিন্নতা হলো তাওহিদের কালিমার প্রাথমিক দাবির অন্তর্ভুক্ত। সুরা মুমতাহিনা-র ৪র্থ আয়াত দ্রষ্টব্য।

তাগুত, তাগুতি শাসন ও তাগুতি সৈন্যবাহিনীর অনুগত্যের জন্য মানুষকে আহ্বান করে। এমনকি তাদের কুফরি আইন ও সংবিধানের উপর শপথ পাঠ করে। আফসোস! তাদের দাওয়াতের আর কি অবশিষ্ট থাকল!! আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাজত করুন।

দাইদেরকে মিল্লাতে ইবরাহিম থেকে সরানোর জন্য তাগুতদের আরেকটি কূটকৌশল হলো, তারা আলেমদেরকে সঙ্গবদ্ধ করে রাখে এবং তাদের সময়গুলো নিজেদের স্বার্থে ব্যস্ত করে রাখে। নিজেদের দল ও শাসনের জন্য যাদেরকে হুমকি মনে করে, তাদের বিরুদ্ধে আলেমদেরকে লেলিয়ে দেয়। যেমন- সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ও শিয়ামতাদর্শী ইত্যাদি বিভিন্ন দলের বিরুদ্ধে, যারা তাদের ও তাদের শাসনব্যবস্থার জন্য হুমকি।

তাই দেখা যায়, তাগুতরা এ সমস্ত ভ্রান্ত দলকে অপছন্দকারী উদ্যমী আলেমদের দারস্থ হয়। তাদেরকে এ সকল শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করে। দীন ও দীনদারদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে ও মুসলমানদের নিরাপত্তায় এ সকল দলের ভয় দেখিয়ে আলেমদেরকে ধোঁকা দেয়। এবং তাদের মোকাবেলা করার জন্য আলেমদেরকে আর্থিক ও আত্মিক সাহায্যের যোগান দেয়। ফলে এ সরলমনা আলেমরা তাদের শিকারে আটকে যায় এবং নিজেদের জীবন, সময় ও দাওয়াতকে এক শত্রুর মোকাবেলায় এবং অপর শত্রুর সাহায্যে ব্যয় করে।

কখনো তো অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, আলেমরা নিকটবর্তী শত্রু তথা তাগুতদের সাথে শত্রুতা করার পরিবর্তে তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে নেয়। বরং একসময় তাঁরা তাগুত ও তার শাসনের একনিষ্ঠ বাহিনী ও সাহায্যকারীতে পরিণত হয়। তাগুতদের সেবায়, তাদের ক্ষমতা ও সিংহাসন সুসংহত রাখায় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে। বুঝে করুক বা না বুঝে করুক, ঘটনা

তো এটাই ঘটে। আফসোস, তারা যদি আল্লাহর নবি মুসা আলাইহিস সালামের উক্তিটি বুঝত!–

رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ.

হে প্রভু! যেহেতু আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, অতএব আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না। (সুরা কাসাস : ১৭)

আল্লামা কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন রেওয়ায়েত সামনে রেখে লিখেছেন–

যে ইসরাইলি যুবক হজরত মুসা আলাইহিস সালামের নিকট সাহায্য চেয়েছিল, সে কাফের ছিল। কিন্তু 'ইসরাইলি' হওয়ার কারণে মুসা আলাইহিস সালাম তাকে 'স্বীয় দলভুক্ত' বলেছেন। নিজের দলভুক্ত বলার ক্ষেত্রে দীনের অভিন্নতা উদ্দেশ্য নেননি। এ কারণেই তিনি পরবর্তীতে অনুশোচনা করেছেন। কেননা তিনি একজন কাফেরের বিপক্ষে অপর এক কাফেরকে সাহায্য করেছিলেন। তাই বলেছেন–

فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ.

অতএব আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না। (সুরা কাসাস : ১৭)

আফসোস! এ আলেমরা যদি আল্লাহ তাআলার নিম্নের বাণী বুঝত, তাহলে যাতে তারা পতিত হয়েছে তাতে পতিত হত না।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

হে মমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গে রয়েছেন। (সুরা তাওবা : ১২৩)

কারণ, যদিও শিয়া ও সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি লোকেরাও ইসলামের শত্রু, তাই তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা ও তাদের অসার অবস্থানগুলোকে প্রত্যাখ্যান করাও জরুরি। কিন্তু জরুরি বিষয়ের উপর অতীব জরুরি বিষয়কে এবং নিকটতর জিনিসের উপর অধিক নিকটতর জিনিসকে প্রাধান্য দেওয়া আমাদের নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের নির্ধারিত ও বিদিত নিয়ম।

সুস্থ বিবেকও এর উল্টোটাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে। কেননা সরাসরি নিকটতর শত্রুর ভয়াবহতা, তার প্রভাব, অনিষ্ট ও ফিতনা, দূরবর্তী বা পরোক্ষ শত্রুর তুলনায় অধিক ক্ষতিকর। এজন্যই সাধারণ শত্রুর মোকাবেলার পূর্বে শয়তান ও নফসের মোকাবেলা করা জরুরি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব জীবনেও আমরা এর নমুনা দেখতে পাই। তিনি তাঁর নিকটের শত্রু তথা মক্কার মুশরিকদের ব্যাপারে উদাসীন থেকে পারস্য, রোম ও ইহুদিদের মোকাবেলা আগে করেননি।

- অনেক তাগুত এ ঝুঁকিপূর্ণ পিচ্ছিল অবস্থানের অপব্যবহার করেছে। তারা ঐ সকল হকপন্থি দাইকে প্রতিহত করার জন্য ও ভয় দেখিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে তাঁদের ইসলামি দলগুলোর ব্যাপারে আতঙ্কিত করার জন্য অনেক অজ্ঞ আলেমকে ব্যবহার করেছে, যারা হলেন আল্লাহর দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে অথবা দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপপদ্ধতিতে ঐ আলেমদের প্রতিপক্ষ। বরং কখনো কখনো তাগুতরা এ সকল আলেম থেকে ফতোয়া হাতিয়ে নিয়েছে হক্কানি দাই ও তাঁদের দাওয়াতকে নির্মূল ও মূলোৎপালন করার জন্য; এই বলে যে, তারা খারেজি, বিদ্রোহী, ধর্মত্যাগী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী। ফাসাদ সৃষ্টিকারী বস্তুত ওরাই। বর্তমানে এই স্খলনে আমরা অনেককেই নিপতিত হতে দেখছি। আল্লাহ তাআলার কাছেই এর অভিযোগ করছি।

এ সমস্ত অজ্ঞ আলেমরা জানে না, যাদেরকে তারা খারেজি প্রভৃতি বলছে তারা যত বিচ্যুতই হোক, তা সর্বোচ্চ অজ্ঞতা বা অসাবধানতাজনিত বিচ্যুতি হবে। তার চেয়ে বেশি হলে জ্ঞাতসারে বারংবার ঘটিত ভুল হবে। কিন্তু তা কখনো তাগুতদের বিচ্যুতি এবং তাগুত কর্তৃক আল্লাহ ও তাঁর দীনের বিরোধিতার পর্যায়ে পৌঁছাবে না।

- তাগুতদের আরেকটি কূটকৌশল হলো, তারা দাই ও মুমিনদের বিভিন্ন চাকরি, পদবি ও উপাধির প্রলোভন দেখায়। যেমন- বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, ধন-সম্পদ ও ফ্ল্যাট-বাড়ির লোভ দেখায়। এক পর্যায়ে তাদেরকে তারা আটকে ফেলে এবং মুখ বন্ধ করে দেয়। ফলে তারা কেমন যেন এই প্রবাদ-বাক্যের বাস্তবায়ন ঘটায়, 'যার নুন খাও, তার গুণ গাও।'

এভাবেই দাই বা অজ্ঞ আলেমরা তাগুতদের ফাঁদে আটকা পড়ে যায়। অবস্থা এক পর্যায়ে এমন হয় যে, স্বয়ং তারাই বিভিন্ন ফতোয়ার মাধ্যমে তাগুতদের কাজের সমর্থন করে। হাততালি দেয়। প্রশংসা করে।

ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'তালবিসু ইবলিস' কিতাবে [পৃ. ১২১] বলেন-

ফকিহদের উপর ইবলিসের একটি কূটকৌশল এটাও যে, সে তাদেরকে শাসকদের সংশ্রব ও তোষামোদে জুড়িয়ে দেয়। শাসকদের মন্দ বিষয়গুলোর নিন্দা জ্ঞাপনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা থেকে ফকিহদেরকে বিরত রাখে।

তিনি আরো বলেন [পৃ. ১২২]-

মোট কথা শাসকদের দরবারে গমন করা অনেক ভয়ংকর। কেননা শুরু দিকে নিয়ত যদিও ভালো থাকে, ইখলাস যদিও পূর্ণ থাকে, কিন্তু তাদের হাদিয়া ও সম্মান পাওয়ার পর নিয়ত পাল্টে

যায়। ইখলাস দুর্বল হয়ে যায়। ফলে দাইরা তাদের তোষামোদ শুরু করে দেয়। এবং তাদের অসারতা বর্ণনা ছেড়ে দেয়।

সুফইয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন–

আমি শাসকদের অপমানের ভয় করি না। আমি বস্তুত তাদের সম্মান ও আমার অন্তর তাদের দিকে ধাবিত হওয়াকে ভয় করি।

[ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতি সমাপ্ত হয়েছে]

সুফইয়ান ছাওরি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সময়কার যে শাসকদের ব্যাপারে এ ভয় করেছিলেন, জ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি একটু চিন্তা করেন, তাহলে ঐ সকল শাসক ও বর্তমানের তাগুতদের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখতে পাবেন।[১] আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি। বস্তুত ঐ আলেমের তুলনায় ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত কেউ নেই, দুনিয়া যাকে জাহেলদের খেলনার গুটিতে পরিণত করেছে এবং সম্পদের লোভ যার দীনকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। যে ব্যক্তি 'আল্লাহ তাকে দেখেন' এই মোরাকাবা করে না এবং নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে না, সে ধ্বংস হোক, তার কোনো অভিভাবক নেই।

- তাগুতদের আরেকটি কূটকৌশল হলো– তারা দীন ও দাওয়াতের বিভিন্ন শাখার প্রতি নিজেদের আগ্রহ প্রকাশ করে। উদ্দেশ্য, এই পথ অবলম্বন করে এমন আলেম ও দাইদেরকে কাছে টানা, যাদের ইখলাস ও আন্তরিকতা এবং জনগণ কর্তৃক তাদের মহব্বত করাকে তাগুতরা ভয় করে। তাই তারা কৌশলস্বরূপ এসকল আলেমের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আবাসন, প্রচারকেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে দেয়। ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন প্রকল্প ও বিশ্বকোষ তৈরি সর্বোপরি ঐসকল কাজে তাদেরকে নিযুক্ত করে, যেগুলোতে তাগুতদের অনিষ্টতা ও সীমালঙ্ঘনের আলোচনা থাকে না।

---

১. তখনকার শাসকদের অনেকে ছিল ফাসেক। পক্ষান্তরে যারা আইন করে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' বিলুপ্ত করে, বা বিলুপ্ত করাকে মেনে নেয়, তাদের কাজটা হলো 'কুফরে বাওয়াহ' [প্রকাশ্য কুফর]।

এর একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন হলো তাগুতদের প্রতিষ্ঠিত সংস্থা ও ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠানসমূহ। যেমন- রাবেতায়ে আলমে ইসলামি।[১]

---

১. এ প্রসঙ্গে রাবেতায়ে আলমে ইসলামির অন্যতম মরহুম সদস্য, বিদগ্ধ বাংলা সাহিত্যিক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রাহিমাহুল্লাহর একটি ঘটনা উল্লেখ করা উপযোগী মনে করছি, যা আমি প্রবীন আলেমে দীন ও কলামিস্ট মাওলানা ইসহাক ওবায়দী রাহিমাহুল্লাহ থেকে সরাসরি শুনেছি। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে কোনো একদিন নোয়াখালির এক মাদরাসায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় তিনি রাবেতায়ে আলমে ইসলামির একটি ইমানবিধ্বংসী তাগুতি পদক্ষেপের বিবরণ দিলেন। লোমহর্ষক এ ঘটনা শুনে অবাক হলাম। ঘটনাটি তিনি তাঁর নির্বাচিত কলাম– 'যেমন কর্ম তেমন ফল' পুস্তকের ১৬৭ পৃষ্ঠায়ও উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়–

'... কোনো সাহিত্য সম্মেলনে আমার আগমন এই প্রথম। তাই আনন্দঘন এই সাহিত্য আড্ডা মজা করেই উপভোগ করছিলাম। ইসলামি সাহিত্যের বর্তমান যুগের অগ্রপথিক মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দিন খানকে কেন্দ্র করেই মূলত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। তাঁর দীর্ঘ ৫০/৬০ বছরের সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সংবর্ধিত করে সম্মান জ্ঞাপন করাই ছিলো এর মূল উদ্দেশ্য। তবে তরুণদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তাঁর সাথে আরো নয়জন সাহিত্যসেবীকেও বিভিন্ন ক্ষেত্রের অবদানস্বরূপ সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

মাওলানার সাথে আমার দীর্ঘদিন পর সাক্ষাৎ হওয়াতে হোটেল কক্ষে বসে অনেক বিষয়ে আলাপ হচ্ছিলো। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, ইদানিং ইহুদী জায়নবাদীরা আমাদের পবিত্র কুরআন শরীফকে বিকৃত করার ঘৃণ্য এক প্রচেষ্টা আরম্ভ করেছে। তিনি বললেন, কিছু দিন পূর্বে রাবেতায়ে আলমে ইসলামির পক্ষ থেকে আমার কাছে একটি পত্র আসে যে, প্রায় সাতশ কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে বলা হয়, এই আয়াতগুলোকে পবিত্র কুরআন থেকে বাদ দেওয়া যায় কি না– এ মর্মে আপনার সিদ্ধান্ত পেশ করুন। [উল্লেখ্য, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রাবেতার বাংলাদেশ সদস্য।] খান সাহেব বললেন, আমি কঠোর

এ সংস্থার উন্মুক্ত ও কদাকার পদচারণা সত্ত্বেও আমাদের অনেক আলেম না জেনে এর ধোঁকায় পড়েছেন। সংস্থাটি সাধারণভাবে জালিম ও বাতিল সরকারদের চাটুকারিতায় লিপ্ত এবং বিশেষকরে সৌদি সরকার ও তার তাগুতদের তোষামোদে পঞ্চমুখ! এজন্য দেখা যায়, যখনই এ সংস্থা থেকে কোনো বই বা লিফলেট প্রকাশিত হয়, তাতে সৌদি সরকারের চাটুকারিতা উপচে পড়ে। বুঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এ সংস্থা ও তার সন্দেহভাজন দায়িত্বশীলরা বিভিন্ন তাগুতি সরকারের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে এবং কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে বা বিপক্ষে বলতে হলে সৌদি সরকারের মনোবাঞ্ছার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বহির্রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে তাগুতরা যেমন চায় তারাও তেমনই চায়। যেমন- লিবিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মুআম্মার গাদ্দাফি। সে যখন আরব ও বিভিন্ন তাগুতি রাষ্ট্রে হামলা করল, তখন তার বিরুদ্ধে ফতোয়া ও প্রতিবাদের ঝড় নেমেছিল। কিন্তু যখন অবস্থা শান্ত হয়ে গেল, তখন সকল আপত্তি ভণ্ডুল হয়ে গেল, নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় থেমে গেল। অথচ সে আগের সেই গাদ্দাফিই ছিল। তার অবস্থার পরিবর্তন তো হয়নি, বরং আগের চেয়ে আরো ভয়ানক আকার ধারণ করেছিল। তারা যদি এখন তাকে তার নাপাকি ও নাফরমানিসহ আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে দেখে, একটুও নড়েচড়ে বসবে না। আফসোস! অভিযোগ আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি!

যাইহোক, এ প্রতিষ্ঠান ও এর মতো সংস্থাগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি কিছু নয়। আর আমাদের অভ্যাস হলো,

---

ভাষায় লিখে দিলাম যে, এই সকল আয়াত বাদ দেয়া তো দূরের কথা, বাদ দেয়ার চিন্তা মনে আনাও জঘন্যতম গোনাহের কাজ। তাই আপনাদের পক্ষে এই বিষয়ে অন্যান্য দেশের মতামত নেওয়াও হারাম হবে। এই ব্যাপারে আবার মতামত কিসের?'

তাগুতি সরকারের পক্ষ থেকে আগত দীনি কোনো উদ্যোগে আমরা আস্থাশীল নই। আমাদের অভ্যাসটি কতই না উত্তম!

- তাগুতরা অনেক সময় দাইদেরকে দাওয়াত ও ভাষণের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র দিয়ে থাকে এবং 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধে'র বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এ সমস্ত সংস্থার উদ্দেশ্য, উদ্যমী দাইদেরকে এক প্লাটফর্মে একত্র করা এবং সরকার ও তাগুতদের বিভিন্ন ভ্রান্তি বিষয়ে কথা বলা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা। এ উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার জন্য তারা দাইদেরকে সাধারণ লোকদের কিছু অন্যায় কাজে বাধাদানে লিপ্ত করে রাখে। কারণ, প্রথমোক্ত ভ্রান্ত কাজসমূহে বাধাদান তাগুতি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও তাগুতি শাসনের স্থায়িত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। দাইরা যতদিন এ সকল সরকার সমর্থক সংস্থা বা লাইসেন্সের সাথে জড়িত থাকে, ততদিন আর উপরের দিকে অগ্রসর হয় না।
- তাগুতদের আরেকটি কূটকৌশল হলো, মুসলিম সন্তানদের অন্তর থেকে মিল্লাতে ইবরাহিম তথা ইসলাম ধর্ম মুছে দেওয়া। এক্ষেত্রে তারা ইনস্টিটিউট, শিক্ষালয়, প্রচারমাধ্যম ইত্যাদি বিভিন্ন তাগুতি প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানের তাগুতরা মূলত ফিরাউন থেকেও অধিক ভয়াবহ। এক্ষেত্রে তারা ফেরাউনের চেয়েও বড় কৌশলী। ফেরাউন তো আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকারীদের সন্তানদেরকে প্রকাশ্যে হত্যার আদেশ করেছিল। কিন্তু বর্তমানের তাগুতরা মুসলমান সন্তানদেরকে ধ্বংস করার জন্য এক নয়া কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে, যা অত্যন্ত ভয়াবহ ও মারাত্মক। তারা এ প্রজন্মকে ফিরাউনের মত প্রকাশ্যে হত্যা করে না। তাদের শারীরিক কোনো ক্ষতি করে না। কিন্তু তারা মুসলমান সন্তানদের দিল ও অন্তরে মেহনত করে। তাদের চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতা পরিবর্তনের চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে তাদের অন্তর থেকে ইসলামের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে দেয়।

তারা মুসলিম সন্তানদেরকে তাগুতদের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তাগুতি শাসন ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা ও তা মান্য করার আহ্বান করে। এ জঘন্য কাজটি তারা ঐ সকল প্রতিষ্ঠান ও প্রচারমাধ্যম দ্বারা আঞ্জাম দিয়ে থাকে। আফসোসের সাথে বলতে হয়, আমাদের মুসলিম সন্তানরা আজ সেখানেই শিক্ষিত হচ্ছে। তারা আজ এসকল প্রচারমাধ্যম নিজেদের ঘরে তুলে আনছে।

মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করার জন্য তাগুতরা আজ এ জঘন্য পায়তারাই করে চলছে। তারা মানুষকে 'হাতে মারছে না, ভাতে মারছে'। প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ মানবহত্যায় মগ্ন আছে। সাহায্য ও উপকারিতার নামে তারা আজ এসকল প্রতিষ্ঠান খুলে বসে আছে। যেন মানুষ তাদের নির্দোষ ভেবে তাদের কৃতিত্ব ও প্রশস্তি গেয়ে বেড়ায় যে, তারা আমাদের নিরক্ষরতা দূর করছে, তারা আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কর্ণধার। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরো মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, এসব কিছুর মধ্যদিয়ে তাগুতরা মুসলমানদের একটি বড় অংশকে তাদের ও তাদের শাসন-সংবিধানের একনিষ্ঠ ভক্ত ও বিশ্বস্ত অনুসারী বানিয়ে নিচ্ছে। কমপক্ষে এতটুকু তো অবশ্যই হচ্ছে যে, এ কৌশলের মাধ্যমে তারা আমাদের প্রজন্মকে নিস্তেজ, অজ্ঞ ও বিচ্যুত বানিয়ে দিচ্ছে, যারা ইসলাম ধর্মের সত্য ও সঠিক দাওয়াত[১] থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, বাতিলের চাটুকারিতা করছে। ফলে এক পর্যায়ে তারা নিজেদের শক্তি হারিয়ে ফেলছে এবং তাগুতদের মুখোমুখি হওয়া ও তাদের বিষয়ে চিন্তা-যোগ্যতার জলাঞ্জলি দিচ্ছে। এ বিষয়টি আমরা আরো বর্ধিত পরিসরে আলোচনা করেছি আমাদের إِعْدَادُ القَادَةِ الفَوَارِسِ بِهَجْرِ فَسَادِ المَدَارِسِ গ্রন্থে।

---

১. ৩০৫-৩০৬ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাতে আমরা তাগুতদের অনিষ্টকর কৌশলগুলোর মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছি।

আফসোস! এ ধরনের হোঁচট ও স্খলন দ্বারা দাইরা কতো অধঃপতিত হচ্ছে! আলেম ও ইসলামি নেতৃত্বের উপর মানুষের যে অনাস্থা –যা আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি– এ পদস্খলনেরই ফল।[১] দাইরা আজ তাগুতদের কাছেও কত হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে!

---

১. আমাদের শিক্ষার স্বীকৃতি, শুকরিয়া মিছিল, শুকরানা মাহফিল ও সরকারী খরচে হজযাত্রায় গমনের পর, গণমানুষের চোখে আমাদের প্রতি কোনো অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে কি না এবং হয়ে থাকলে তা কী পরিমাণ, নিজেরাই নির্ণয় করি। এই নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে দেশের সাবেক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রয়াত প্রতিমন্ত্রী শেখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহর বক্তব্যের নিম্নের লিংক।

https://www.youtube.com/watch?v=uqpiwbB93cs

উদাহরণস্বরূপ এ লিংকের ১ ঘন্টা ২৮ মিনিট ১৭ সেকেন্ড পরবর্তী বক্তব্যের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা যায়–

'এবার হজেও কিন্তু আমি প্রত্যেকটা কাজ একটু হেকমতের সাথে করতে পারলে ভালো হয় না? আমি আমার যাদেরকে পছন্দ, তাকে নিছি। যারা চিৎকার করত, তাদেরকেও সাথে নিছি। কী জন্যি? যে নামাজের সময় যদি কুত্তা ঘেউ ঘেউ করে, নামাজ নষ্ট হয় না? তাহলে কুত্তাডারে যদি এক ভাগ বা এক কেজি মাংস খাওয়াই দিয়া কই– খা, তাহলে মাংস খাইতে থাকল, তা তো আর ডাকাডাকি করতে পারল না। মাঝখান দিয়া এতমিনানের সাথে আমার নামাজটা হইয়া গেল। আমি যাদেরকে নিতে চাইছি, যাদেরকে নিলে আমাদের সুবিধা হবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে নিছে। যারা চিৎকার করে ঘেউ ঘেউ করবে, তাদেরও কিছু দিছি। শর্ত ছিল, যাহোক, অনেক লম্বা, সবাই মিলে কিন্তু আল্লাহর রহমতে কোনো গোলমাল-গোলোযোগ হয়নি।'

তাগুতদের দিল থেকে তাদের ভয় বিদায় নিচ্ছে। তাগুতরা আজ

লিংকের ১ ঘণ্টা ১ মিনিট ২৭ সেকেন্ড থেকে ১ ঘণ্টা ৪ মিনিট ২২ সেকেন্ড পর্যন্তের বক্তব্যটিও এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তাতে বরং আরো বেশি দুরবস্থা ফুটে উঠেছে। লিখে পাঠকের সামনে পেশ করতে আমাদের রুচিতে বাধে। তাই প্রিয় আত্মমর্যাবোধসম্পন্ন মুসলিম ভাই! সুযোগ হলে বক্তব্যের এ অংশটিও অবশ্যই শুনুন।

প্রতিমন্ত্রীর উল্লিখিত বক্তব্য থেকে একজন আলেম অনেকগুলো বিষয় উদ্ভাবন করেছেন। কয়েকটি নিম্নরূপ–

১. যেসকল আলেমকে ধর্মনিরপেক্ষতার অধীনে হজ করার জন্য আহ্বান করা হয়নি, তাঁরাও বিভিন্ন কৌশলে ও বিভিন্ন মাধ্যমে হজের এ ধর্মনিরপেক্ষ কাফেলায় শরিক হওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। আর এভাবে দশ/বার জনের কাফেলা পঞ্চাশ/ষাট জনের কোটায় পৌঁছেছে। [এ তথ্যটি নেওয়া হয়েছে লিংকটির উল্লিখিত স্থানের পুরো বক্তব্য থেকে]

২. ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি কোনো কোনো আলেমকে হজের সফরের জন্য আহ্বান করেছে, তাদের ঘেউ ঘেউ থামানোর জন্য।

৩. ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি যাদেরকে হজে নিয়েছে, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে তাদের অনেকের জন্য হজটি ছিল কুকুরকে দেওয়া গোশতের টুকরা সদৃশ।

৪. ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে যেসকল আলেম কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করার মাধ্যমে তাদের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির গতিপথে ঝামেলা সৃষ্টি করে, একটি গোশতের টুকরা দিয়ে তাদের ঘেউ ঘেউ থামানোর জন্য সরকারি খরচে হজের আয়োজনটি করা হয়েছে।

৫. যাদেরকে হজে নিলে ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের সুবিধা হবে, কর্তৃপক্ষ তাদেরকেই নিয়েছে।

৬. হজ কাফেলার আলেমরা ছিলেন গোলমাল-গোলযোগকারী অবুঝ শিশু সদৃশ।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

দাই ও দাওয়াতকে ভয় করে না। দাওয়াতের সামনে তারা আর সঙ্কুচিত হয় না। একে কোনো গুরুত্বই দেয় না।

পক্ষান্তরে তারা যখন দাইদের থেকে পাহাড়সম অটলতা ও অবিচলতা দেখে, তাগুত থেকে মুক্তি, ঘৃণাভরে প্রত্যাখান এবং তাদের থেকে দূরত্ব প্রত্যক্ষ করে, তখন তাগুতরা দাইদের অনেক হিসেব করে চলে। আল্লাহ তাআলা তখন তাগুতদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে দেন। যেমন তিনি কাফেরদের অন্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভয় সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এক মাসের দূরত্বে থেকেও কাফেররা তাঁকে ভয় করত। অতএব এ সকল পদস্খলন ও তাগুতদের খেলনার গুটিতে পরিণত হওয়া থেকে সাবধান!

আল্লাহ তাআলা তাগুতদের এসকল কল্পনার কথা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের পরিকল্পনাগুলোর মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন। সেগুলোর ব্যাপারে সর্তক করেছেন। সমাধান পেশ করেছেন এবং সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন। কোরআন পাকে সুরা কালামের ৯ নং আয়াতে জানিয়েছেন–

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

তারা আপনার শিথিল হওয়া প্রত্যাশা করে, তখন তারাও শিথিল হবে। (সুরা কালাম : ৯)

এর পূর্বের আয়াতেই বলেছেন– فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ

অতএব আপনি মিথ্যুক সাব্যস্তকারীদের আনুগত্য করবেন না। (সুরা কালাম : ৮)

অর্থাৎ তাদের অনুগত্য করবেন না। তাদের দিকে ঝুঁকবেন না। তাদের সমাধান গ্রহণ করবেন না। কারণ, আপনার রব তো আপনাকে সত্য দীন দান করেছেন। সরল পথ প্রদর্শন করেছেন এবং মিল্লাতে ইবরাহিমের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি তো আপনাকে মিল্লাতে ইবরাহিমের প্রতি পথনির্দেশ করেছেন।

- ঠিক অনুরূপ নির্দেশ এসেছে সুরা দাহরে। সেটিও মক্কি সুরা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا.

আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি ক্রমে ক্রমে। অতএব আপনি আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করুন এবং তাদের মধ্যকার কোনো পাপিষ্ঠ বা অকৃতজ্ঞের আনুগত্য করবেন না। (সুরা দাহর : ২৩-২৪)

এ আয়াতে কাফেরদের আনুগত্যের নিষেধাজ্ঞা বর্ণনার পূর্বে কুরআন নাজিলের মাধ্যমে নবির উপর অনুগ্রহের বর্ণনা এসেছে। এতে দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি ফুটে উঠেছে। কেননা এ পদ্ধতি দাইগণ নিজেদের পক্ষ থেকে তৈরি করেন না। আর তাদের এ অধিকারও নেই যে, তারা নিজেদের ইচ্ছা মতো দাওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনা করবেন এবং তার রূপরেখা নির্ধারণ করবেন। কারণ, তা তো মিল্লাতে ইবরাহিম ও নবি-রাসুলগণের দাওয়াত, যা কুরআন পাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

- আল্লাহ তাআলার অনুরূপ আরেকটি ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে সুরা ফুরকানে। এটিও মক্কি সুরা।

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا.

অতএব আপনি কাফেরদের অনুগত্য করবেন না এবং এর [কুরআনের] মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে জোরদার জিহাদ করুন। (সুরা ফুরকান : ৫২)

অর্থাৎ কুরআনে আদিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া দাওয়াতের অন্য কোনো পন্থা ও পদ্ধতি গ্রহণ করবেন না। এ কুরআনের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করুন। কাফেরদের অনুগত্য হয় এমন কোনো বক্র পথের অনুসরণ করবেন না। এমন কোনো পথও অনুসরণ করবেন না, যাতে কাফেরদের কিছু বাতিল বিষয়ে চুপ থাকা হয়।

- আরেকটি উদাহরণ হলো, সুরা কাহাফের ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন তিলাওয়াত করার আদেশ করেছেন।[১] এ আদেশের পরপরই নবিকে বলেছেন–

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.

এবং তার আনুগত্য করবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলেছে, আর তার কাজই হচ্ছে সীমা অতিক্রম করে যাওয়া। আর আপনি বলুন, সত্য বাণী তোমাদের রবের পক্ষ থেকে [আগত]। এখন যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক। (সুরা কাহাফ : ২৮-২৯) উল্লেখ্য, এগুলোও মক্কি আয়াত।

- সুরা শুরার নিম্নোক্ত আয়াতটিও অনুরূপ। এটিও মক্কি আয়াত। আমাদের জন্য এবং হজরত নুহ, ইবরাহিম, মুসা, ইসা প্রমুখ

---

১. 'তিলাওয়াত' শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে ইত্তিবা বা অনুসরণ। تَلَا الشَّيْءَ : তার অনুসরণ করল। পাঠ করা, শেখা, আকড়ে ধরা ও আদেশ-নিষেধ মান্য করার মাধ্যমে আল্লাহর কিতাবের তিলাওয়াত তথা অনুসরণ করা, এ পথে অবিচল থাকার অন্যতম উপায়। এর সঙ্গে যুক্ত হবে আল্লাহর সার্বক্ষণিক জিকির, তাঁর মোরাকাবা ও তাহাজ্জুদ। যেমন আল্লাহ তাআলা সুরা দাহরের উল্লিখিত আয়াতের পরপরই ইরশাদ করেছেন–

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.

আর আপনি আপনার রবের নাম জপতে থাকুন সকাল ও সন্ধ্যায়। এবং রাতের কিছু সময় তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা করুন, এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন দীর্ঘ রাত পর্যন্ত। (সুরা দাহর : ২৫) [এ টীকাটি প্রবন্ধকারের পক্ষ থেকে।]

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জন্য আল্লাহ তাআলা যা প্রবর্তন করেছেন তা উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন–

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ، وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ، وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ.

অতএব আপনি সে দিকেই আহ্বান করুন এবং অবিচল থাকুন, যেরূপ আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। আর তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। (সুরা শুরা : ১৫)

কাফেরদের খেয়াল-খুশি ও বিকৃত রীতি-পদ্ধতি থেকে সম্পর্ক ছিন্নতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ তাআলা এর একটু পরেই তাঁর নবিকে কাফেরদেরকে সম্বোধন করে এই বলার আদেশ করেছেন–

لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ.

আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। (সুরা শুরা : ১৫)

- সুরা জাসিয়ার নিম্নোক্ত আয়াতটিও অনুরূপ। এটাও মক্কি আয়াত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِيعَةٍ مِنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ، اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا ۚ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ.

অতঃপর আমি আপনাকে দীনের বিশেষ এক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব আপনি তার অনুরসরণ করুন। এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। নিশ্চয় তারা আল্লাহর মোকাবেলায় আপনার কোনো উপকারে আসবে না। নিঃসন্দেহে জালেমরা একে অপরের বন্ধু, আর আল্লাহ মুত্তাকিদের বন্ধু। (সুরা জাসিয়া : ১৮-১৯)

গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে কুরআন পাকে তালাশ করলে আমরা শত শত আয়াত পেয়ে যাব। বস্তুত আল্লাহ তাআলা মানুষকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি এবং সৃষ্টি করে তাদেরকে বেকার ছেড়ে দেননি। আফসোস! দাইদের জন্য কি এ দীনের স্পষ্টতা ও সরলতা যথেষ্ট নয়? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পূর্ববর্তী নবিগণের জন্য যা যথেষ্ট ছিল, দাইদের জন্য কি তা যথেষ্ট নয়? গাফলতের ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময় কি এখনো হয়নি? অসারতাগুলো সংশোধনের সময় কি আসেনি? আর কত আমরা তাগুতদের খেলনার পাত্রে পরিণত হব? হককে আর কত গোপন করব? মানুষের সামনে সত্যকে আর কত ঘোলাটে করব? সময় ও সাধনা আর কত নষ্ট করব?

কসম খোদার! যেকোনো একটি গ্রহণ করতে হবে– হয়তো আল্লাহর শরিয়ত, নয়তো মূর্খদের খেয়ালখুশি! তৃতীয় কোনো পথ নেই। অপরিবর্তনীয় শরিয়ত ও পরিবর্তনশীল খাহেশাতের মাঝে মধ্যবর্তী কোনো পথ খোলা নেই।

এসকল আয়াত দাইদের জন্য সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তারপর আর কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। ইসলামের মহান শরিয়তই এ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। এতদ্ভিন্ন সবই মানুষের খেয়াল-খুশি, যার উৎস হলো মুর্খতা। দাইদের জন্য একমাত্র শরিয়তের অনুসরণ করা এবং অন্যান্য সকল মত ও পথ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। শরিয়তের কোনো অংশ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেদের কোনো খেয়ালখুশির দিকে ধাবিত হওয়ার অবকাশ নেই।

প্রবৃত্তিপূজারী এসকল তাগুত ইসলামি শরিয়তের বিরোধিতা করতে গিয়ে একে অপরকে সাহায্য করে। তাদের কেউ আমাদের কাউকে সাহায্য করবে এমন আশা করা বৈধ নয়। তারা সবাই হকের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ। একে অপরের বন্ধু। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সত্যের

কোনো ক্ষতি করার সামর্থ রাখে না। তারা কিছু কষ্ট দেওয়া ছাড়া কিছুই করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ তাআলা সত্যের অভিভাবক ও সাহায্যকারী। তাঁর অভিভাবকত্ব ও সাহায্যের তুলনায় বড় সাহায্য ও অভিভাবকত্ব আর কী আছে? যে শরিয়তের রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, তার সামনে দুর্বল, মূর্খ ও ক্ষীণবল লোকেরা কোথায়? আল্লাহ তো মুত্তাকিদের বন্ধু।

এটাই পথ, আছে কি কোনো পথিক!!

মূল : শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম মাকদিসি

অনুবাদ : মাওলানা মুনীর সাআদাত

লেখকের জীবনকথা

সফিউল্লাহ ফুআদ। পিতা আবদুল কাদির। জন্মেছেন কুমিল্লার চান্দিনা থানাধীন বসন্তপুর গ্রামের পূর্ব ভূঁইয়াপাড়ায়; ১৩৯২ হিজরির ১২ই সফর/১৩৭৮ বঙ্গাব্দের ৪ঠা চৈত্র/১৯৭২ ঈসায়ির ১৮ই মার্চ শনিবার দিবাগত রাতে।

লেখাপড়ায় হাতেখড়ি পিতামাতার কাছে। প্রথম মাদরাসা পার্শ্ববর্তী গ্রামের 'জামিয়া ইসলামিয়া আলতাফিয়া' ওরফে 'দারোরা মাদরাসা'। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা ঢাকাস্থ বড়কাটারা ও ফরিদাবাদ মাদরাসায়। তারপর জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা ঢাকায়। দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন প্রথমে ১৪১৫-১৬ হিজরি শিক্ষাবর্ষে বারিধারা মাদরাসায়; তারপর ১৪১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে। ১৪১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে দেওবন্দেই নিয়েছেন 'উচ্চতর আরবি সাহিত্যে'র পাঠ।

আত্মিক-দীক্ষা লাভ করেন মাওলানা আবদুল মতিন বিন হোসাইন হাফিজাহুল্লাহর নিকট। তাঁর কাছ থেকে সোহবত ও বাইয়াতের ইজাযতপ্রাপ্ত হন ১৪৩৩ হিজরিতে।

ব্যক্তি জীবনে শাইখ ফুআদ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নাদাবি ও মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানি রাহিমাহুমাল্লাহর চিন্তাধারায়।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবন শুরু 'জামিয়া নাজমুল হুদা' কেরালা ভারতে। ২ বছর পর ফিরে আসেন জন্মভূমি বাংলাদেশে। ২ বছর 'মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা'য় 'আরবিভাষা ও সাহিত্য বিভাগে'র তত্ত্বাবধায়ক উস্তাদের দায়িত্ব পালনের পর, 'জামালুল কুরআন মাদরাসা' গেণ্ডারিয়া ঢাকায় ২ বছর হাদিসের খেদমত করেন। তারপর দীর্ঘ ১৬ বছর 'আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানীনগর ঢাকা'য় হাদিসের উস্তাদ এবং 'আরবিভাষা ও সাহিত্য বিভাগে'র তত্ত্বাবধায়ক উস্তাদের দায়িত্ব পালন

করেন। ১৪৩৯ হিজরির রমজান থেকে তিনি 'মাহাদুশ শায়খ ফুআদ লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়া ঢাকা'য় অবস্থান করছেন। তিনি এখানকার শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক। এর প্রতিষ্ঠাতা গোপালগঞ্জ জেলার মাওলানা আবদুল আজিজ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৪৩৪ হিজরির রমজানে।

বাংলাদেশের দেওবন্দি ঘরানার মাদরাসাগুলোর মধ্যে সম্ভবত প্রথম প্রতিষ্ঠিত 'আরবিভাষা ও সাহিত্য বিভাগে'র প্রথম উস্তাদ[১] এবং 'তাওহিদ ও আকিদা বিভাগে'র প্রতিষ্ঠাতা উস্তাদ[২] মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ। এ বইয়ের ১৪৯ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত নীতি ও ব্যাখ্যা অনুসারে শাইখ ফুআদ পুরোদস্তুর একজন দেওবন্দি।

'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' ও 'লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি' বইদুটো তালিবে ইলমদের নিয়ে তাঁর স্বপ্নকথন ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের উচ্ছল

---

১. ১৪১৯-২০ হিজরি শিক্ষাবর্ষে তাঁকে দিয়ে 'মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা'য় 'আরবিভাষা ও সাহিত্য বিভাগ' খোলা হয়। আমাদের জানামতে বাংলাদেশের দেওবন্দি ধারার অন্য কোনো মাদরাসায় এর আগে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়নি। ইতোপূর্বে যদি কোনো মাদরাসায় এ নামের বিভাগ চালু থেকে থাকে, তাহলে সেটি হবে প্রথম ও অগ্রগণ্য। অন্যথায় তিনিই হবেন বাংলাদেশের দেওবন্দি ঘরানার মাদরাসাগুলোর প্রথম প্রতিষ্ঠিত 'আরবিভাষা ও সাহিত্য বিভাগে'র প্রথম শিক্ষক। আল্লাহ কবুল করুন। আমিন!

২. ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের বিষয়াদিতে প্রাজ্ঞ একদল নেককার আলেমের সঙ্গে একবছর পূর্বে শাইখ ফুআদ আকিদা ও তাওহিদ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলার ব্যাপারে কয়েক মজলিসে পরামর্শ করেন। উক্ত পরামর্শ সাপেক্ষে ১৪৪১-৪২ শিক্ষাবর্ষে তিনি মাহাদে 'তাওহিদ ও আকিদা বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ণ নাম قِسْمُ العَقِيدةِ والتوحيدِ على مَذْهَبِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ- আমাদের জানা মতে এটি বাংলাদেশের কওমি ঘরানার মাদরাসাগুলোর এ বিষয়ের প্রথম বিভাগ। আল্লাহ কবুল করুন। আমিন!

ঝরনাধারা। রচনার অঙ্গনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখা প্রথিতযশা এ আলেমের ইলমি খেদমতের তালিকা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সংযুক্ত রয়েছে।

আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন; তাঁর সকল প্রচেষ্টাকে তাঁর ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সাদাকায়ে জারিয়া বানান; সর্বোপরি দুনিয়া-আখেরাতে তাঁদেরকে নিরাপদ রাখুন। আমিন![১]

১৪৪৪ হিজরির জুমাদাল আখেরা পর্যন্ত প্রকাশিত

লেখকের গ্রন্থাবলি

স্বরচিত

- النُّسْخَةُ الهِنْدِيَّةُ لِتفسيرِ الجلالينِ : دِرَاسَةٌ وتَحْلِيل
- تيسيرُ مقدِّمةِ الصحيحِ لمُسْلِمٍ
- العقيدةُ الصَّفِيَّةُ على العقيدة الحَسَنَة
- المُوَطَّأُ فِي العَرَبِيَّةِ الوَظِيْفِيَّةِ
- نَظَّارَةُ معلِّمٍ ونَظَرَاتُه – ١
- كيف نتعلمُ الإنشاءَ ١، ٢، ٣
- العَرَبِيَّةُ التَّطْبِيْقِيَّةُ، والكتابُ مِنَ المُقَرَّرات الدراسية لمرحلة «الفاضِل البَكَالُوْرِيُوْس» في بنغلاديش
- النَّهْضَةُ الإسلامِيَّةُ ٢٠٠٣م (مَجَلَّةٌ تَذْكارِيَّة صَدَرَت من دار العلوم مَدَنِي نَغَر داكا)
- النَّهْضَةُ الإسلامِيَّة ٢٠٠٤م

---

১. গ্রন্থনা : মো. তৌহিদুর রহমান।

- النَّهْضَةُ الإسلامِيَّة ٢٠٠٥م
- المُفْرَدَاتُ العربية
- الجامعة الإسلامية دار العلوم مَدَنِي نَغَرْ، داكا : تعريفُها، أهدافُها، خِدْمَاتُها، مشروعاتُها
- দরসে কোরআন সিরিজ ১, ২, ৩, ১২, ২৯, ৩০
- ইসলামি আকিদার ব্যাখ্যা
- শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ
- লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি
- একজন শিক্ষক : দর্পণ ও দর্শন (১-৩) [এটি আরবিভাষায় রচিত نَظَّارَةُ مُعَلِّمٍ وَنَظَرَاتُهُ-এর অনুবাদ নয়।]
- আলেমদের সাহচর্য
- আরবী ভাষা পাঠদান পদ্ধতি
- বাংলা থেকে আরবিভাষায় অনুবাদ শিখি
- ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পদ্ধতি
- আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানীনগর ঢাকা : পরিচয়, লক্ষ্য, খেদমত ও পরিকল্পনা

অনূদিত

- الأبوابُ والتراجمُ لِصحيحِ البخاريِّ للعلامة محمود حسن الدِّيُوْبَنْدِيِّ المعروفِ بـ«شيخ الهند» ﷺ (ترجمة الكتاب من الأردية بالعربية مع التعليق عليه)
- الأستاذُ المودودِيُّ وحِزْبُ «الجماعة الإسلامية» : أفكارٌ ونظَرِيَّاتٌ للأستاذ الشيخ حمايت الدين حفظه الله (ترجمة الكتاب من البنغالية بالعربية)
- কুরআন তাফসীরের মূলনীতি
- কালিমায়ে তাইয়েবা : বিশ্লেষণ ও ঈমান ভঙ্গের কারণ
- ঈমান-কুফর ও তাকফির

- তারার মেলা থেকে পৃথিবীর দিকে
- ঈদে মিলাদুন্নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

অনুশীলনী ও টীকাটিপ্পনি সংযোজিত

- مُخْتَارَاتٌ مِنْ أَدَبِ العَرَب ١، ٢ للدَّاعِيَةِ الإمامِ أبي الحسن عليّ الحَسَنِيّ النَّدْوِيّ ﷺ
- قصص النبيين للأطفال ١، ٢، ٣، ٤، ٥ للإمام الندويّ ﷺ
- القراءة الراشدة ١، ٢، ٣ للإمام الندويّ ﷺ
- الفِقْهُ المُيَسَّرُ للأستاذ شفيق الرحمن النَّدْوِيّ ﷺ
- نَفْحَة الأَدَبِ للعلامة وحيد الزمان الكِيْرَانَوِيّ ﷺ

স্বযত্নে প্রকাশিত

- تفسيرُ الجلالينِ (مُرَاجَعَةُ النسخةِ الهندية)
- تفسير الجلالين (الطبعةُ المُنَضَّدَة للنسخة الهندية)
- لُبَابُ النُّقُولِ في أسباب النزول للإمام جلال الدين السيوطيّ ﷺ
- الفوزُ الكبير في أصول التفسير للإمام وليّ الله بن عبد الرحيم الدِّهْلَوِيّ ﷺ
- النُّسَخُ الهندية للصحيحين والسنن الأربعة ومُوَطَّأَي الإمامَيْنِ مالكٍ ومحمد والشمائلِ للإمام الترمذيّ (مع حاشية شيخ الحديث زكريا بن يحيى الكاندهلويّ) وشرح معاني الآثار للإمام الطحاويّ
- حاشيةُ السِّنْدِيّ على صحيح البخاريّ
- رسالةُ الإمامِ أبي داود إلى أهلِ مَكَّةَ في وَصْفِ سُنَنِه

- كتابُ المَرَاسِيلِ للإمام أبي داود ﷺ
- كتابُ العِلَلِ للإمام الترمذيِّ ﷺ
- الإمامُ ابن ماجه وكتابُه السُّنَن للشيخ عبد الرشيد النُّعمانيِّ بعناية الشيخ عبد الفتاح أبي غُدَّةَ الحَلَبِيِّ ﷺ
- شروطُ الأئمةِ السِّتَّةِ للحافظ أبي الفَضْل المَقْدِسِيِّ مع حاشية العلامة زاهد الكوثريِّ ﷺ
- شروطُ الأئمةِ الخمسة للحافظ أبي بَكْرٍ الحازِمِيِّ مع حاشية العلامة الكوثريِّ أيضا ﷺ
- البِضَاعَةُ المُزْجَاةُ لِمَنْ يُطَالِعُ المِرْقاةَ في شَرْحِ المِشْكاةِ للعلامة الشيخ محمد عبد الحليم بن عبد الرحيم الجِشْتِيِّ ﷺ
- مقدّمةٌ في بيانِ بعضِ مُصْطَلحاتِ علمِ الحديث للشيخ المحدِّث عبدِ الحقِّ الدِّهْلَوِيِّ ﷺ
- رسالةٌ حَوْلَ حُجِّيَّةِ العَمَلِ المُتَوَارَثِ للعلامة المحدِّث حَيْدَر حَسَن خَان الطُّونْكِيِّ ﷺ
- أصول الإفتاءِ وآدَابُهُ للعلامة المفتي محمد تقيّ العثمانيِّ حفظه الله
- هدايةُ النحوِ للعلامة سراج الدين عثمان الأَوْدَهِيِّ ﷺ
- شرحُ مأةِ عامِلٍ للسيِّد الشريف الجُرْجَانِيِّ ﷺ

সম্পাদিত

- الاستِفادة بشَرْحِ سنن ابن ماجه ١-٢ (مُرَاجَعة لُغَوِيّة)
- কীভাবে হবেন একজন আদর্শ শিক্ষক

এ ছাড়াও আছে বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ। আল্লাহ তাআলা তাঁর সবগুলো কাজ সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন এবং তাঁর কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে রাখুন। আমিন!

বিশেষ দ্রষ্টব্য

تَطَّارَةُ مُعَلِّمٍ وَنَظَرَاتُهُ কিতাবসহ পরবর্তীতে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোতে লেখকের চিন্তানৈতিক যে বক্তব্য এসেছে, তার সঙ্গে এসবের পূর্বে প্রকাশিত কোনো গ্রন্থের(১) বক্তব্যের বৈপরীত্ব দেখা দিলে, পরবর্তীতে প্রকাশিত গ্রন্থের বক্তব্যই লেখকের বর্তমান অবস্থান বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ তাআলা পেছনের লেখাগুলোর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা এবং সর্বদা সরল পথে অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন। হে আল্লাহ! সত্য আমাকে সত্যরূপে দেখাও ও তার অনুসরণ করার জীবিকা দাও, এবং মিথ্যা আমাকে মিথ্যারূপে দেখাও ও তা পরিহার করার জীবিকা দাও। এক পলকের জন্যও আমাকে নিঃসঙ্গ ছেড়ে দিয়ো না। আমিন!

সফিউল্লাহ ফুআদ [আফাল্লাহু আনহু]
২৭. ৬. ১৪৪৪ হি.
২১. ০১. ২০২৩ ই.

---

১. যেমন– كيف نتعلمُ الإنشاءَ-২, একজন শিক্ষক দর্পণ ও দর্শন [১-৩]।

'আকিদা ও তাওহিদ বিভাগ' পরিচিতি

প্রারম্ভিক কথা

ইসলামি জীবনযাপনে আকিদার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস ছাড়া কোনো ব্যক্তি আখেরাতে নাজাত পেতে পারে না; আকিদার বিশুদ্ধতা ছাড়া কোনো নেক আমলই মহান আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না। তাই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে ১৪৪১-৪২ হিজরি শিক্ষাবর্ষ থেকে, মাহাদ 'আকিদা ও তাওহিদ বিভাগ' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করেছে। বিভাগটি আলহামদুলিল্লাহ দেওবন্দি তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত।

দেওবন্দি তরিকার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিবরণ

উলামায়ে দেওবন্দের আকিদার প্রকৃত মুখপত্র হিসেবে লিখিত কিতাব হলো দুটো–[১]

১. হজরত খলিল আহমদ সাহারানপুরি রাহিমাহুল্লাহ [১২৬৯-১৩৪৬ হি.] প্রণীত المُهَنَّدُ عَلَى المُفَنَّدِ

২. হজরত কারি মুহাম্মদ তাইয়েব রাহিমাহুল্লাহ [১৩১৫-১৪০৩ হি.] রচিত عقائد علماء دیوبند। পরবর্তীতে مسلک علماء دیوبند নামে তিনি তুলনামূলক বড় আরেকটি কিতাব রচনা করেছেন।

কিতাব দুটোসহ দেওবন্দি অন্যান্য আকাবিরের বিভিন্ন কিতাব ও রিসালায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আকিদা বিষয়ক আলোচনাগুলো নিজস্ব বিন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে দারুল উলুম দেওবন্দের 'শায়খুল হিন্দ একাডেমি' থেকে প্রকাশিত دارُ العلومِ ديوبند : مَدْرَسَةٌ فِكْرِيَّة توجِيْهِيَّة...

---

১. دارُ العلومِ ديوبند : مَدْرَسَةٌ فِكْرِيَّة توجِيْهِيَّة... পৃ. ৪৭৩-৪৭৪ দ্রষ্টব্য।

নামক কিতাবে। লেখক মাওলানা উবায়দুল্লাহ আসআদি কাসেমি হাফিজাহুল্লাহ। কিতাবটির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৩৯। আকিদা বিষয়ক পৃষ্ঠার সংখ্যা ২৩৫। কিতাবের এ অংশটুকু মাহাদের 'আকিদা ও তাওহিদ বিভাগে'র সিলেবাসভুক্ত– কিছু অংশ দরসের, কিছু অংশ মুতালাআর।

তাছাড়া দেওবন্দি আলেমসমাজ হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ [১১১৪-১১৭৬ হি.] প্রণীত الْعَقِيْدَةُ الْحَسَنَةُ কিতাবটিকে নিজেদের আকিদার সারসংক্ষেপ হিসেবে পেশ করেন।[১] الْعَقِيْدَةُ الصَّفِيَّةُ عَلَى العقيدةِ الْحَسَنَةِ নামক শরাহসহ الْعَقِيْدَةُ الْحَسَنَةُ কিতাবটিও মাহাদের 'আকিদা ও তাওহিদ বিভাগে'র সিলেবাসভুক্ত।

সর্বোপরি دارُ العلوم ديوبند : مدرسةٌ فكرِيّة توجِيهِيّة... কিতাবের ৪৪৫ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে–

واستِنادُهم (يعني علماءَ ديوبند) في العقائد والمسائل إلى كتب أئمة أهل السنة من هذا الشأن من جميع الأزمان، منذ بداية عهد تدوين العلوم والفنون إلى هذه القُرُون، لا سِيَّمَا كتابِ «الفقه الأكبر» -مع شروحه المعروفة- المنسوب إلى إمامنا أبي حنيفة رحمه الله، وكتابِ «العقيدة الطحاوِيّة» للإمام أبي جعفر الطحاوِيّ المعروف بين الأَقَاصِي والأَدَانِي، وأخيرًا إلى كتب الإمام وليّ الله الدِّهْلَوِيّ وكتب أَخْلافه وأبنائه وأحفاده. ويستفيدون ويستَمِدّون بكتب النَّسَفِيّ والتَّفْتَازَانِيّ وابن الهُمَام، وبجانبٍ آخَر بكتب الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام درسًا وتدريسًا ومطالعةً وتأليفًا.

উলামায়ে দেওবন্দের উল্লিখিত মূলনীতির আলোকেই মাহাদ তার 'আকিদা ও তাওহিদ বিভাগ' পরিচালনা করার চেষ্টা করে।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২

পাঠ্যবিষয়

বিভাগটির বর্তমান পাঠ্যবিষয় প্রধানত চারটি–

١. أصولُ الإيمانِ وأركانُه

٢. التكفيرُ: أسبابُه ومَوَانِعُه وأخطاؤُه

٣. الحُبُّ في الله والبُغْضُ في الله / الوَلَاءُ والبَرَاءُ في الإسلام

٤. مَذَاهِبُ فِكْرِيَّةٌ مُعَاصِرَةٌ

প্রত্যেক ৩ মাসের দরস ও মুতালাআর পৃথক পৃথক মানহাজ রয়েছে।

ভর্তির যোগ্যতা

ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীকে দাওরায়ে হাদিসে কমপক্ষে 'জাইয়িদ জিদ্দান' স্তরে উত্তীর্ণ হতে হয়, এবং বার্ষিক পরীক্ষার নম্বরপত্রের ফটোকপি সাথে রাখতে হয়। তাছাড়া যেকোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সর্ব প্রকারের সংশ্লিষ্টতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হয়। বর্তমানে পরীক্ষা হয় নিম্নের কিতাবগুলো থেকে–

১. صحيحُ البخاريِّ-এর كتابُ الإيمان, সমপরিমাণ فتحُ البارِي-সহ।

২. صحيحُ مُسْلِمٍ-এর كتابُ الإيمان, সমপরিমাণ فتحُ المُلْهِم-সহ।

৩. العقيدةُ الطحاوِيّة

মূল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, যারা 'ব্যবহারিক আরবি' ভালো জানে এবং প্রমিত বাংলায় সাবলীলভাবে লিখতে পারে, তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

অনুভূতি

বিভাগটিতে পড়াশোনার পর কুরআন পাক অধ্যয়ন করলে সাহাবি হজরত জুনদাব বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ বাণীর বাস্তবতা বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ–

تَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ، فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا.

আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ইমান শিখেছি। তারপর কুরআন শিখেছি, তখন তা দ্বারা আমাদের ইমান বৃদ্ধি পেয়েছে।[১]

দুআ : মেহেরবান আল্লাহ সকল বিচ্যুতি থেকে মুক্ত রেখে বিভাগটিকে সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে অব্যাহত রাখুন, দেশ-বিদেশে এ ধরনের অনেক উপকারী বিভাগ গড়ে তুলুন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন। আমিন!

যাতায়াত : দেশের যেকোনো স্থান থেকে ঢাকাস্থ সাইনবোর্ড ও সাদ্দাম মার্কেটের মধ্যবর্তী 'মাদরাসা রোড' নেমে রাস্তার দক্ষিণে গিরিধারা আবাসিক এলাকাস্থ শাপলা বিল্ডিংয়ের পূর্ব পাশে।

যোগাযোগ : ০১৯৪১৮৫৫৯০৮

১. সুনানে ইবনে মাজা : ৬১

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

ফেরেশতাদের প্রতি ইমান

শয়তান প্রসঙ্গ

বিষয় | পৃষ্ঠা

কুরআন পাকের প্রতি ইমান

আখেরাতের প্রতি ইমান

নবি-রাসুলগণের প্রতি ইমান

বিষয়	পৃষ্ঠা

ওলিদের আলোচনা

বিষয়	পৃষ্ঠা

সাহাবিদের আলোচনা

ইমান, কুফর ও তাকফির প্রসঙ্গ

ইমান, কুফর

বিষয়	পৃষ্ঠা

তাকফির ফিতনা নয়

তাকফির বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা

বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন থেকে বাঁচার উপায়

বিষয় | পৃষ্ঠা

কিয়ামত প্রসঙ্গ

জামাত আঁকড়ে ধরার এবং শুযুয ও বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকার উপায়

বিষয় পৃষ্ঠা

...আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, বাংলাদেশের বরেণ্য আলেমে দীন এবং বিভিন্ন বিষয়ের উঁচু মাপের লেখক প্রিয় ভাই সফিউল্লাহ ফুআদ পুস্তিকাটিতে অনেক কাজ করেছেন। তিনি পুস্তিকাটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। বিষয়গুলো নিরীক্ষণ করেছেন।... তাঁর মোবারক কাজটি আমি দেখেছি।

কাজটি মূল্যবান, সুন্দর, উপকারী ও মহৎ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এই উত্তম মূল্যবান ইলমি খেদমতটির বিনিময় দান করুন। আমি আশাবাদী, ব্যাখ্যাগ্রন্থটি উলামায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এটি ছাত্র ও শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে এবং আমাদের ও তাঁদের পাঠ্যসূচিতে স্থান পাবে।

আল্লামা মুফতি উবাইদুল্লাহ আসআদি [হাফিজাহুল্লাহ]
دار العلوم ديوبند : مَدرسةٌ فِكرِيَّةٌ تَوجِيهِيَّةٌ গ্রন্থের রচয়িতা

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০,